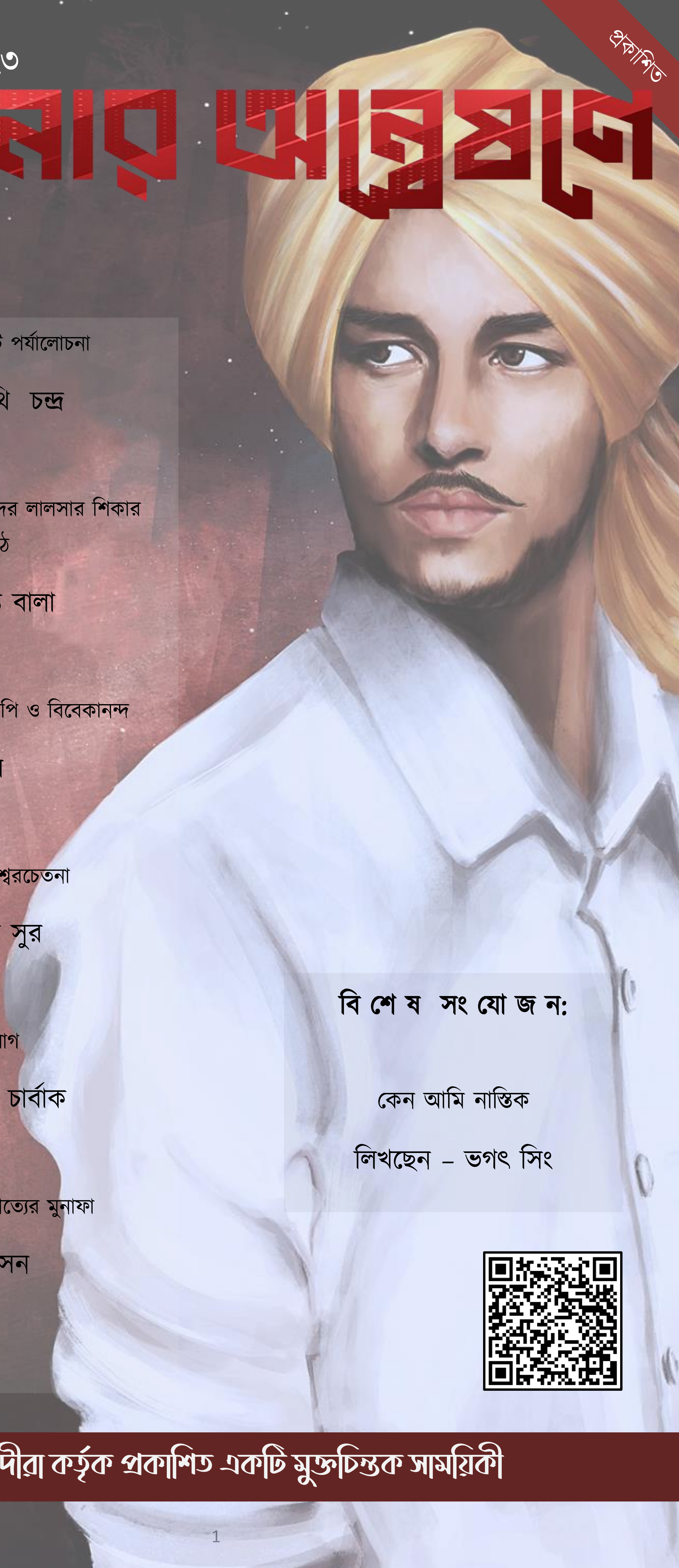
মার্চ সংখ্যা, ২০২৩

প্রকাশিত

চেতনার অন্বেষণে



নাস্তিকতা - একটি পর্যালোচনা

পার্থ সারথি চন্দ্র

বিশ্বাসবাদ ও কর্পোরেটদের লালসার শিকার যোশীমঠ

পীযূষকান্তি বালা

ভাষা সাম্রাজ্যবাদ: বিজেপি ও বিবেকানন্দ

তন্ময়

রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরচেতনা

অনিকেত সুর

দুর্নীতিযোগ

অশোকদাস চার্বাক

ভীতির পুঁজি আনুগত্যের মুনাফা

বিপ্লব সেন

বি শে ষ সং যো জ ন:

কেন আমি নাস্তিক

লিখছেন – ভগৎ সিং

যুক্তিবাদীরা কর্তৃক প্রকাশিত একটি মুক্তচিন্তক সাময়িকী

চেতনার অন্বেষণে

| মুক্তচিন্তক মাসিক পত্রিকা
| মার্চ সংখ্যা, ২০২৩

স ম্পা দ ক

যু ক্তি বা দী রা

প রি ক ল্প না
ও
রু পা য় ণে
মধুমিতা, সৌমেন, অরিন্দম, অভিষেক, সৌভিক, সজল, শক্তি, উপেন, পার্থপ্রতিম ও কিনোক্ষ্যাপা

প্র কা শ সং খ্যা
পঁ চি শ

যো গা যো গ
yuktibadira@gmail.com
WhatsApp-9564556134
Telegram:@Yuktibadira
Fb/rationalistsmag
Insta/rationalists_mag
Twitter/yuktibadira
Website: rationalists
ক ল কা তা - ৫ ৬

বি নি ম য় মূ ল্য না ই

সূ চি

প্র ব ন্ধ - নি ব ন্ধ:

অ নু গ ল্প – ছো ট গ ল্প – না ট ক:

ক বি তা:

পিডিএফ পড়ার ভালো এক্সপেরিয়েন্স ও রেসপন্সসিভ পিডিএফ পেতে অডোবি রিডার, মুন রিডারের মত অ্যাপ ব্যবহার করুন। মুন রিডারে বুক সেল্ফ অপাসন আছে যেখানে প্রয়োজনীয় বই গুছিয়ে রাখা যায়, ডিজিটাল বুকসেল্ফ হিসেবে ভালো।

মুক্তচিন্তক সম্মাননা

মুক্তচিন্তা নিয়ে বিগত সংখ্যা অবধি যাঁরা পাঁচটি বা তার অধিক লেখা দিয়েছেন, তাঁদের সম্মানজ্ঞাপক একটি সম্মাননাপত্র প্রদান করছি। পাঁচটি লেখা প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রটি প্রদান করা হতে থাকবে আগামীতেও। যাঁদের দৃপ্ত লেখনীতে ‘চেতনার অন্বেষণে’র পাঠক ঋদ্ধ হয়ে চলেছে।

এমাসে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করছি মুক্তচিন্তক ও যুক্তিবাদী

মুজিব রহমান

এবং

অনুজ বিশ্বাস-কে

দুজনেরই বলিষ্ঠ লেখার সাথে আমরা পরিচিত, শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানাই।

সম্পাদকীয়

একগাদা প্রতিবন্ধকতা ফুৎকারে সরিয়ে রেখে ম্যাগাজিন এডিট করতে বসেছি। এ এক পাগলামি ছাড়া আর কি? আসলে পাগলামি আছে বলেই বোধহয় মাসের শেষ সপ্তাহ শুরু হলেই ম্যাগাজিন বের করতে হবে তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। এসবই কখনও একা হাতে সামলানো সম্ভব ছিল না। পাঠক-লেখক আর সহযোদ্ধারা আছেন বলেই দ্রুত এতকিছু করা সম্ভব হচ্ছে। নিজের পছন্দমত কাজও সবাই ভাগ করে নিয়েছি। ইউটিউবে ম্যাগাজিনের কিছু লেখা অডিওবুকেও আসছে। অডিওবুকের দায়িত্ব অরিন্দম আর দেবস্মিতা নিয়েছে। কোটেশন সৌভিক দেখছে। এছাড়াও প্রতিমাসেই প্রুফ দেখে দেন সজল, উপেন, মধুমিতারা। বুক ক্লাব মিটিং দেখছে সৌমেন। এ যেনো একটা টিম শুধুমাত্র নয়, স্বপ্ন বুকে নিয়ে একদল দামাল ছেলেমেয়ের একসাথে চলা। আরও কয়েকজনের কথা আপাতত উহ্য থাক পরিচয় করিয়ে দেবো গুগল মিটে বা কোনও জমায়েতে।

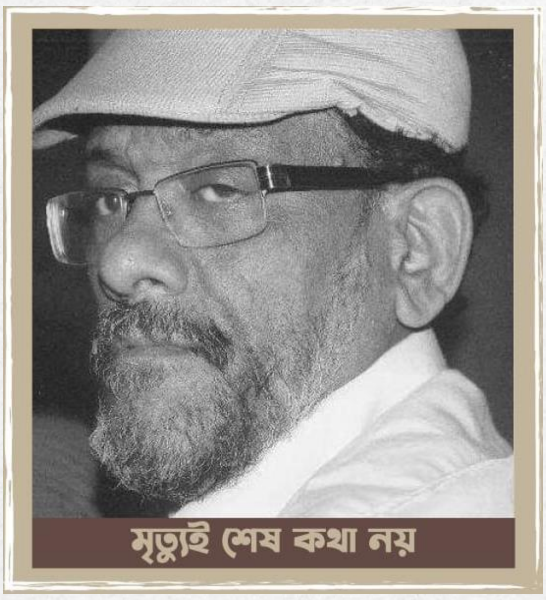
আপনারা অনেকেই বিভিন্ন জেলা থেকে কল করেছেন, লেখা পাঠিয়েছেন এমাসেও। শুধু জেলা নয় বরং বলা ভালো গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা মুক্তচিন্তক বাঙালির কাছে পত্রিকাটি দ্রুত সমদৃত হয়েছে। গতসপ্তাহে টেক্সাস থেকে এক প্রবাসী পাঠক কল করেছিলেন, বাংলাদেশ থেকেও

নিয়মিত লেখা আসে। পত্রিকা যে আন্তর্জালে বহুদূর ছড়িয়ে পড়েছে তারই দৃষ্টান্ত।

এমাসের কভার ফিচার শহীদ ভগৎ সিং, মার্চেই তিনি শহীদ হন। তাঁর দুটি লেখা সংযোজিত হয়েছে পত্রিকায়। লেখাদুটি পড়লে সমাজ, দর্শন নিয়ে তাঁর চিন্তাভাবনার আঁচ পাবেন। এছাড়াও স্মরণ করছি মুক্তমনা ওয়াশিকুর রহমান বাবুকে।

আর লেখা ও মতামত জানানোর ঠিকানা সেই একই আছে yuktibadira@gmail.com এ।

৩১, মার্চ, ২০২৩



এমাসেই হারালাম অগ্রজ প্রতিম শ্যামল চ্যাটার্জীকে। শেষদিন অবধি তিনি মানুষের জন্য কাজ করে গেছেন। দেহদান নিয়ে কাজের জন্য আমরা আরও বেশি করে চিনি। তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই।

নিয়মিত ম্যাগাজিন পেতে

ম্যাগাজিন প্রতিমাসেই পাবেন টেলিগ্রামে চেতনার অন্বেষণে চ্যানেলে -

টেলিগ্রামে সার্চবারে লিখুন - @Yktibadira

অথবা

ক্লিক করুন

ওয়েবসাইটেও নিয়মিত পাবেন

https://rationalists.wixsite.com/chetona

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

ইমেইল: yuktibadira@gmail.com

হোয়াটসঅ্যাপ: +919564556134

প্রশ্ন করুন যুক্তিবাদীদের

Ask Rationalists

আপাত অতিপ্রাকৃত ঘটনা, জ্যোতিষ শাস্ত্র, ঈশ্বর, ভূত, আত্মা, কোনও ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, সমাজ-রাজনীতি ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত উত্তরের খোঁজ করে থাকলে প্রশ্নটি যুক্তিবাদীদের বলুন।

প্রশ্নটিকে সংশিষ্ট বিশেষজ্ঞের কাছে পৌছে দেব, এবং উত্তর পাবেন 'চেতনার অন্বেষণে' পত্রিকার আগামী সংখ্যায়।

| প্রশ্ন করুন এই গুগল ফর্মে – Ask_Rationalists

এমাসের বই

Book Club by Rationalists: April 2023

“একটি ভালো বইয়ের কখনোই শেষ বলতে কিছু থাকে না।”- আর ডি কামিং

Rationalists এর বুক ক্লাবের উদ্দেশ্য একটাই বাঙালির বই পড়ার চর্চাকে আবার ফিরিয়া আনা। মুক্ত চিন্তার ও ক্রিটিক্যাল থিংকিং এর চর্চা কে সচল রাখতে ভিন্ন স্বাধের বই পড়ার প্রয়োজনীয়তা লক্ষণীয়। বিশেষ করে বর্তমানে যখন মিথ্যা তথ্য, খবর ও অপপ্রচার বিভিন্ন ভাবে মানব চেতনার অবক্ষয় ঘটাচ্ছে।

এই মাসে আমরা বই হিসাবে বেছে নিয়েছি ইয়ুভাল নোয়াহ হারারির লেখা “স্যাপিয়েন্স: আ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ হিউমান-কাইন্ড”. Non-fiction ধারার এই বইটি ২০১১ প্রকাশিত হয় ও বহুল চর্চিত বই গুলির একটি। এটি মূলত আমাদের অর্থাৎ মানুষের বিকাশের কথা শোনাবো ও পাঠককে নতুন নতুন অনেক প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড় করানোর সাথে সাথে বহু প্রশ্নের উত্তর ও দেবে।

বাংলা, ইংরাজি এই দুই ভাষায় পিডিএফের সাথে এই বার এই বইয়ের MP3 audio file (অডিও বুক) দেওয়া থাকবে। প্রতিবারের মতো মাসের শেষে (অর্থাৎ এপ্রিলের ৩০ তারিখ) আমরা মিলিত হবো আলোচনার জন্য। তত দিন সুস্থ থাকুন, বই পড়ুন ও হাতে কলম তুলে দু চার লাইন লিখে আমাদের পত্রিকার জন্য দিন।

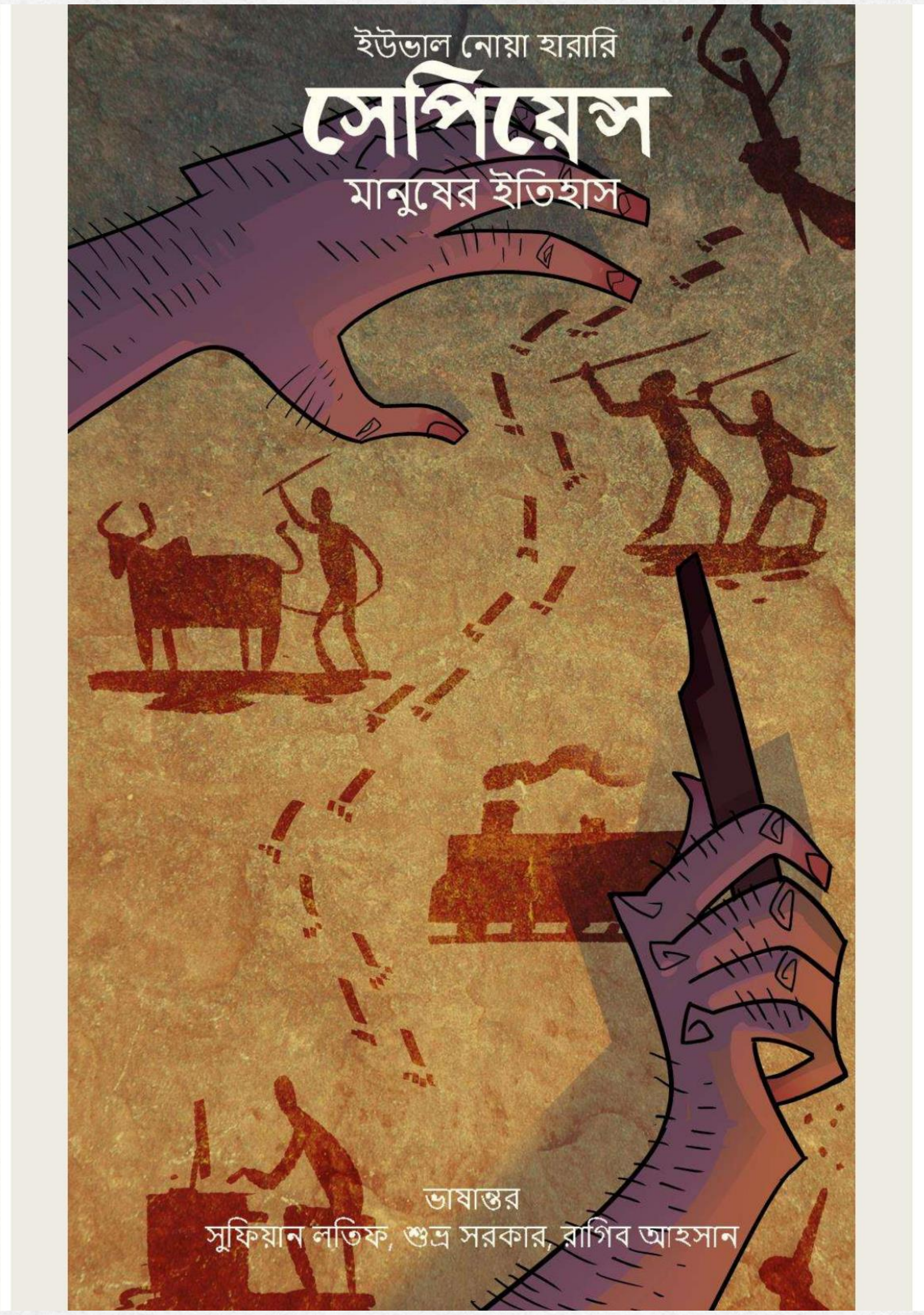
বুক অফ জানুয়ারী: “কি দিয়ে সমস্ত কিছু গড়া” অধ্যাপক পলাশ বরণ পাল, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

বুক অফ ফেব্রুয়ারি: “বিবর্তনের পথ ধরে” বন্যা আহমেদ, অবসর প্রকাশন ঢাকা

বুক অফ মার্চ: “প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান: বাস্তব বনাম কল্পনা” ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটি

“Reading is an act of civilization; it’s one of the greatest acts of civilization because it takes the free raw material of the mind and builds castles of possibilities.”

—Ben Okri



বইটির টেলিগ্রাম লিংক – ক্লিক করুন

সূচিপত্র

নাস্তিকতা - একটি পর্যালোচনা

লিখেছেন – পার্থ সারথি চন্দ্র



১৬৩৩ সাল। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে - বাইবেল বিরোধী এই সত্য কথা বলার অপরাধে তৎকালীন চার্চ খ্যাতনামা বিজ্ঞানী গ্যালিলিওকে অভিযুক্ত করলো ‘ধর্মদ্রোহিতার’ অভিযোগে। গ্যালিলিও তখন প্রায় অন্ধ, বয়সের ভারে ন্যুব্জ। অসুস্থ ও বৃদ্ধ বিজ্ঞানীকে জোর করে ফ্লোরেন্স থেকে রোমে নিয়ে যাওয়া হলো, হাঁটু ভেঙ্গে সবার সামনে জোড় হাতে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়ে বলতে বাধ্য করা হয় এতদিন গ্যালিলিও যা প্রচার করেছিলেন, তা ধর্মবিরোধী, ভুল ও মিথ্যা। বাইবেলে যা বলা হয়েছে সেটিই

আসল, সঠিক। পৃথিবী স্থির অনড় - সৌর জগতের কেন্দ্রে। গ্যালিলিও প্রাণ বাঁচাতে তাই করলেন। পোপ ও ধর্মসংস্থার সম্মূখে গ্যালিলিও যে স্বীকারোক্তি ও প্রতিজ্ঞা-পত্র স্বাক্ষর করেন, তা বিজ্ঞান সাধনার ইতিহাসে ধর্মীয় মৌলবাদীদের নির্মমতার এবং জ্ঞান সাধকদের কাছে বেদনার এক ঐতিহাসিক দলিল।



শোনা যায়, এর মধ্যেও একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ গণিতজ্ঞ-জ্যোতির্বিদ স্বগতোক্তি করেছিলেন - 'তার পরেও কিন্তু পৃথিবী ঠিকই ঘুরছে'। ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ নিয়েই গ্যালিলিওর মৃত্যু হয় ১৬৪২ সালে, নিজ গৃহে, অন্তরীণ অবস্থায়। শুধু গ্যালিলিওকে অন্তরীণ করে নির্যাতন তো নয়, ব্রুনোকে তো পুড়িয়েই মারলো ঈশ্বরের সুপুত্ররা। তারপরো কি সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর ঘোরা ঠেকানো গেল?

শুধু গ্যালিলিও বা ব্রুনো নয়, ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, হাইপেশিয়া, এনাক্সোগোরাস, ফিলিপ্রাস প্যারাসেলসাস, এনাকু সিমন্ড, লুসিলিও ভানিনি, টমাস কিড, ফ্রান্সিস কেট, বার্থৌলোমিউ, লিগেট, ইবনে খালিদ, যিরহাম, আল দিমিস্কি, ওমর খৈয়াম, ইবনে সিনা, ইবনে বাজা, আল কিন্দী, আল রাজি কিংবা ইবনে রুশদ সহ অনেককেই ধর্মান্ধদের হাতে নিগৃহীত এবং নির্যাতিত হয়ে নিহত হতে হয়।

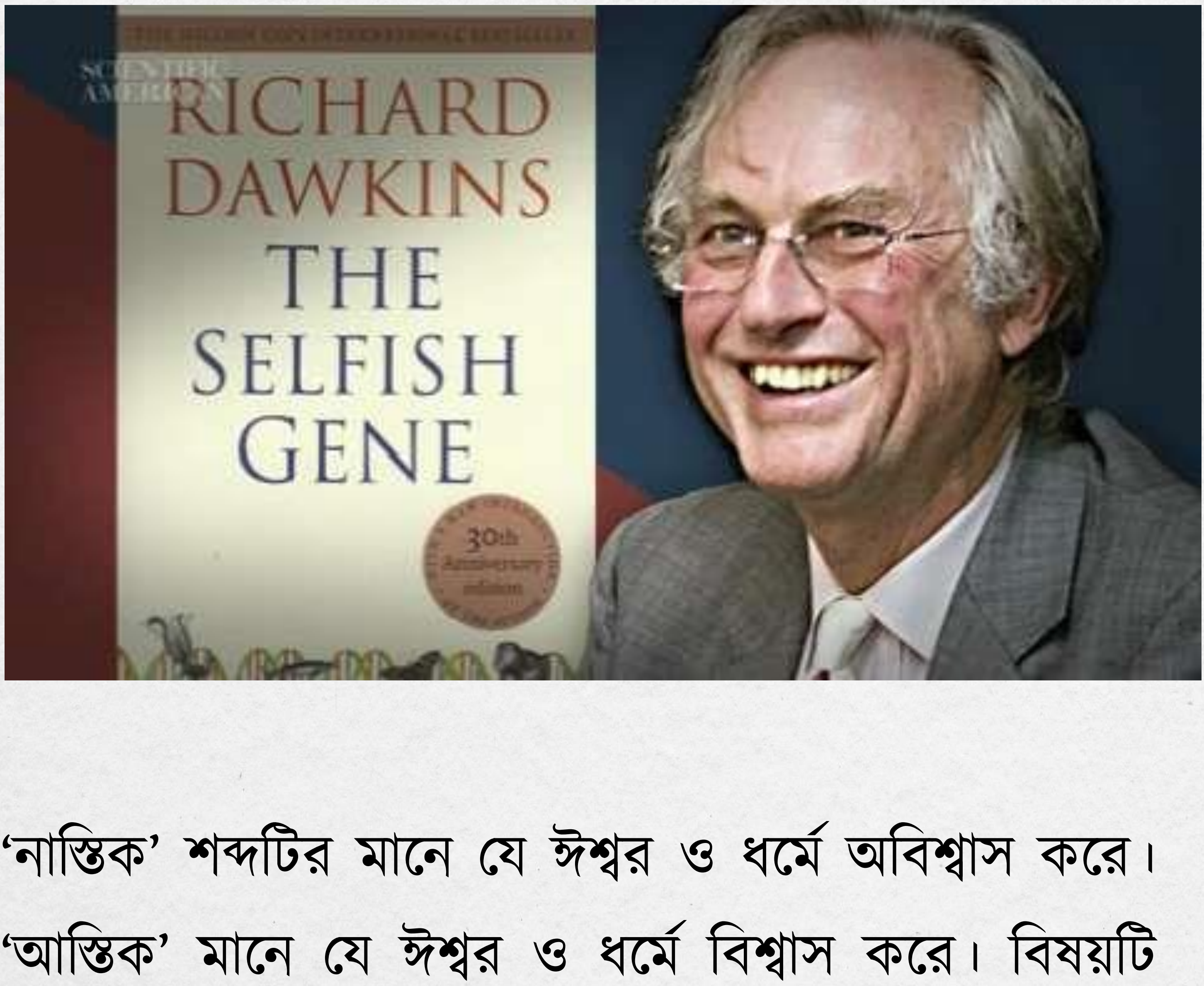
মানব সভ্যতার সূচনা পর্বে ধর্ম ছিল জাদুবিদ্যাকেন্দ্রিক। মানব গোত্রের প্রধান পুরোহিত, যাজক, পয়গম্বরা ছিলেন আসলে জাদু ও তন্ত্রে পারদর্শী। বহুকাল আগে, জঙ্গলে বসবাসকারী মানুষের এক গোত্রের কথা চিন্তা করা যাক। গোত্রের সব মানুষের সামনে একজন সামান্য জ্বলন্ত আগুনে ছুঁড়ে দিলেন মুঠোভর্তি কালো গুঁড়ো। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র বিস্ফোরণে আগুনের শিখা উপরে উঠে গেল। দর্শকদের কাছে ঘটনাটি গণ্য হলো অপ্রাকৃত এবং অসাধারণ হিসেবে। এবং এই 'অতিপ্রাকৃত ঘটনা' সবার সামনে ঘটানোর জন্য সামান নিজেকে দাবি করলেন সবার চেয়ে আলাদা একজন, বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে। এই থেকেই অতি প্রাচীনকালে উৎপত্তি হয়েছিল দেবতা, ভূত ও ভগবানের। তাদের তুষ্ট করতে শুরু হয়েছিল পুজো, বলিদান, উৎসর্গ উপাচারের মতো রীতি পালনের। সৃষ্টি

হয়েছিল ধর্মের। তৈরি হয়েছিল জাত-পাত। প্রাচীন ভারতে এসব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন চার্বাকরা। যাঁরা এইসব অযৌক্তিক, ব্যাখ্যাহীন, অজ্ঞানতায় মোড়া, কুসংস্কার সর্বস্ব কাণ্ডকারখানায় মজে থাকতেন তাদের জ্ঞানের অপর্যাপ্ততা আছে বলে মনে করতেন চার্বাকরা।

ভাবা হয়েছিল যত সময় এগোবে, শিক্ষার প্রসার হবে, জ্ঞানের বিকাশ হবে এই সব কুসংস্কার, অলৌকিকতা থেকে মুক্ত হবে মানুষ। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস সে পথে হাঁটেনি। খোলামকুচির মত উড়ে গেছে চার্বাকদের তত্ত্ব। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সৃষ্টি করা আধুনিক উপকরণকে গ্রহণ করলেও, তার আলোকে ঈশ্বরতত্ত্ব থেকে মুক্ত হতে পারেনি মানুষ। নিজের কাজ দিয়ে, আবিষ্কার দিয়ে এক ধাক্কায় জ্ঞানের জগতকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন এমন বহু মানুষ ছিলেন নাস্তিক। কিন্তু তাতে কার কি? ধর্মান্ধ ও কুসংস্কারগ্রস্থ, স্থবির সমাজ, রাষ্ট্র বা গোষ্ঠী তাকে হয় নির্বাসনে পাঠিয়েছে না হয় হত্যা করেছে। যত দিন যাচ্ছে ততই আরও ধর্মোন্মাদ, কুসংস্কারমুখী হয়ে পড়ছে মানুষ। তৈরি হচ্ছে এক অদ্ভুত মনুষ্যমন যেখানে অন্য ধর্মের, অন্য মতের মানুষের কোনও ঠাঁই নেই। তাই উপাসনালয় বানিয়ে পুজোপাঠের শেষ নেই। অন্ত নেই তার ধুমধাম আর জাঁকজমকের। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারতের ভোটবাজার এখনও নির্ভর করে ধর্মের মেরুকরণের

উপরই। তাই মন্দির না মসজিদ, সেটাই আগামী ভারতের সবচেয়ে বড় ভাবনা।

কীভাবে অন্ধবিশ্বাস নির্ভর ব্যবস্থা টিকে আছে, কীভাবে আমরা এই অন্ধবিশ্বাসগুলো বংশ পরম্পরায় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে দিই, তা বুঝতে হলে সামাজিক জীববিজ্ঞানের আধুনিক গবেষণাগুলোকে বুঝতে হবে। রিচার্ড ডকিন্স তার 'সেলফিশ জিন' বইয়ে আর সুজান ব্ল্যাকমোর তার 'মিম মেশিন' বইয়ে কীভাবে বিশ্বাস বংশপরম্পরায় টিকে থাকে অনেক আকর্ষণীয় উদাহরণ হাজির করেছেন।



'নাস্তিক' শব্দটির মানে যে ঈশ্বর ও ধর্মে অবিশ্বাস করে। 'আস্তিক' মানে যে ঈশ্বর ও ধর্মে বিশ্বাস করে। বিষয়টি যদি এটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকতো, তাহলে আমাকে এই আলোচনার অবতারণা করতে হত না।

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্য বিনির্ণয়।
যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্মহানিঃ প্রজায়তে।।"

- এটা আমার বচন নয়, শাস্ত্রীয় বচন। আমি নাস্তিক। শাস্ত্র আমার জীবন নিয়ন্ত্রণ করে না। অর্থাৎ আমি বস্তুত অশাস্ত্রীয় মানুষ। যুক্তিহীন ধর্মকথা মান্য করে পুণ্যলাভের বাসনা আমার নেই। বরং শাস্ত্রমতে যুক্তিহীন বিচারে ধর্মের ক্ষতিসাধন হয় বল আমি বিশ্বাস করি। এটাই আমার বিশ্বাস, আমার ধর্মানুভূতি। কল্পনাবিলাসে নাস্তিকরা অভ্যস্ত নয়।

ধর্ম আসলে কী? চুম্বকের ধর্ম যেমন আকর্ষণ করা, মানুষের ধর্ম তেমনি বিশ্বমানবতা, মানুষের প্রতি প্রেম এবং ভালোবাসা। এরকম হলে কোনও আপত্তি ছিল না। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, পরস্পরের মধ্যে শ্রেষ্টত্বের লড়াই শুরু হয়। কার ঈশ্বর সত্য, কার ধর্ম সত্য - এই সব কোন্দলে এখনও পর্যন্ত কোটি কোটি মানুষের জীবন চলে গেছে, অনেক রক্ত ঝরেছে। তাই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম, মানব ধর্মের এবং মানবতার বিরুদ্ধে। আমাদের কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই, সেটা থাকার কোনো দরকারও নেই। মহাবিশ্ব পদার্থ বিজ্ঞানের সূত্রানুসারেই চলে, এখানে সৃষ্টিকর্তা বলে কিছুর প্রয়োজন নেই। স্টিফেন হকিং সেটা ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর বইতে। ঈশ্বরের কোনো প্রমাণও এখন পর্যন্ত কেউ দিতে পারেনি।

যেদিন কেউ ঈশ্বরের প্রমাণ দিতে পারবে, আমার আস্তিক হয়ে যেতে আপত্তি থাকবে না। চ্যাপম্যান কোয়েন বলেছেন, “ঈশ্বর খুবই ভঙ্গুর, বিজ্ঞানের ছোট্ট একটি ফুলকি অথবা একটু সাধারণ জ্ঞানই তাকে শেষ করে ফেলতে সক্ষম।” বিজ্ঞানী স্টিফেন ভাইনবার্গের একটি চমৎকার উদ্ধৃতি এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, “ধর্ম মানবতার জন্য এক নির্মম পরিহাস। ধর্ম মানুক বা নাই মানুক, সবসময়ই এমন অবস্থা থাকবে যে ভালো মানুষেরা ভালো কাজ করছে, আর খারাপ মানুষেরা খারাপ কাজ করছে। কিন্তু ভালো মানুষকে দিয়ে খারাপ কাজ করানোর ক্ষেত্রে ধর্মের জুড়ি নেই।”

মৃত্যুর পরে আমাদের শরীর মাটিতে মিশে যায়। যেহেতু আমি মানে হচ্ছে, আমার মস্তিষ্ক, যেখানে আমার সব স্মৃতি সংরক্ষিত থাকে, আবেগ ভালোবাসা সব কিছুর কেন্দ্র যেটা, সেই মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেলেই আমার অস্তিত্ব সেখানেই শেষ। সেই মগজ যখন মাটিতে মিশে যায়, আমরা আবার আমাদের প্রকৃতিতে ফিরে যাই।

দুই ধরনের নাস্তিক রয়েছেন। দুই দলই মনে করেন ধর্ম মানব সমাজের জন্য ক্ষতিকর। এদের একদল মনে করেন ধর্ম এমনিতেই ধ্বংস হয়ে যাবে সময়ের প্রয়োজনে, তার জন্য কিছু করার প্রয়োজন নেই। আরেক দল মনে করেন, ধর্মকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা করতে হবে। আঘাত করতে

হবে। তবে সেটা কোন শারীরিক আঘাত নয়, লেখার মাধ্যমে নিজেদের যুক্তি তুলে ধরে, কোনো মতবাদকে ভুল ও মিথ্যা তা দেখিয়ে দেয়া।

'সেক্যুলার' শব্দের মানে কি সত্যিই সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা? অন্তত রাষ্ট্রীয়ভাবে আমাদের দেশে এখন এটাই প্রচার করা হয়। বিভ্রান্তি সে কারণেই। আসলে কিন্তু ‘সেক্যুলারিজম’ শব্দটির অর্থ - ‘সব ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা’ নয়, বরং এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে একটি মতবাদ, যা মনে করে - রাষ্ট্রীয় মূলনীতি থেকে ধর্মকে পৃথক রাখা উচিত। 'আমেরিকান হেরিটেজ' ডিকশনারিতে 'Secularism' শব্দটিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে – “The view that religious considerations should be excluded from civil affairs or public education.” এ সংজ্ঞা থেকে বোঝা যাচ্ছে, ধর্মকে রাষ্ট্রের কাজের সাথে জড়ানো যাবে না - এটাই সেক্যুলারিজমের মোদ্দা কথা। ধর্ম অবশ্যই থাকতে পারে, তবে তা থাকবে জনগণের ব্যক্তিগত পরিমণ্ডলে - ‘ব্যক্তিগত’ বিষয় হিসেবে; ‘জনসাধারণের’ ব্যাপার স্যাপারে তাকে জড়ানো যাবে না। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু সেক্যুলারিজমের প্রকৃত সংজ্ঞা অনুধাবণ করতে পেরেছিলেন ভালোভাবেই। তিনি রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী থেকে ধর্মকে পৃথক রাখাই সঙ্গত মনে করতেন, জাতীয় জীবনে

সব ধর্মের প্রতি উদাসীন থাকাটাই তার কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হতো। তিনি বলেছিলেন, “ধর্ম বলতে যে ব্যাপারগুলোকে ভারতে কিংবা অন্যত্র বোঝানো হয়, তার ভয়াবহতা দেখে আমি শঙ্কিত এবং আমি সবসময়ই তা সোচ্চারে ঘোষণা করেছি। শুধু তাই নয়, আমার সবসময়ই মনে হয়েছে এ জঞ্জাল সাফ করে ফেলাই ভালো। প্রায় সব ক্ষেত্রেই ধর্ম দাঁড়ায় ধর্মান্ধতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা, মূঢ়তা, কুসংস্কার আর বিশেষ মহলের ইচ্ছার প্রতিভূ হিসেবে।”

আসলে অভিধানে 'Secular' শব্দটির অর্থও করা হয়েছে এভাবে - ‘Worldly rather than spiritual’। সেক্যুলারিজমের অন্যান্য প্রতিশব্দগুলো হলো - Worldly, Temporal কিংবা Profane। শব্দার্থগুলো খুব ভালোভাবে খেয়াল করলে বোঝা যাবে, এর অবস্থান ধর্ম কিংবা আধ্যাত্মিকতার দিকে নয়, বরং এর একশ আশি ডিগ্রি বিপরীতে। সেজন্য, সেক্যুলারিজমের বাংলা প্রতিশব্দ অনেকে খুব সঠিকভাবেই করেন - ‘ইহজাগতিকতা’।

সেক্যুলারিজমের মূল সুরটি আত্মস্থ করার পরিবর্তে চলছে ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষতা জাহির করার মহড়া। এ প্রসঙ্গে প্রবীর ঘোষ তার ‘সংস্কৃতি, সংঘর্ষ ও নির্মাণ’ বইয়ে লিখেছেন – “বিপুল প্রচারে সাধারণ মানুষ পরিচিত হয়েছে ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ শব্দের সাথে। জেনেছে, ধর্মনিরপেক্ষতা

কথার অর্থ হলো - ‘সব ধর্মের সমান অধিকার’। বিপুল সরকারি অর্থব্যয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দের এই যে ব্যাখ্যা হাজির করা হচ্ছে এবং এরই সাথে সম্পর্কিতভাবে আমাদের দেশের মন্ত্রী, আমলা ও রাজনৈতিকেরা মন্দিরে মন্দিরে পুজো দিয়ে বেড়াচ্ছেন, গুরুদ্বোয়ারায় নতজানু হচ্ছেন, মসজিদে গির্জায় শ্রদ্ধা জানিয়ে আসছেন। দীপাবলি, ঈদ, বড়দিন ইত্যাদিতে রাষ্ট্রনায়কেরা বেতার, দূরদর্শন মারফৎ শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য দিলে আয়কর থেকে রেহাইয়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন।



সাধারণের ভালো লাগছে - ‘সব ধর্মের সমান অধিকার’ মেনে নিয়ে মন্ত্রী, আমলা, রাজনীতিকদের সমস্ত ধর্মের কাছে নতজানু হতে দেখে। উদার হৃদয়ের মানুষ হিসেবে নিজেদের ভাবতে ভালো লাগছে জনগণের – হুঁ-হুঁ বাবা, আমাদের দেশ ধর্মনিরপেক্ষ। এখানে সব ধর্মই সমান অধিকার ও শ্রদ্ধা পায় মন্ত্রী আমলাদের। মন্ত্রীরা এরই মাঝে জানিয়ে দেন সমস্ত ধর্মের সমান অধিকার বজায় রাখতে, দেশের ‘ধর্মনিরপেক্ষতার মশাল’ জ্বালিয়ে রাখতে হবে।

‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ শব্দটিকে নিয়ে কী নিদারুণভাবে অপব্যাখ্যা করে সাধারণ মানুষের মগজ ধোলাই করা হচ্ছে ভাবা যায় না। ‘নিরপেক্ষ’ শব্দের অর্থ কোনো পক্ষে নয়। ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ শব্দের অর্থ তাই ‘কোনো ধর্মের পক্ষে নয়’- অর্থাৎ, সমস্ত ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক বর্জিত। 'Secularism' শব্দের আভিধানিক অর্থ - একটি মতবাদ - যা মনে করে রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষানীতি প্রভৃতি ধর্মীয় শাসন থেকে মুক্ত থাকা উচিত।

কিন্তু এ কী! এদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে আমরা কী দেখাচ্ছি? সেক্যুলার রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানেও এদেশে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়। কোনো প্রকল্পের উদ্বোধন বা শিলান্যাস করা হয় মন্ত্রোচ্চারণের প্রদীপ জ্বালিয়ে,

পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করা হয় নারকেল ফাটিয়ে। রাজনীতির ব্যবসায়ীরা ‘সেক্যুলারিজম’- এর নামে নানা ধর্মকে তোল্লাই দিয়ে সর্বধর্মের সমন্বয় ও সংহতির বাধা গৎই এতদিন বাজিয়ে এসেছেন।”

সেক্যুলারিজম বহু শতাব্দী ধরে (আমাদের উপমহাদেশে) যে ভাবে আচরিত এবং রূপান্তরিত হয়ে আসছে, ‘ধর্মনিরপেক্ষতাকে’ই যদি তার ঠিক বঙ্গানুবাদ বলে ধরে নেই, তবে শুধুমাত্র সব ধর্মের সহাবস্থানেই তার অর্থ পুরোপুরি ধরা পড়ে না। এ কথা সত্য যে, ধর্মনিরপেক্ষতায় তার প্রয়োজন আছে, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়, ধর্ম থেকে চিন্তার মুক্তিতেই ধর্মনিরপেক্ষতা পূর্ণতা পায়। ইতিহাসের পরিক্রমায় দেখা যায়, খুব কম মানুষই পারে আজন্ম লালিত ধ্যান ধারণাকে পরিত্যাগ করে স্বচ্ছভাবে চিন্তা করতে, খুব কম মানুষই পারে স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে। খুব কম মানুষের মধ্যে থেকেই শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে আসেন প্রবীর ঘোষ কিংবা পেরিয়ার স্বামী।

বেশিরভাগ ড্যানিশ এবং সুইডিশ ধর্ম দ্বারা সংজ্ঞায়িত ‘সিন’ বা 'পাপ' নামক কোনো ব্যাপারে বিশ্বাসী নন অথচ দেশ দু’টিতে অপরাধ প্রবণতার হার পৃথিবীর সকল দেশের তুলনায় সর্বনিম্ন। এই দুই দেশের প্রায় কেউই চার্চে যায় না, পড়ে না বাইবেল। তারা কি অসুখী? ৯১ টি দেশের

মধ্যে করা এক নিরীক্ষি অনুযায়ী, সুখী দেশের তালিকায় ডেনমার্কের অবস্থান প্রথম, যে ডেনমার্কে নাস্তিকতার হার মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা আশি ভাগ। স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় মাত্র ২০ শতাংশের মতো মানুষ ঈশ্বরের বিশ্বাস করেন, তারা মনে করেন ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিশ্বাস করেন, মৃত্যুর পরের জগতে। আর বাকিরা স্রেফ কুসংস্কার বলে ছুঁড়ে ফেলেছেন এ চিন্তা।

ঈশ্বরহীন এইসব সমাজের অবস্থা তবে কেমন? সমাজের অবস্থা মাপার সকল পরিমাপ - গড় আয়ু, শিক্ষার হার, জীবন যাপনের অবস্থা, শিশুমৃত্যুর নিম্নহার, অর্থনৈতিক সাম্যাবস্থা, লিঙ্গ সাম্যাবস্থা, স্বাস্থ্যসেবা, দুর্নীতির নিম্নহার, পরিবেশ সচেতনতা, গরীর দেশকে সাহায্য সবদিক দিয়েই ডেনমার্ক ও সুইডেন অন্যান্য সকল দেশকে ছাড়িয়ে সবচেয়ে উপরে। তবে পাঠকদের আমি এই বলে বিভ্রান্ত করতে চাই না যে, এইসব দেশে কোনো ধরনের সমস্যাই নেই। অবশ্যই তাদেরও সমস্যা আছে। তবে সেই সমস্যা সমাধানের জন্য তারা যৌক্তিক পথ বেঁছে নেন, উপর থেকে কারও সাহায্যের অপেক্ষা করেন না, কিংবা হাজার বছরের পুরোনো গ্রন্থ ঘেঁটে সময় নষ্ট করেন না।

অনেকে বলেন, দিন দিন যা দেখছি, সেদিন বেশি দূরে নয় যখন নাস্তিকতা একটি ধর্মে পরিণত হবে। আমি বলি, উঁহু, নাস্তিক্যবাদ কোনো ধর্মতত্ত্ব নয়। ধর্মতত্ত্ব ঈশ্বর ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। যেখানে ঈশ্বর নেই, সেখানে ধর্মতত্ত্বের ভিত্তি নেই। ধর্ম তাকেই বলি, যা ঈশ্বরবিশ্বাস ও ঈশ্বর প্রদত্ত অনুশাসনকে বোঝায়। নাস্তিক্যবাদে ঈশ্বর অনুপস্থিত। নাস্তিক্যবাদীরা ঈশ্বর ও ঈশ্বরের নামে অনুশাসনকে অস্বীকার ও বিরোধিতা করে। নাস্তিক্যবাদীরা মনে করেন মানুষকে সুপথে চালিত করতে রাষ্ট্রীয় অনুশাসন ও বিজ্ঞানই যথেষ্ট। ধর্ম মানে কয়েকটি ভুর্জপত্রে লিখন নয়, যা মেনে চললেই ধার্মিক হওয়া যায় আর না মানলেই নরকের কীট! মানুষের ধর্ম - মানুষের মানবিক গুণ, যা মানুষকে অন্য প্রাণীর থেকে আলাদা করে। আসলে নাস্তিক বলে আলাদা করে ব্যাখ্যা দেওয়ার মতো কিছু আছে বলে মনে হয় না। তবে নাস্তিক, নির্ধার্মিক, অজ্ঞেয়বাদী, সংশয়বাদী - এদের মধ্যে কোনো প্রথাগত বিভেদ নেই, যা আছে তা হল সব বুদ্ধিগত এবং অহিংসতা।

পৃথিবীজুড়ে আস্তিকদের ধর্মচর্চা, ঈশ্বরচর্চার পাশাপাশি চিরকালই বিপরীত স্রোত হিসেবে থেকেছে অবিশ্বাস এবং যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নাস্তিক্যবাদ। এক সময় পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়া কমিউনিজম-এর প্রভাবে নাস্তিকদের সংখ্যা বাড়লেও বর্তমানে তা নিম্নমুখী। কলেজ স্ট্রিটের কানাগলি

থেকে প্রকাশিত 'বিজ্ঞান ও নাস্তিকতা' নামে অতি চটি একটি পত্রিকায় লেখক ভবানীপ্রসাদ সাহু বিভিন্ন তথ্য ঘেঁটে নাস্তিকদের একটা সংখ্যাতত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন ২০05 সালে। এতে বলা হয়েছে ১৯৯২ সাল নাগাদ বিশ্বের জনসংখ্যার ২০.৪ শতাংশ ছিল নাস্তিক বা ঘোষিত নিরীশ্বরবাদী। ১৯৯৬ সালে সেই সংখ্যা হয় ১৯ শতাংশ এবং ২০02 সালে তা পৌঁছোয় ১৫ শতাংশে। এই মুহূর্তে উইকিপিডিয়া খুলে 'উইন-গ্যালপ ইন্টারন্যাশনালের' করা সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে ২০১২ সালে নাস্তিকের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ১৩ শতাংশে, ২০১৫ সালে ১১ শতাংশে এবং ২০17 সালে ৯ শতাংশে।

সবার ফেসবুকে উপচে পড়া ভক্তি, সবার হোয়াটসঅ্যাপে ধর্মের ডিজিটাল বাণী। এর মধ্যেখানেই বকচ্ছপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নাস্তিকতার পাঠ নিয়ে বসা মানুষটা। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় স্বজন মায় পরিবারের মধ্যেও সে একা। সে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে এক সময় ইতু পুজো, নানা রকমের ষষ্ঠী, সন্তোষী মার ভক্ত পরিবার কিভাবে যেন জড়িয়ে পড়েছে গোপাল ঠাকুরের পুজোয়। পাড়ার মোড়ে দিব্যি জমে গেছে গোপালের সিংহাসন, মুকুট, পোশাক, বিছানা, মশারি বিক্রির দোকান। সেক্টর ফাইভে সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করা জিন্স আর টপ পরা মেয়েটা হাতে দিব্যি বেঁধে রেখেছে লাল বিপত্তারিনীর সুতো। বাবার বার বলে

সোমবার উপোষ করছে ১৯-২০র ছেলেরা। অথচ এই বঙ্গেই এক সময় ভূত-ভগবান-শয়তান-এর বিরুদ্ধে কোমর কষে লড়াইয়ে নেমেছিলেন গণ বিজ্ঞান আন্দোলনের মানুষজন।

আত্মীয়-স্বজন, সমাজ-সংসারের দাবি সামলাতে গিয়ে ব্যক্তিগত মতামত, স্বাধীনতার পরিসর কমেই যাচ্ছে নাস্তিক কুলের। কারণ, তার জন্য কোনও স্বস্তির জায়গা নেই। কালিপুজোর সময় শব্দবাজির অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে ঠিক কোথায় গেলে শান্তি মিলবে, তা যেমন সারমেয়রা বুঝতে পারে না, এ অবস্থা অনেকটা যেন তাই। গোটা পৃথিবী জুড়ে, গোটা দেশ, এ পাড়া-সে পাড়া, এমনকি ঘরের ভেতর যেভাবে অতিভক্তির আধিক্য বাড়ছে, তাতে নাস্তিকরা বিপন্ন বইকি। এ বিপন্নতা যাঁরা একটু অন্যভাবে বাঁচতে চান তাদেরও।

এখন প্রকাশ্যেই নাস্তিকতার পক্ষে লেখালেখি হচ্ছে - যে বিষয়টা একসময় কল্পনাও করা যেত না। নিজেকে নাস্তিক সাজিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে থাকার মধ্যে কোন সার্থকতা নেই। এই নিরন্তর লড়াই চলছে, চলবে। যতদিন না পৃথিবী থেকে ধর্মান্ধতা দূর করা যাবে, যতদিন না ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাসের নামে মানুষকে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া বন্ধ না হবে, যতদিন না মানুষ প্রকাশ্যে তার হৃদয়ে জমে থাকা কথাগুলো বলতে পারবে - ততদিন এই আন্দোলন-সংগ্রাম চলবে। সেই

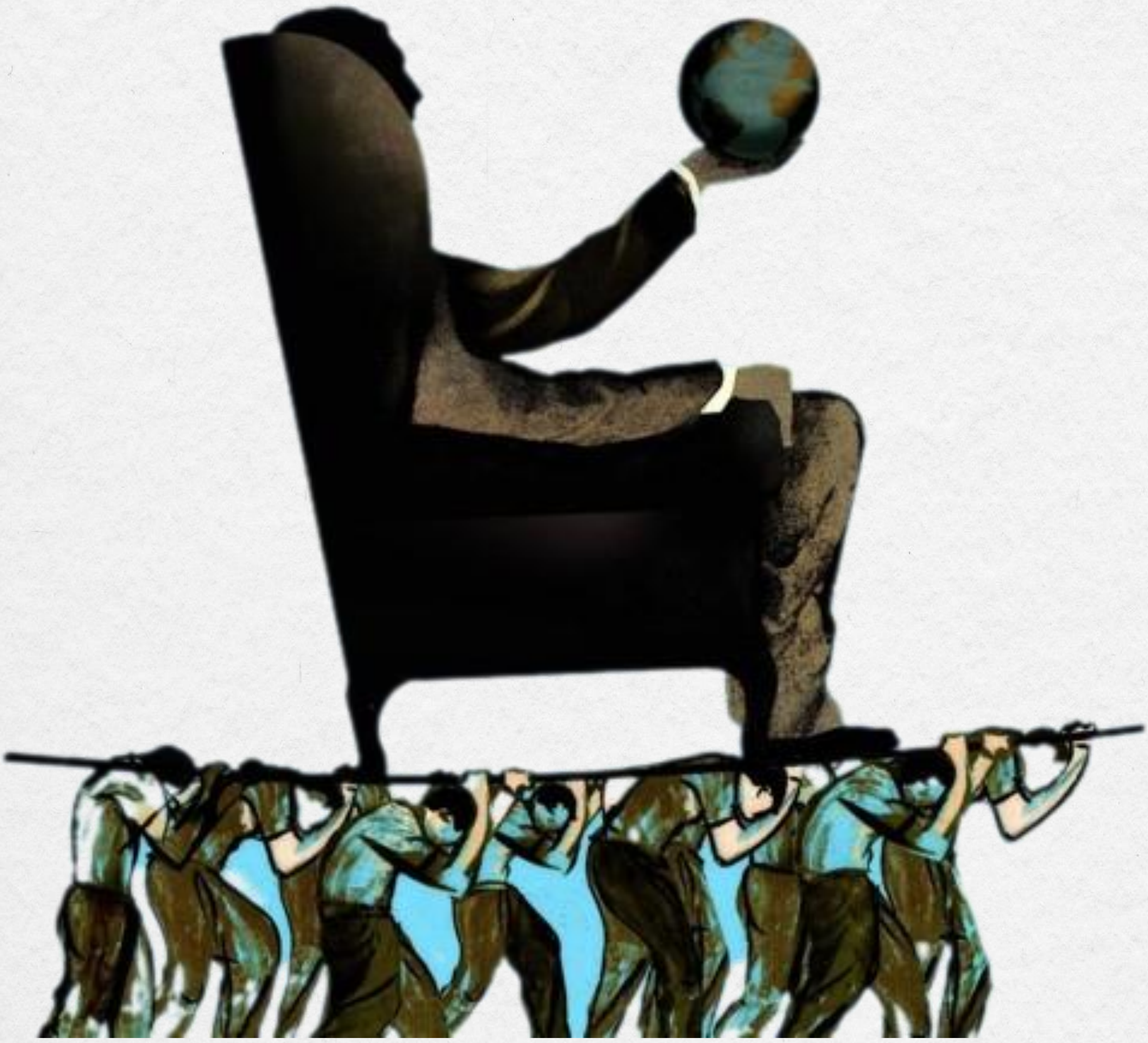
স্বপ্নের লাল সূর্য উদিত হতে আর বেশি দিন সময় লাগবে না।

আমাদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা এবং মানবতা শিশুকাল অতিক্রম করে গেছে বহু আগেই। এখন আর আমরা রূপকথার কল্পিত পরম পিতা নিয়ে মোহিত নই, যে পরম পিতা ‘ডাবের ভেতর জল কেন’ থেকে শুরু করে বিগব্যাং কিংবা ব্ল্যাকহোল পর্যন্ত সবকিছুর পেছনে একমাত্র গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হিসেবে হাজির হবেন আর আমাদের প্রয়োজনের অলীক ত্রাণকর্তা হিসেবে নিজেকে পরিচিত করাবেন। সময় এগিয়েছে অনেক, আমরা নিজেরাই এখন নিজেদের দায়িত্ব নিতে সক্ষম, মানুষ নিজেই আজ নিজের ভাগ্যবিধাতা। আমরা আর রূপকথার জাল বুনে নিজেদের প্রবোধ দিতে চাই না, বরং বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক জ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে এখন জীবন সাজাতে চাই। লেখাটা শেষ করব একজন প্রখ্যাত ব্যক্তির হীরকখণ্ড দিয়ে, “The true atheist will stay silent. To give a theist someone to debate is to harbour his delusion further.” - Charles Darwin.

সূচিপত্র

দাস মনোবৃত্তি

লিখেছেন – মুজিব রহমান



দরিদ্র দেশের প্রায় সকল মানুষের মধ্যেই একটি দাস মনোবৃত্তি থাকে। তাদের মধ্যে নেতৃত্ব দেয়ার স্বপ্ন বা ক্ষমতা থাকে না। এটা অবশ্য আদিকাল থেকেই দেখে আসছি। এথেন্স নগর রাষ্ট্রে অর্ধেকের বেশি ছিল দাস। তারাই ছিল

কর্মঠ ও শক্তিশালী। যদি তাদের মধ্যে কেউ নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হতো তবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও শক্তির জোরে ক্ষমতা অনায়াসেই দখল করে ফেলতে পারতো। রোমান সাম্রাজ্যে আমরা দাসবিদ্রোহ দেখেছি কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওই নেতৃত্ব ব্যর্থতার কারণেই চূড়ান্ত সফলতা আসেনি। ভারতে একটি স্বল্পকালীন দাস রাজবংশ কায়েম হয়েছিল। মোহাম্মদ ঘুরির সেনাপতি ছিলেন দাস- কুতুবউদ্দিন আইবক। ঘুরির কোন সন্তান ছিল না এবং তিনি কয়েকজন দাসকে যুদ্ধে ও শাসনকার্যে পারদর্শী হিসেবে তৈরি করেছিলেন। সে কারণেই আইবক শাসক হতে পেরেছিলেন। মাত্র ৪ বছর শাসনের পরে মৃত্যুবরণ করার পরে শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ ও গিয়াসউদ্দিন বলবনও দাস হিসেবে শাসন কার্য পরিচালনা করেন। ঘুরির উত্তরাধিকার না থাকলে এবং তিনি দাসদের তৈরি না করলে তারা ক্ষমতায় যেতে পারতেন না।

অধিকাংশ মানুষেরই নেতা হওয়ার বাসনা থাকে না। ইতিহাসে অনেককে দেখলে মনে হয়, সম্ভবত নেতা হতে চাইলেই হওয়া যায়। এই চাওয়াটা ইচ্ছে করলেইতো হয় না। তার মধ্যে সাহস ও বিচক্ষণতাওতো থাকতে হবে। আবার ক্ষমতা স্পৃহাও গুরুত্বপূর্ণ। আমি নেতা হতে চাই- এমন একটি ভাবাদর্শ তাকে অনেক দূরই এগিয়ে দিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমরা একালে ডুনাল্ড ট্রাম্পকে

দেখলাম, নেতা হতে চাইতে। তার রাষ্ট্র চালানোর যোগ্যতা ছিল না, বিচক্ষণতাও ছিল না তেমন কিন্তু স্পৃহাটা ছিল প্রকট। তিনি জাতীয়তাবাদের ধুয়া তুলে ঠিকই রাষ্ট্রপতি হয়ে গেলেন। অবশ্য এমন নেতৃত্ব সচরাচর ধর্ম, জাতীয়তাবাদ, সামরিক শক্তির সহায়তা নিয়ে ক্ষমতায় আসে। আফগানিস্তানে তালেবান নেতা মোল্লা ওমর ধর্মকে ব্যবহার করে, ভারতের নরেন্দ্র মোদী হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদকে ব্যবহার করে এবং হুমো এরশাদ সামরিক শক্তিকে ব্যবহার করে ক্ষমতায় এসেছেন নিজেদের দেশ চালানোর যথেষ্ট যোগ্যতার ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও। তবে তাদের আমি সাহসীই বলি। যোগ্যতা না থাকার পরেও ক্ষমতালিপ্সা তাদের ক্ষমতার মসনদে পৌঁছে দিয়েছে। বার্ট্রান্ড রাসেল তার 'ক্ষমতা গ্রন্থে লিখেছেন, 'যে সমাজে অভিজাততন্ত্র কিংবা বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের মতো কোনও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব নেই, সেখানে যারা অধিক ক্ষমতালিপ্সু তারাই ক্ষমতা অর্জন করে। সেখানে গড়পড়তা সাধারণ লোকদের চাইতে যাদের ক্ষমতাপ্রীতি বেশি তারাই ক্ষমতা দখল করতে পারে।' রাসেলের এই পর্যবেক্ষণ আজকের দুনিয়াতেও লেগে যাচ্ছে। সাহসী মানুষের মধ্যে ক্ষমতাস্পৃহাকে বাড়িয়ে দেয়।

আমরা চেঙ্গিস খান বা কয়েকজন সফল ধর্মপ্রচারকের জীবন বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই তারা ক্ষমতা দখলের জন্য কি প্রাণান্তকর প্রচেষ্টাই না করেছেন। তারা বিভিন্ন

বাধাকে অতিক্রম করেছেন এবং দৃঢ়ভাবেই নিজেকে টিকেই রেখেছেন প্রতিকূলতায় এবং চাওয়াটাকে সফলতার দিকেই নিয়ে গিয়েছেন। এর বিপরীতে সাধারণ মানুষের একটা মনোভাব রয়েছে। তারা সাতপাঁচে যেতে চায় না। হাঙ্গামা এড়িয়ে চলতে চায়। স্ত্রী-সন্তানদের নিরাপদে রাখতে পারলেই সুখবোধ করেন। তারা ক্ষমতায় যেতে চায় না আবার কাউকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিতেও প্রচেষ্টা চালায় না। তারা আশায় থাকে কেউ এসে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিবে। কিন্তু সমাজে দাস মনোবৃত্তি অধিক হলে, নতুনরা ক্ষমতায় এসেই পুরাতনের মতোই আচরণ করে। সে দেখতে চায় চারদিকে অসংখ্য অনুগত মানুষ। তাঁর আঙুল উত্তোলনে মানুষও উত্তোলিত হয়। বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণে মানুষকে উদ্বেলিত হতে দেখেছি। 'পারফিউম' নামের একটি সিনেমা দেখেছিলাম। অসাধারণ সিনেমা। সেখানে নায়ক একটি স্পেশাল পারফিউম শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। সেই পারফিউমের আকর্ষণে মানুষ পাগল হয়ে উঠে। পারফিউম লাগিয়ে রুমাল দুলিয়ে মানুষকেও দোলাতে থাকেন। একসময় নিজের মাথায় সেই পারফিউম ঢেলে দেন। মানুষ তাকে সাবাড় করে দেয়। দাস মনোবৃত্তিটা এমন যে, সেখানে দাসরা নেতার প্রতি প্রচণ্ড আস্থা প্রদর্শন করে। নেতাই যেন সব। তার বিজয় মানে নিজের বিজয়। তার দোষের বিপরীতে নিজেই একটা অজুহাত দাঁড় করিয়ে নেয়। নেতার প্রতি তীব্রভাবেই অনুগত থাকে। মনে হবে,

'নেতৃত্বের জাদু', বাস্তবিক ঘটনা হল- দাস মনোবৃত্তির ফল এটা। কিছু মানুষ সর্বোচ্চ নেতার পেছনে হাঁটতেই পছন্দ করে কিন্তু কোন ভাবেই নেতা হতে চায় না। নেতাদের কাছেও তারা খুবই উপাদেয় খাদ্য। তারা খাদ্য হয়ে যাবে তবুও নেতার প্রতি আস্থা হারাবে না। এমনটা আমরা ওয়াজের বক্তার ক্ষেত্রেও দেখি। তাদের অনুরাগীরা নিজের স্ত্রী, কন্যাকেও দিতে পারে। বক্তা মামুনুল হকের ক্ষেত্রেও দেখলাম, তার দুই মুরিদই নিজের সুন্দরী স্ত্রীকে প্রিয় হুজুরের জন্য ত্যাগ করেছে। কিন্তু তাদের মনে একবারের জন্যও প্রশ্ন জাগবে না, 'হুজুর তার জন্য কি ত্যাগ করবে?'



এ ভূখণ্ডে স্বাধীনতা আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, ব্রিটিশ খেদাও আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন

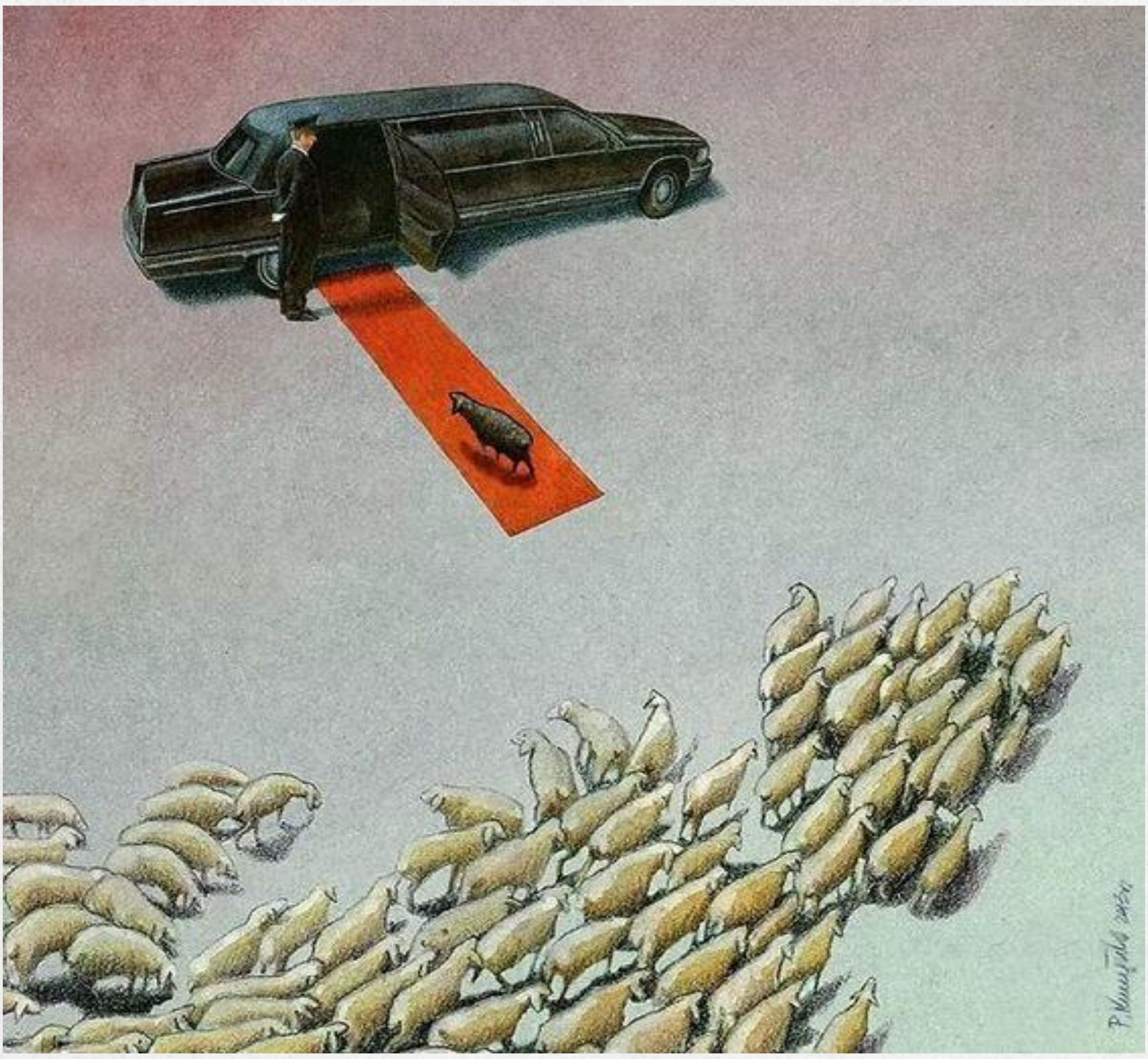
ইত্যাদি কোন ক্ষেত্রেই আপনি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের দেখেননি। একইভাবে একসময় ভারতজুড়ে ছিল বৌদ্ধ বিহার। সেখানে বৌদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হতো। যখন বৌদ্ধ পাল শাসনের অবসান হচ্ছিল, বিভিন্ন বিহার দখলে নিচ্ছিল সেনরা তখন আমরা কোথাও প্রতিরোধ দেখিনি। আমরা গীর্জা, মন্দির প্যাগোডারও কোন প্রতিরোধ দেখিনি। সোমনাথ মন্দিরে ১৭ বার হানা দিয়ে লুণ্ঠন করে সুলতান মাহমুদ আর ১৭ জন অশ্বারোহী নিয়ে বখতিয়ার খলজি দখলে নেয় লক্ষণ সেনের রাজত্ব! কারণ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা শিক্ষাগ্রহণ করে অন্যের গলগ্রহ হয়ে। তাদের মধ্যে একটি দাসমনোবৃত্তি কাজ করে। হেফাজতের আন্দোলনের পরিসমাপ্তি আমরা দেখলাম। একটা দৃশ্য সবাই দেখেছেন যে, তালবেলামরা কান ধরে সারিবদ্ধভাবে মতিঝিল ছেড়ে যাচ্ছে। ভেড়ারপালের সাথে মিল করতে পারবেন। হাজার হাজার ভেড়ার পালে একটি নেকড়ে অনায়াসেই ঢুকে একটি ভেড়াকে খেয়ে ফেলতে পারে। ভেড়ার মধ্যে রয়েছে দাসমনোবৃত্তি আর নেকড়ের মধ্যে সাহস। ভেড়ার মোট শক্তি বিশাল কিন্তু তারা পারে না। কতজন ব্রিটিশ ৩০ কোটি ভারতবাসীকে শাসন করতো? ভারতে অনায়াসেই আর্যরা ঢুকে যায় এবং তাদের দেবদেবীদের চাপিয়ে দেয়। বহিরাগত মুসলিমরাও অল্পই ছিল কিন্তু তারাও শুধু ক্ষমতাই দখল করেনি, দাসমনোবৃত্তির ভারতবাসীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে মুসলিম বানিয়ে ফেলে। স্থানীয় ধর্ম আর ভারতে বলিষ্ঠভাবে

নেই। বৈদিক ও ইসলাম ধর্ম দুটিই বহিরাগত ধর্ম। পুরো ভারত ছিল কৃষি নির্ভর- জালিক আর হালিক; মানে জেলে আর হালচাষি! আর্য ও বহিরাগত মুসলিমরা ছিল যোদ্ধা। যেন ভেড়ার পালের উপর নেকড়ের হামলে পড়ার মতো ঘটনা ঘটলো!

আজকেও আমরা দেখি এদেশে একজন নেতার পেছনে শতে শতে লোক হাঁটে। কেউ কখনো একপেট খেতে পারে বা চা-বিস্কিটেই খুশি থাকে। নেতা এক পেট খেতে দিলে বিরাট কিছু। এই প্রবণতাটা আমরা পাশ্চাত্যে দেখি না। তারাও দলকে সমর্থন করে কিন্তু নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য, আয়-রোজগার ছেড়ে দিয়ে নেতার পেছনে পড়ে থাকে না। তারা ভোট দিতে আসে। আর নেতাকে লিফলেট নিয়ে দৌড়াতে বা পাড়ার মোড়ে হ্যান্ড মাইকে একা একা কথা বলতে দেখা যায়। আর আমাদের দেশে নেতা আসবেন বলেছেন সকাল ১০ টায়। ভেড়ার পাল কিন্তু অপেক্ষা করে থাকে রাত ১০টা পর্যন্ত।

দক্ষিণ এশিয়া জুড়েই দেখবেন, প্রত্যেক নেতার সন্তানরাই কোটি কোটি টাকার মালিক। ইউটিউবে সার্চ দিন দেশের সেরা ১০ ধনী। এরমধ্যে নেতাদের ছেলেদের পেয়ে যাবেন যারা কিছু না করেও হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। দেশের কোন মানুষই কিন্তু প্রশ্ন করে না, ‘তিনি এতো টাকার মালিক কি করে হলেন? তার তো কোন

কাজকর্ম নেই?’ দাস মনোবৃত্তির মানুষ এটা ভাবতেও পারে না। তারা খুশি হয় যে, তার নেতা হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছে। সেই টাকাও দেশে নেই। তাদের পাচার করার কারণেই দেশের মানুষ উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও সুফলটা পায় না। এতো মানুষ নামমাত্র বেতনে গার্মেন্টে কাজ করে বা স্ত্রী-পরিজন ছেড়ে ঊষর মরুভূমিতে পড়ে থেকে অর্থ উপার্জন করে শেষ পর্যন্ত সুখের মুখ দেখে না। বহু প্রবাসীই তার সম্পদ হারিয়ে ফেলে কতিপয় দস্যুর কাছে।



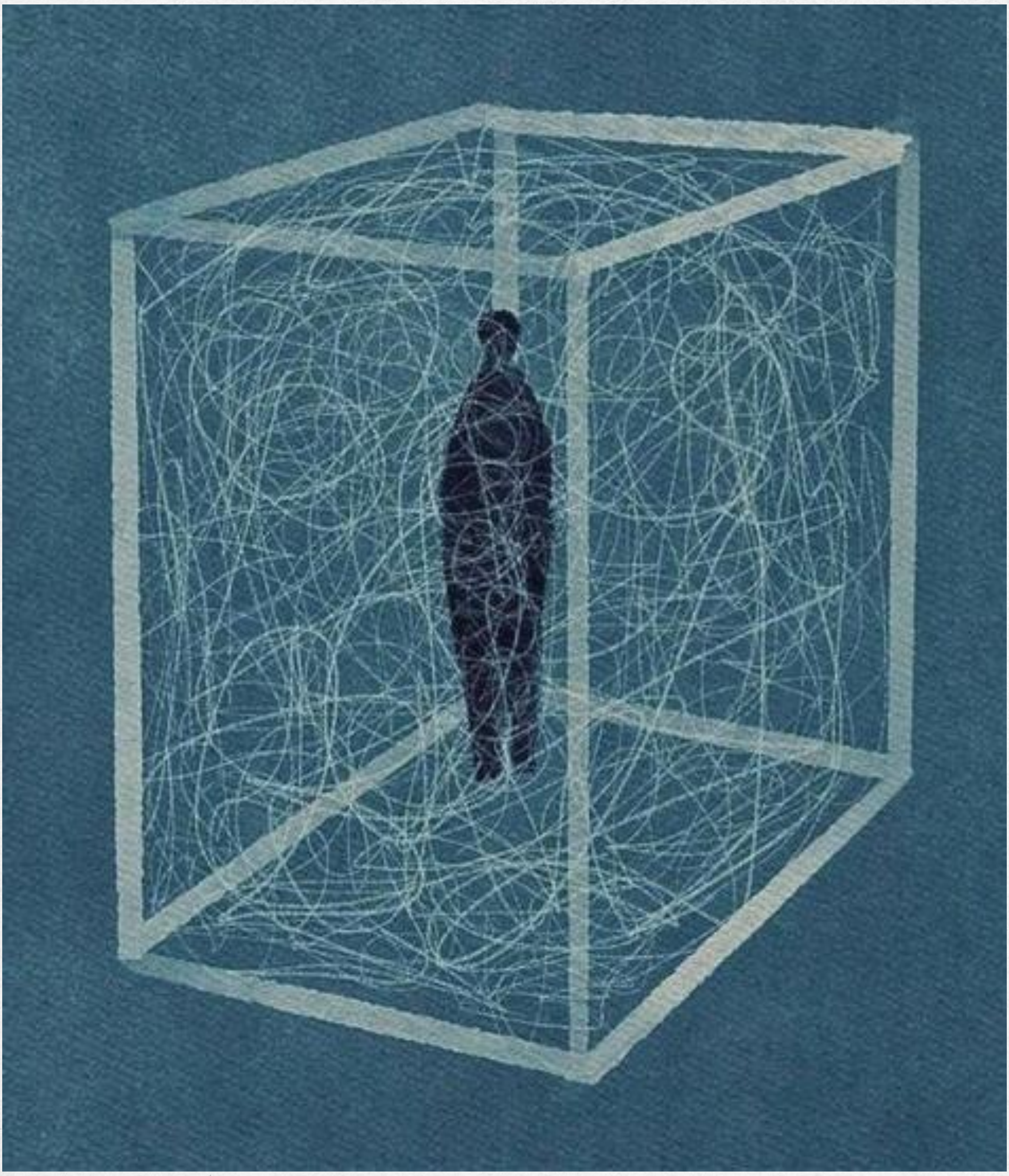
দাস মনোবৃত্তি আত্মসম্মান নষ্ট করে দেয়। তাদের মধ্যে কর্মের স্পৃহাও নষ্ট করে। মানবাধিকার পাওয়ার দাবিও করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। দিনের পর দিন ভোট না দিতে

পারলেও কোন ক্ষোভ তৈরি হয় না। এদেশে দুর্ভিক্ষে প্রচুর লোক মারা যেতো। দেখা যেতো তখনও জমিদারদের গোলা ভরা ধান ছিল। কিন্তু সেই ধান ছিনিয়ে নেয়ার সাহস হতো না। ছিয়াত্তরের (১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ) দুর্ভিক্ষের আগে বাংলার মানুষ ছিল ৩ কোটি। দুর্ভিক্ষের পরে বেঁচে ছিল ২ কোটি মানুষ। মানে হল, এক কোটি মানুষ না খেয়ে মারা গেল! কিন্তু জমিদারদের গোলা লুণ্ঠনের ঘটনা ঘটেনি। খাদ্যের সুষম বন্টন হলে সবাই বেঁচে থাকতে পারতো। পঞ্চাশের (১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ) দুর্ভিক্ষে ব্রিটিশ সরকার জাপানিদের ভয়ে খাদ্য প্রত্যাহার করে নিলেও বাংলায় মোট খাদ্যের যে মজুদ ছিল তাতে ৩০ লক্ষ মানুষকে না খেয়ে মরার কথা নয়। তখনও বাজারগুলোতেও মজুদদারদের কাছে প্রচুর চাল ছিল। কিন্তু মানুষের কাছে টাকা ছিল না। ভুখা-নাঙ্গা মানুষ হাত পাততো কিন্তু খাবার ছিনিয়ে নিতে পারতো না। দলে দলে লোক একটু খাবারের জন্য হাত পেতে থাকতো কিন্তু পেতো না। আতঙ্কে ধনিরা আরো মজুদ করে ফেলেছিল। বিহার থেকেও হাজার হাজার অভূক্ত মানুষ এসেছিল কলকাতায়। জমিদারগণ এটো ফেললে তা খেতে ঝাপিয়ে পড়তো। মানুষে কুকুরে লড়াই চলতো ডাস্টবিনে। কিন্তু ছিনিয়ে নেয়ার স্পৃহা, নেতা হওয়ার স্পৃহা কিংবা বেঁচে থাকার স্পৃহা তাদের মধ্যে ছিল না। এখনো দক্ষিণ এশিয়ার সাধারণ মানুষকে সেই দাস মনোবৃত্তিরই মনে হয়।

সূচিপত্র

ধর্মকারার প্রাচীর

লিখেছেন – মহম্মদ মহসীন



দক্ষিণ পূর্ব আফ্রিকার একটি দেশ মালাউই (Malawi)। সে দেশের প্রধান ভাষা চেচুয়া (chichuwa)। সে ভাষায়

একটা কথা আছে। "M' mera mpoyamba". ইংরাজি করলে হয় catch them young.

অর্থাৎ বোধবুদ্ধি গজানোর আগেই পাকড়াও করো। সারাজীবন, সেই ধারণাতেই বাঁধা থাকবে। এমন বন্ধন যে সে বন্ধন খুলে দিলেও সে বুঝতেও পারবে না। কথাটি এত সত্য যে বিভিন্ন ধর্মীয় দর্শণের অনুসারী দল এটাই বাস্তবায়িত করে থাকে। ফলও ফলে।

একমাত্র যুক্তিবাদ বলে, মানুষ বড় হোক, চিন্তা করতে শিখুক, তবেই তার মধ্যে যুক্তিবাদের আলো দাও। তার জীবনে কোন পথে চলবে, বড় হোক, বড় হয়েই তা ঠিক করবে। তার মধ্যেকার অন্ধ বিশ্বাসের অন্ধত্ব দূর হলে তবেই মানবিক গুণের বিকাশ ঘটবে।

কিন্তু সমাজ মানুষকে বড় হতে দেয় না। মানুষের বয়স বাড়ে, সামাজিক প্রতিপত্তি বাড়ে, নাম ডাক বাড়ে, কিন্তু সেই মানুষ কখনো বড় হয় না।

সুনীল গাঙ্গুলী লিখেছেন, "এতগুলো শতাব্দী গড়িয়ে গেল,
মানুষ তবু ছেলেমানুষ থেকে গেল

কিছুতেই বড় হতে চায় না

এখনো বুঝলো না যে 'আকাশ' শব্দটার মানে

চট্টগ্রাম কিংবা বাঁকুড়া জেলার আকাশ নয়

মানুষ শব্দটাতে কোনো কাঁটাতারের বেড়া নেই

ঈশ্বর নামে কোনো বড়বাবু এই বিশ্বসংসার চালাচ্ছেন না

ধর্মগুলো সব রূপকথা

যারা সেই রূপকথায় বিভোর হয়ে থাকে

তারা প্রতিবেশীর উঠোনের ধুলোমাখা শিশুটির কান্না শুনতে পায় না।"

মনোবিদ বলেন, শিশুমনে যে ধারণা প্রোথিত করা হবে ছোটবেলাতেই, তা থেকে নট নড়ন-চড়নের মানসিকতা তার ষোলোআনা।

ঠিক এইকারণেই ধর্মের অন্ধবিশ্বাস প্রোথিত হয়ে যায় ছোট থেকেই। ভক্তি গ্রাস করে যুক্তিশীল মানসিকতাকে।

ধর্মের প্রতি অন্ধভক্তি মানুষের মধ্যেকার র‍্যাশানাল চিন্তনশীলতাকে গ'ড়ে উঠতে দেয় না। জন্মগতভাবে মানুষ যে যুক্তিশীল মানসিকতা পেয়ে থাকে, তাকে বাঁচতে দেয় না রাজনীতিক ও সামাজিক স্বার্থনীষ্ঠ মদতে পুষ্ট অন্ধবিশ্বাসে বিশ্বাসী জগৎ। মারতে মারতে, মেরেই ফেলে।

কিভাবে এই অন্ধবিশ্বাস একটি শিশুকে, তার পরিবার ও সমাজকে বিপথে চালিত করে তা উপলব্ধি করলে দুঃখ করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।

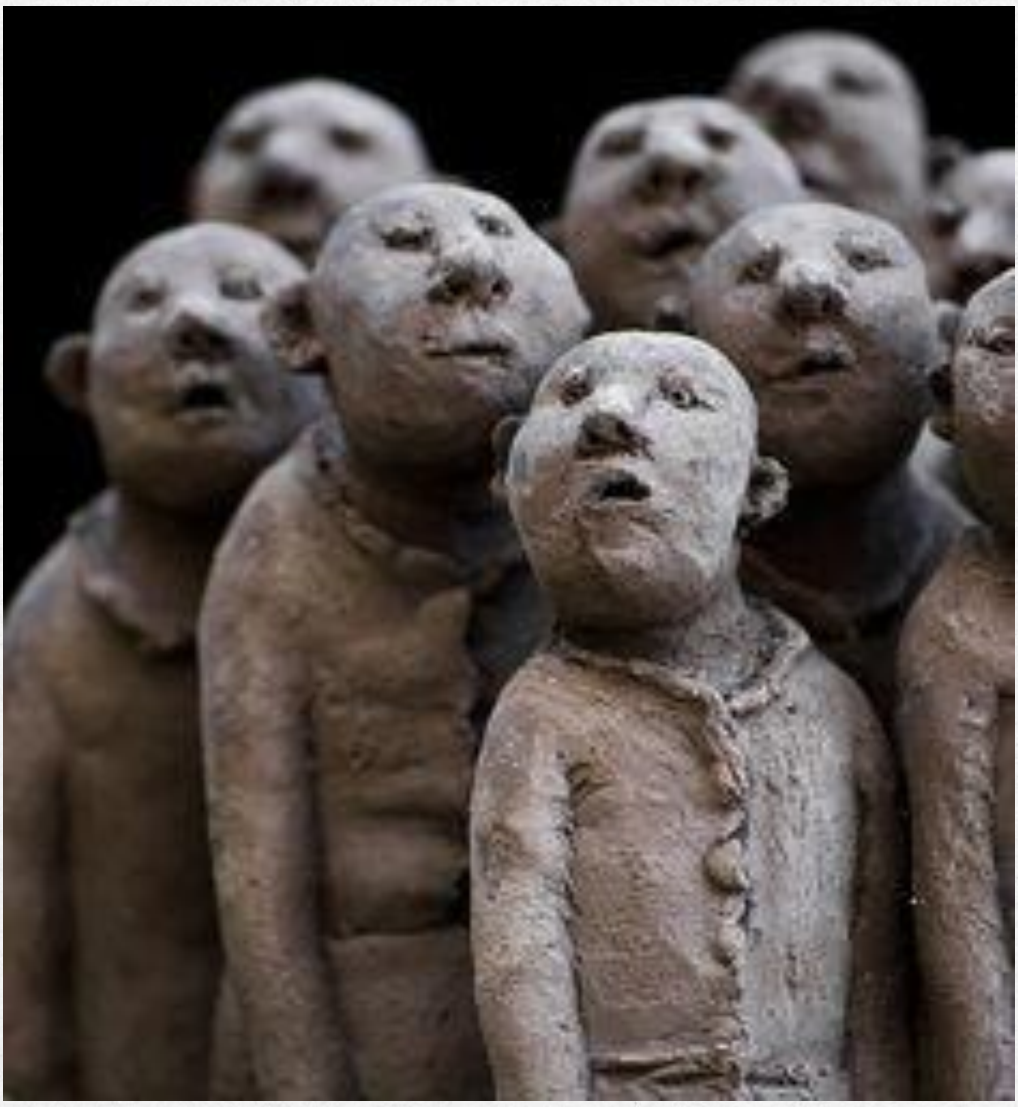
একটি উদাহরণ দিলে বক্তব্যটি হয়তো আর কিছুটা স্পষ্ট হতে পারে। আমার বাস্তব জীবনে দেখা ঘটনা। মুসলিম পরিবারেই বিভিন্ন সামাজিক স্তরে, ছোট শিশুদের আরবী

শিখতে চাপ দেওয়া হয়, নামাজ পড়া শিখিয়ে দেওয়া হয়। সবথেকে ভয়ঙ্কর ব্যাপার রমজান মাসে এইসব ছোট ছোট শিশুদের শেখানো হয় সারাদিন নিরম্বু উপবাসের মাধ্যমে কৃচ্ছসাধন করেই ঈশ্বরের কৃপালাভ করা যায়। যার কাছে ক্রিকেট, ডাংগুলি, নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্ব, লেখাপড়া এইসব বিষয় হল জীবন্ত সেখানে কিম্ভুতকিমাকার ঈশ্বর ধরে এনে তাদের মনের মধ্যে গুঁজে দেওয়া হয়, সর্বক্ষণ তার

অস্তিত্বহীনতাকে ঢাকতে নানান ফাঁদ ব্যবহার করে মেরে ফেলা হয় তার মাঝে প্রশ্ন করার মানুষটাকে। ছাঁচে ঢেলে তাকে বানিয়ে ফেলা হয় হিন্দু অথবা মুসলিম। যাতে মানুষ হতে না পারে তার চেষ্টা থাকে নিরন্তর।

শিশু থেকে একটু বড় হওয়া কিশোরী-কিশোরদের কাছে কষ্টকর কাজগুলি সম্পন্ন করার চ্যালেঞ্জ নেওয়াটাই একটা এ্যাডভেঞ্চার। জীবনের প্রকৃত এ্যাডভেঞ্চার, জীবনের প্রকৃত কষ্টকর কাজগুলিকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়ে তা অতিক্রম করার পরিবর্তে তাদের সামনে রাখা হয় সারাদিন না খেয়ে দিনাতিপাত করার মেকি চ্যালেঞ্জ। জীবনে একটি মেকি ও পলায়নপর জীবনশৈলী গড়ে তোলা হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এভাবেই যুবসমাজের মধ্যে মুক্তিকামী চেতনা গড়ার পরিবর্তে ইংরাজদের মদতপুষ্ট এইধরণের মেকি চ্যালেঞ্জকে যুবসমাজে ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছিল ধর্মগুরুরা। এভাবে যুবসমাজ বাস্তব দায়িত্বের থেকেও এক

অলৌকিক দায়কে বেশি প্রাধান্য দিয়েছিল। ক্ষতি করেছিল স্বাধীনতা আন্দোলনকে। জনৈক বিপ্লবীর এভাবেই মগজধোলাই হয়। বিপ্লব ছেড়ে ধ্যানট্যানে মনোযোগ দেন, আমরাও তার বিল্পবী জীবন নিয়ে যত না আগ্রহী, তার শতগুণ বেশি আগ্রহ নিয়ে লম্ফঝম্ফ করি তার এই ধর্মান্ধীয় জীবন নিয়ে।



আসলে আবার বলি, ধর্ম হলো পরিশ্রম না করে জীবিকার্জনের সহজতম উপায়।

যেহেতু ধর্ম রাজনীতির এক মোক্ষম হাতিয়ার, যেহেতু ধর্মকে ব্যবহার করে সম্প্রদায়গত আবেগকে কাজে লাগিয়ে ভোটবাক্সে সাফল্য পাওয়া যায়, যেহেতু ধর্মনেশায় আচ্ছন্ন জনগনকে তাদের নেশার বস্তুটি সরবরাহ করতে পারলেই রাজনৈতিক ফায়দা তোলা যায়, তাই ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা

পাওয়ার সমস্যা হয় না। ধর্ম নেশাগ্রস্তদের ধর্মীয় আকাঙখা পূরণ করতে পারলেই অনেক দায় পূরণ না করলেও রাজনীতিগত কোনো ক্ষতির আশঙ্কা থাকে না, তাই মানুষ ধর্মের অন্ধকারে বাস করুক, পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রই সেটি চায়। ধর্মনেশায় উৎসাহ যোগায়, ধর্মান্ধতা প্রসারে ইন্ধন যোগাতে চায়। ইংরাজ শাসনও চেয়েছিল, সেই বিপ্লবী আরো কিছু যুবককে বিপথে চালিত করে ধর্ম ধর্ম করুক, তাতে তাদের শাসন কায়েম রাখায় অনেক সাহায্য করা হবে। ইংরেজদের দেখা যায় অনেক "মহাপুরুষের" পাশে দাঁড়াতে। “মহাপুরুষ” গুলিকেও দেখা গেছে, ইংরেজদের পাশে দলবল নিয়ে সমর্থন দিতে।

আজ যা বলতে এসেছি, ধর্মের যাপন, অভ্যাস শিশুদের মধ্যে প্রোথিত করে। সেই শিশুদের মধ্যে জিজ্ঞাসার মানসিকতাকে ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে দেয়। কেন রাতদুপুর থেকে ভোরবেলা পর্যন্ত মাইক্রোফোন বাজিয়ে নিজ ধর্মাচরণের কারণে অপরের জীবনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছি, এ প্রশ্ন তাদের মনে আসার বীজটিকে মেরে মেরে মৃত করেই ছাড়ে, সুনাগরিক হওয়া তো দূরস্থান, কেন সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদকে জিইয়ে জিইয়ে মানুষের সমাজকে ইতরপ্রাণীর জীবন থেকেও নিকৃষ্ট করে তোলা হচ্ছে ধর্মের যাপনে, সে প্রশ্ন তাদের মনে আসে না। ধর্ম কেন পুরুষতান্ত্রিকতায় পক্ষপাতিত্ব করে নির্লজ্জভাবে, এ

প্রশ্ন আসেনা, কেন দিনের পর দিন ভোরের আজানে মানুষকে কষ্ট দেওয়া হবে, কেন সংকীর্তনে অবিরাম মাইক বাজিয়ে মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলা হবে, কেন ধর্মের আশ্রয়ে থেকে মানুষের উপর অত্যাচার করা হবে, এসব প্রশ্ন তাদের মনে আসে না। এক্কেবারে বোধ বুদ্ধি সহমর্মিতার দরজা জানালা বন্ধ করে অচল থাকার নেশায় বদ্ধপরিকর এই সকল মৃতমনের রোবটেরা শুধু চিন্তা করতে শেখায় নিজের কথা, শুধুই নিজের কথা। এসেছি একা (কে, কোথা থেকে?), যেতে হবে একা (কোথায়?) এসব পাতি কথাগুলি তাদের মনে গভীর জীবনদর্শণ।

এমন নির্লজ্জ স্বার্থপরতার শিক্ষা দেয় সকল ধর্মদর্শণ।

কেন নারী কণ্ঠে আজান শুনি না, কেন নারীকে ধর্মগ্রন্থে আপনার অধিকার আদায়ের পথে পদে পদে বাধাগ্রস্ত হতে হয়, সে বিষয়ে পিছনপানে ঘোরা সমাজের চাকাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আন্দোলনের কথা ধার্মিকেরা চিন্তাও করতে পারে না।

শিশু থেকে কিশোরী/কিশোরদের ধার্মিক করে গড়ে তোলা হয় এভাবেই, যাতে তাদের বোধের দ্বার রুদ্ধ থাকে চিরকাল। বিজ্ঞানের সারতথ্যের সাথে ধর্মগ্রন্থের সংঘর্ষ থাকলে ধর্ম তাদের মিথ্যাকে জোর দবরদস্তি চাপিয়ে দিতে মরিয়া। এজন্য বিজ্ঞানীদের পোড়াতে, অত্যাচার করতে, হত্যা করতেও তাদের হাত কাঁপে না

এরা আসলে এক বোধহীন রুদ্ধমনের প্রাণী। তাদের মনে প্রশ্ন জাগে না, যেখানে ছয়মাস দিন, ছয়মাস রাত্রি, সেখানকার অধিবাসীরা কিভাবে সারাদিন নিরম্বু উপবাস পালন করবে? "পৃথিবী ঘোরে" এই সামান্য তথ্যটিও যার অজানা সেই ধর্মগ্রন্থ প্রণেতা কিভাবে মহাবিশ্ব নিয়ে লেখার ধৃষ্টতা দেখান। বিজ্ঞানের ভবিষ্যত নিয়ে যার সামান্যতম ধ্যান ধারণা নেই, তিনি কিভাবে শ্লোক-সত্য লেখেন যে গর্ভস্থ ভ্রুণের লিঙ্গ, শিশুর জন্মের পূর্বে স্বয়ং ঈশ্বর ছাড়া যেখানে গর্ভস্থ ভ্রুণের লিঙ্গ কোনো মানুষ জানতে পারবে না?

এসব প্রশ্ন ধার্মিকদের বিব্রত করে না, অস্থির করে না, ধর্মের প্রশ্নাতিত আনুগত্যে সন্দেহ জাগাতে পারে না।

ধর্ম যুবতী/যুবকদের মনকে আলোড়িত করে প্রশ্ন জাগায় না, কেন রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গের" জগমোহন বালবিধবা ননীবালার বিধবা-মাতৃত্বকে সমর্থন করেন, কেনইবা শচীশের সঙ্গে বিবাহে উদ্যোগী হন। তাঁর কথা, “দেখ্ বাবা, আমরা নাস্তিক, সেই গুমরেই আমাদিগকে একেবারে নিষ্কলঙ্ক নির্মল হইতে হইবে। আমারা কিছুকে মানিনা বলিয়াই আমাদের নিজেকে মানিবার জোর বেশি।”

যুবতী/যুবকদের মনে নাস্তিকতার প্রতি শ্রদ্ধা জাগাতে পারে না।

আকাশের পাখিকে বেড়ি পরিয়ে খাঁচার ভিতর রাখতে রাখতে যেমন তাকে খাঁচাতেই অভ্যস্ত করে ফেলা হয়,

খাঁচার দরজা খুলে দিয়ে যা রে উড়ে যা রে পাখি বলে পীড়াপীড়ি করলেও খাঁচা থেকে বেরিয়ে ওড়ার ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তি তার আর থাকে না, তেমনই

ধর্মকারার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে থাকতে বদ্ধমনা ধার্মিকেরাও নিজেদের মুক্তিস্পৃহাকে কখন যেন হত্যাই করে ফেলেছে, তা তাদের চেতনাতেই আসে না।

ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্রহানার কথা তো তাদের মাথায় স্বপ্নেতেও আসে না। সেই প্রাচীরের দরজা খোলা থাকলেও প্রকৃতির বুকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার কথা তারা ভাবতেও পারে না।

তাদের চেতনার দ্বার খোলার জন্য আমাদের নিরলস প্রয়াস তাই জারি থাকবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, নিরবধি কাল পর্যন্ত। দেশ থেকে দেশান্তরে।

সূচিপত্র

বিশ্বাসবাদ ও কর্পোরেটদের লালসার শিকার যোশীমঠ

লি খে ছে ন – পী যূ ষ কা ন্তি বা লা



দেশ বিদেশের খবরের শিরোনামে আজ 'যোশীমঠ'। উত্তরাখন্ডের চামোলি জেলার ধর্মনগরী যোশীমঠ। নিউজ ব্রেকিং নিউজ, টিভি চ্যানেল এ বিশেষজ্ঞদের নিয়ে সঙ্গে রাজনৈতিক দলের(সে শাসক বা বিরোধী দলের হোক) গম্ভীর আলোচনা। অবশ্য শেষ পর্যন্ত বিশেষজ্ঞদের মতামত বা সমাধানের পরামর্শ চাপা পড়ে যায় রাজনৈতিক দলের বক্তাদের চিল চিৎকারে। কারণ

বোঝা যায় উদ্দেশ্য সমাধানের পথ বাতলানো নয়। ঘটনা যখন হট কেক, টি আর পি বাড়িয়ে নাও আর কি। হঠাৎ খবরের শিরোনামে যোশীমঠে ধস নেমেছে।বিশেষজ্ঞরা যত সময় গড়াচ্ছে ততই শোচনীয় ও ভয়াবহ পরিস্থিতির শিকার হচ্ছে যোশীমঠ'। বিরাট বিরাট ফাটলের কবলে ঘর বাড়ি হোটেল রাস্তা ঘাট। প্রাচীন ধর্মস্থান যোশীমঠ' সেখানকার বাসিন্দারা হাড় কাঁপানো এই শীতে বিপর্যয়ের আশঙ্কায় মানুষ ঘর ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন। বেলাগাম ঘর বাড়ি নির্মাণ ও পর্যটকদের উত্তরোত্তর ভিড়ে এই তীর্থস্থানগুলির অস্তিত্বও আজ বিপদের মুখোমুখি। সারা বছর পর্যটকদের ভিড় লেগেই থাকে। সেই ভিড় সামাল দিতে বিগত দশকের তূলনায় অনেকটাই বেড়েছে হোটেল, লজ, হোম স্টে ও ধর্মশালার সংখ্যা। এই বেলাগাম নির্মাণ যোশীমঠ' ধ্বংসের একটা বিরাট কারণ বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

অন্য একটি কারণ হিসেবে উঠে এসেছে NTPC র তপোবন বিষ্ণুগড় প্রোজেক্ট। সেখানে ১২ কি. মি. পাহাড়ি এলাকায় টানেল করা হচ্ছে যেখান দিয়ে গঙ্গার ধৌলী নদীর জল টানেলে এসে বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে। সেই সুড়ঙ্গের জন্যই যোশীমঠের মাটি আলগা হয়েছে। ইসরো জানিয়েছে গত ২০২২ র এপ্রিল থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ৮.৯ সেন্টিমিটার যোশীমঠ বসে গিয়েছে। এবং গত ২৭/১২/২০২২ থেকে ০৮/০১/২০২৩ উপগ্রহের নেওয়া

উপগ্রহচিত্রে ধরা পড়েছে গাড়োয়াল হিমালয়ের জনপদ মাটিতে তলিয়ে যাচ্ছে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে। অর্থাৎ মাত্র ১২ দিনেদিনের ব্যবধানে তোলা ছবিতে দেখা গিয়েছে যোশীমঠের মাটি ধসে গিয়েছে ৫.৪ সেমি। ইসরো রিপোর্ট অনুযায়ী শুধু যোশীমঠ' নয় আলির রাস্তাও ধ্বেস যেতে পারে। এই মুহূর্তে যে হারে ভূমিধস হচ্ছে তাতে পুরো যোশীমঠ' তলিয়ে যেতে পারে। শুধু যোশীমঠ' নয়, তলিয়ে যেতে পারে নৈনিতাল, উত্তর কাশীর অস্তিত্বও বিপদের মুখে। অথচ ১৯৭৬ সালে মিশ্র কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছিল যে যোশীমঠ ধসপ্রবণ এলাকা। এখানে ভারি নির্মাণ নিষিদ্ধ করতে হবে। সরকারি প্রকল্প বিকাশের নামে পরিবেশের বিনাশ হচ্ছে। বিকাশের নামে উন্নয়নের নামে প্রকৃতি নিধন চলছে বিগত দুই শতাব্দী ধরে। অথচ প্রকৃতি তার সবকিছু আমাদের সাজিয়ে দিয়েছিল। সেই সময়কার প্রকৃতির অপরূপের কাছে আজকের রূপ দেখলেই বোঝা যায় কেন যোশীমঠ মাটির তলে চলে যাবে। শিল্প কারখানার নামে অরণ্য সাফ। নদীনালা বুজিয়ে আধুনিক শহর নগর গড়ে তোলা হচ্ছে। বিশাল বিশাল অট্টালিকা, হোটেল মন্দির ধর্মশালা কর্পোরেটদের আকাশচুম্বী চাহিদার কাছে প্রকৃতির ওপর নির্মম অত্যাচার চালানো হয়েছে/হচ্ছে,ধ্বংস করা হচ্ছে। সে তো প্রতিশোধ নেবে। ভারতবর্ষের সহজ সরল পিছিয়ে পড়া মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসকে পুঁজি করে অতিরিক্ত মুনাফার লোভে নিক্ষর্বিচারে প্রকৃতি ধ্বংস করেছে। সে এবার বদলা নিচ্ছে। প্রকৃতি

তো এতোদিন অন্যায় সহ্য করে গেছে এবার তার পালা। বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ধর্মীয় বিশ্বাসবাদকে সামনে রেখে উন্নয়নের তাড়নায়(পড়ুন ভোটের জন্য) কর্পোরেটদের আরও মুনাফার লালসার শিকার আজ যোশীমঠ। অতীতের প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে কোনো শিক্ষাই নেয়নি। গত ২০১৪ লোকসভা ভোটের প্রচারে উত্তরখণ্ডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন ক্ষমতায় এলে ১০০ দিনের মধ্যে সব ঝাঁ চকচকে করে দেবেন অতীতে যা কোনো সরকার করতে পারেনি। কিন্তু যোশীমঠ ধসপ্রবণ ও কম্পনপ্রবণের কথা বিশেষজ্ঞরা সতর্কবার্তা দিলেও মানুষকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আড়ালে কর্পোরেটদের লালসা ও অবাধ মুনাফার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে সরকার। এখন বিশ্বাসবাদের নাম নিয়ে সারা দেশে জয় শ্রীরাম ধ্বনি তোলা হোক আর হনুমান চালিশা পড়া হোক যদি দৈবগুণে যোশীমঠ ধসের হাত থেকে রক্ষা পায়। আর কর্পোরেটদের আড়ালও করা যায়। কেননা আজ সারা ভারতবর্ষের মানুষ জেনে গেছে যে আজ "বিশ্বাসবাদ ও কর্পোরেটদের লালসার শিকার যোশীমঠ।"

কলকাতা-৫৫

২২-০৩-২০২৩।

ছবিঋণ- Created by @nehaart10

সূচিপত্র

ভাষা সাম্রাজ্যবাদ: বিজেপি ও বিবেকানন্দ

লি খে ছে ন – ত ন্ম য়



"নানা ভাষা,নানা মত,নানা পরিধান

বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান।"

মাননীয় অতুল প্রসাদ সেন মহাশয়ের কালজয়ী গানের এই দুটি লাইনের বারতা আজ প্রশ্নের মুখোমুখি।

নানারকমের ভাষার সমন্বয় ও গুরুত্বের ধারণাকে নস্যাৎ করে সমগ্র বিশ্বের দরবারে দেশ ও জাতির পরিচয় তুলে ধরতে এক ভাষা নীতি প্রনয়ণ করতে উঠেপড়ে লেগেছে আরএসএস, বিজেপি।

যেহেতু ১৯৫০ সালে দেবনগরী মুদ্রণে হিন্দিকে সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় তাই ২০১০ সালে গুজরাট হাইকোর্টে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলায় হিন্দিকে জাতীয় ভাষা হিসেবে মর্যাদা দেওয়ার আবেদন সংবিধান অনুসারে বাতিল করে আদালত। আদালতের রায় অনুযায়ী হিন্দিকে সরকারি ভাষা বলা গেলেও জাতীয় ভাষা কোন ভাবেই বলা যায় না।

তবে আবার নতুন উদ্যমে শুরু হয়েছে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করার চক্রান্ত।

“Hardline Hindu nationalist groups like the Vishwa Hindu Parishad and the Rashtriya Swayamsevak Sangha make no secret of their support for a homecoming campaign designed to return non Hindus to the fold. More than 80% Indians are Hindu,but Prabian Togadiya of the VHP says his organisation's goal is a country that is hundred percent Hindu.”

হিন্দুত্ববাদীরা মনে করেন ভারতকে একশো শতাংশ হিন্দুদের দেশ করতে হবে এবং তার সাথে একটি ভাষা গ্রহণ করতে হবে যা সারা ভারতে প্রতিটি মানুষের মধ্যে যোগসুত্র তৈরি করবে।

স্বামীজি বলিয়াছেন "এমন একটি মহান পবিত্র ভাষা গ্রহণ করিতে হইবে,অন্য সমুদয় ভাষা যাহার সন্ততি স্বরূপ। সংস্কৃতই সেই ভাষা। ইহাই ভাষা সমস্যার একমাত্র সমাধান।"



সংস্কৃত-এর পরিবর্তে হিন্দুত্ববাদীদের লক্ষ্য হিন্দি। কারণ হিন্দি হল গো বলয়ের জনগোষ্ঠীর মিশ্রিত মাতৃভাষা। সংস্কৃত ভারতে প্রচলিত হিন্দি সহ অনেক ভাষার মাতৃস্বরূপ। হিন্দির সাথে সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণের বহু মিল বিদ্যমান। তাই বিবেকানন্দের চাহিদার সংস্কৃতের সাথে আরএসএস এর চাপানো হিন্দির খুব একটা পার্থক্য নেই। লক্ষ্য তো একই। এক জাতির এক ভাষা। তাছাড়া

রাজনৈতিক জগত এবং সাংস্কৃতিক জগতে হিন্দির বিপুল প্রভাব।তাই ভাষা সমস্যার সমাধানে বিস্তর আলোচনার শেষে

সরকারি ভাষা কমিটির চেয়ারপার্সন অমিত শাহ দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন এখন সময় এসেছে গোটা দেশে একটি রাষ্ট্র ভাষা প্রচলন করা। সেই মহান পবিত্র ভাষা হল হিন্দি। তিনি মনে করেন সমগ্র দেশকে একসূত্রে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষমতা আছে হিন্দির মধ্যে। বহুদিন আগে থেকেই বিজেপি হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল। ভাষা কমিটির চেয়ার পার্সন অমিত শাহ সেই দাবি মেনেই এক দেশ, এক জাতি এবং এক ভাষার পক্ষে সওয়াল করেন।

বিবেকানন্দ আক্ষেপ করে বলেছিলেন - "তোমরা সংস্কৃত ভাষায় পন্ডিত হও না কেন? তোমরা ভারতের সকল বর্ণের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তারের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করো না কেন? আমি তোমাদিগকে ইহাই জিজ্ঞাসা করতেছি। যখন এইগুলি করিবে তখনই তোমরা ব্রাহ্মণের তুল্য হইবে। ভারতে শক্তি লাভের ইহাই রহস্য।"

হিন্দির জনপ্রিয়তা বাড়ানোর মধ্য দিয়ে এই ব্রাহ্মন্য শক্তি লাভের উদ্দেশ্যেই সম্প্রতি সরকারি ভাষা সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সরকারি বিজ্ঞাপনের বাজেটের অর্ধেকের বেশি হিন্দি বিজ্ঞাপনে খরচ করার

প্রস্তাব দিয়েছে। হিন্দি বিজ্ঞাপন বড় করে প্রথম পাতায় এবং ইংরেজি বিজ্ঞাপন ছোট করে ভেতরের বা শেষের পাতায় দেওয়ার কথাও বলা রয়েছে।

ভারতে সকল বর্ণের জন্য নবম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের হিন্দি ভাষা শেখা বাধ্যতামূলক করতে চান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। জাতীয় শিক্ষানীতির প্রস্তাবিত খসড়ায় সেটারই উল্লেখ রয়েছে। সরকারি কাজকর্ম যাতে পুরোপুরিভাবে হিন্দি ভাষায় করা যায় তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের তোড়জোড় শুরু করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে স্বামীজী উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন – "ভারতে সংস্কৃত ভাষা ও মর্যাদা সমার্থক। সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান লাভ হইলে কেউই তোমার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে সাহসী হইবে না। কারণ সংস্কৃত শিক্ষায়, সংস্কৃত শব্দগুলির উচ্চারণ মাত্রই জাতির মধ্যে একটা গৌরব, একটা শক্তির ভাব জাগিবে।"

সরকারি এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে মোদিকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে এখন সেই সময় এসেছে যখন আনুষ্ঠানিক ভাষাকে ভারতের ঐক্যের জন্য গুরুত্ব দিতে হবে। ভারতের নাগরিকরা নিজেদের মধ্যে শুধু হিন্দিতে কথা বলবে।

হিন্দি ভাষা হবে হিন্দু জাতির গৌরব, হিন্দি ভাষায় জ্ঞান লাভ হইলে মানুষ মধ্যে শক্তির ভাব জাগ্রত হবে। যে শক্তিকে মোকাবিলা করার সাহস পাবে না কেউই।

তাই আইন আসতে চলেছে হিন্দু রাষ্ট্রে হিন্দি ভাষা না শিখলে বঞ্চিত হতে হবে সরকারি প্রতিষ্ঠানের যেকোনো চাকরিতে। এমনকি যে সকল অফিসার এবং কর্মী হিন্দিতে কাজ করতে অস্বীকার করবেন বা এড়িয়ে যাবেন তাদের পারফরম্যান্স রিপোর্টে লেগে যাবে কালো দাগ।

মন্ত্রকের এই রিপোর্ট গত সেপ্টেম্বর মাসেই পৌঁছে গেছে রাষ্ট্রপতির কাছে। ভারতীয়দের রাষ্ট্র ভাষা হিন্দি হবে। আপনি বাধ্য হবেন হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের কাছে মাথা নত করতে। নচেৎ লোটা-কম্বল গুটিয়ে চলে যেতে হতে হবে নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে। এরকমই ইঙ্গিত দিলেন উত্তরপ্রদেশের ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টির জোট সঙ্গী ভারতীয় শোষিত হামারা আম দলের প্রধান মৎস্য মন্ত্রী সঞ্জয় নিশাদ। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, “ভারতের সংবিধান বলে ভারত হল হিন্দুস্তান যার অর্থ হিন্দি ভাষাভাষীদের জায়গা। যার হিন্দি বলতে পারে না তাদের জন্য হিন্দুস্তানে জায়গা নেই তাদের উচিত এই দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়া।”

এক দেশ, এক জাতি, এক ভাষার মধ্যে নিহিত ফ্যাসিস্ট সংস্কৃতি। আমরা এই সংস্কৃতির বিরুদ্ধে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে সংগ্রাম জারি রাখব।

সূচিপত্র

রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরচেতনা

লিখেছেন – অনিকেত সুর



"আরও প্রেমে, আরও প্রেমে

মোর আমি ডুবে যাক নেমে..."

আমি চোখ বন্ধ করে শুনি। যেন আমার চারপাশ থেকে বহুদূরে সরে যায় দৃশ্য-বর্ণ-গন্ধের এই পরাক্রান্ত বস্তুজগত; লুপ্ত চরাচরে এক একটি শীতল অলখ জলফোঁটা আমার পদতল ছুঁয়ে খুব ধীরলয়ে দেহ বেয়ে উপরে উঠে আসতে

থাকে। তারা একটা কোমল প্রস্রবণে রূপ নেয়। একটু একটু ক'রে নিমজ্জিত করে আমাকে তার ভেতর। আমাকে নিচে ফেলে উপর দিয়ে, চারপাশ থেকে নিঃশব্দ বয়ে যেতে থাকে; অলক্ষ্যে দেহত্বক ফুঁড়ে প্রবেশ করে আমার আত্মায়; সুরেলা এক কম্পনে সমাহিত আমি যেন বহুকাল পর আবার চোখ মেলি; আর স্পষ্ট টের পাই, স্বচ্ছজল এক ঝর্ণার অন্তর থেকে আমি সদ্য উঠে এসেছি; দাঁড়িয়ে আছি তাড়নাতাপরহিত, নবজন্মলব্ধ শৈশবস্বপ্নের প্রত্যাগত আলোয় ফেরা জ্যোৎস্নাফেনিল কোনও অচেনা নদীর পাড়ে...

কিংবা যখন শ্রবণ করি এই গানঃ

“নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো
যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো।”

নিঃসন্দেহে এইসব ‘প্রার্থনাগীতি’র বাণী, ভাবনা আর সুর পূর্ণতাপিয়াসী, শিল্পের আগুনধোয়া শুদ্ধ এক আত্মার গহন থেকেই উঠে আসা। তবু সরলমনে এই প্রশ্ন উচ্চকিত হয়, হতে পারে, রবীন্দ্রনাথ কি সত্যি ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন?

- যারা ঈশ্বর নামক কোনও এক অলৌকিক সত্তায় বিশ্বাসী কিংবা আধা সংশয় আর আধা বিশ্বাসের মিশ্র এক দুর্বলতার কুহেলির ভেতর এরকম কোন সত্তার সন্ধান করে থাকে, তাদেরই মনে এ জিজ্ঞাসা ঘুরেফিরে আসে।

- কেননা তাঁর এরকম বেশ কিছু গানে আছে, ‘প্রভু’ শব্দের আর্ত উল্লেখ। পাশাপাশি কিছু কবিতায় আছে ‘ভগবান’ (ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে...)।

প্রতীচ্যে রবীন্দ্রনাথের একটা ভুল, ভাঙাচোরা, খণ্ডিত ও খঞ্জ ইমেজ দাঁড়িয়েছিল ‘মিস্টিক’ মানে ‘অতীন্দ্রিয়’ বোধের কবি হিসাবে, মূলত তাঁর গুটিকয় গীতিকবিতার অনুবাদ ‘গীতাঞ্জলি’র মাধ্যমে। ইয়েটস সঙ্গতভাবেই তাঁকে ঈশ্বরবাদী বলে আখ্যা দেননি, যদিও ইউরোপীয়দের সম্ভাব্য অস্বস্তি কিংবা ভ্রান্তি নিরসনে (অর্থাৎ, তারা যেন কোনওভাবেই গীতিকবিতাগুলিকে কেবল প্রার্থনাগান বলে ভুল না করে) ‘গীতাঞ্জলি’র ভূমিকায় তাঁকে বার বার ‘গড’ বা ঈশ্বর কথাটার উল্লেখ করতে দেখা যায় ---

“জানি না আমরা খোদাকে ভালবেসেছি কিনা; এমনটা বলাও ঢের বেশী হবে যে আমরা তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেছি - তবু পিছন ফিরে জীবনের দিকে কখনও তাকাই যদি, উইলোর ছায়াঘন বনপথ আর নির্জন পাহাড়ী লোকে আমাদের কোনও এক স্বপ্নাবিষ্ট বিকালের ভ্রমণ - কিংবা পথচলতি কারও পাশাপাশি যেতে যেতে বিহ্বল প্রেমানুভবে কখনও হৃদয় কম্পিত হয়েছিল ব’লে আমাদের কোনও এক প্রায়-ভুলে-যাওয়া বিধুর দিনের অব্যক্ত দাবী, এবং ইত্যাকার আরও অনেক কিছুরই মধ্যে আমরা খুঁজে

পাবো সেই আবেগ যা তাঁর কবিতার এই অন্তঃশীলা মাধুর্যকে সৃষ্টি করেছে।"

রবীন্দ্রসৃষ্টির 'এই অন্তঃশীলা মাধুর্য' সম্পর্কে ইয়েটস পূর্ণ সচেতন কিন্তু আবার এর নেপথ্য প্রেরণা হিসাবে উল্লেখ করছেন 'সেই আবেগ'-এর কথা যা আসলে অনুমিত রবীন্দ্র ঈশ্বরবোধের দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করে।

কেবল কিছু গান আর কবিতা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের বিশাল সৃষ্টিভাণ্ডারের অন্য কোথাও কিন্তু এই 'ঈশ্বর' উপস্থিত নেই; একেবারেই নেই। না গল্পে, না নাটকে-প্রবন্ধে, না তাঁর স্মৃতিকথায়। এমনকি নেই তাঁর ব্যক্তিজীবনেও। সেসবে শুধু প্রবল-গভীর অনুভব-আন্দোলন আর যুক্তিবুদ্ধিশাসিত এক জীবনবাদীর দেখাই মেলে। দেখি, একের পর এক তিনি আঘাত করে চলেছেন সব জড় সংস্কার, ধর্ম, কথিত দেবতা আর দেবতার বিগ্রহকে। ছিলেন সর্বকুতূহলী। বিজ্ঞান ভালবাসতেন। নিয়মিত বিজ্ঞান পাঠ করতেন। ভূমিকম্পকে 'ভগবানের অভিশাপ' বলায় স্বয়ং গান্ধীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। বলেছেন, "ওটা স্রেফ প্রাকৃতিক ঘটনা, দুর্যোগ।"

কবিতায় বলছেন:

"যে পূজার বেদী রক্তে গিয়েছে ভেসে
ভাঙো, ভাঙো, আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে
ধর্ম কারার প্রাচীরে বজ্র হানো
অভাগা এদেশে জ্ঞানের আলোক আনো"

তবু সংশয় কাটে না। তবু মনে হয়, গানের কথায় এসে তিনি কেন বলেন ---

"দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের ওপারে
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাই নে তোমারে।"?

কেন বলেন –

"মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে
একেলা রয়েছ নীরব শয়ন পরে
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো
রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে দাঁড়ায়ে আমি
আর কতকাল এমনি কাটিবে, স্বামী!"

এই 'স্বামী'টা তবে কে? কবিতায় কেন তিনি বলেন, "নিজ হাতে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ..."? কে এই পিতা? সে কি ভগবান নয়? ঈশ্বর বা খোদা নয়?

এরকম প্রশ্ন ওঠে। মূঢ় প্রশ্ন যদিও, তবু এরকম প্রশ্ন তোলে কেউ কেউ। যারা আসলে শিল্প বোঝে না, রবীন্দ্রনাথ পড়েনি। তাঁর বিপুল সৃষ্টিকর্মের কণা ভগ্নাংশের সাথেও যাদের পরিচয় নেই। 'ঈশ্বর' নামক অবিকশিত এক খঞ্জ ধারণার এঁদো ডোবায় আটকে পড়া যারা এক প্রাগৈতিহাসিক তালকানা কিম্ভুত মাছ। ঘুরেফিরে তারা শুধু ঈশ্বরকে টেনে আনে। তার কোলে শুয়ে ঘুমাতে ভালোবাসে। তার অলীক আশ্রয় ছাড়া যাদের অসহায় লাগে। তাকে হারাবার চিন্তা করতে গেলে পাগল হয়ে যায়।

কবিসত্তায় লোকবিশ্বাসের সাথে যুক্ত ধারণা ও শব্দগুলি ভিন্নতর অর্থে ধৃত হয়। রবীন্দ্রগানেও তাই 'প্রভু' শব্দটি এসেছে ভিন্ন মাত্রা নিয়ে। আমাদের চিরদিনের স্বপ্নে ধৃত পূর্ণতার যে রূপকল্প, বাস্তব জীবনে তার স্থায়ী প্রতিষ্ঠার আর্তি হিসাবে; যে ঈশ্বর বৈচিত্র্যের ভেতর একটা ঐক্যের ছবি আঁকে আর কবির অন্তরলোকে মূর্ত ক'রে তোলে এই গাঢ় অনুভবের ধ্যানচিত্রকল্প: "জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে, তুমি বিচিত্ররূপিনী/অন্তর মাঝে তুমি শুধু একাকিনী।" কথিত ধর্মের প্রভু সে কোনওভাবেই নয়। শিল্পের মঙ্গলময় ঈশ্বর, আর ধর্মস্থিত ঈশ্বর যে কিনা পুরস্কারের লোভ দেখায় আর শাস্তির হুমকি দেয়, এ দুয়ের ব্যবধান বেশ দুস্তর; শাস্ত্রগত ঈশ্বর বড় বিভেদপ্রিয়;

প্রাকারবেষ্টিত নানান সংকীর্ণ সীমার ভেতরে তার অবস্থান; পারস্পরিক ঘৃণা-হিংসা আর অবিশ্বাসের প্ররোচনাদাতা। আর যে শিল্পের অন্বিষ্ট অখণ্ড মানুষ, তার ঈশ্বর তো এই ভেদবুদ্ধির সীমাটাকেই ভাঙতে উন্মুখ। জাগতিক জীবনের নানা ক্লেদ ও গ্লানি, বিচ্যুতি ও পরাজয়, সীমার সংকোচ, তাকে অতিক্রমণের অক্ষমতা অভীষ্ট পূর্ণতার দিকে আমাদের আগুয়ানির পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। এই সীমাটাকে খসিয়ে দেয়াই কবির আরাধ্য। অন্বিষ্ট পূর্ণতার প্রতীক হিসাবে তাই কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে ‘প্রভু’ শব্দটি।

গানের ‘তুমি’ও সেই একই স্বপ্নের দ্যোতক। আমাদের অপূর্ণ সত্তায় যে-সুন্দরের সাথে মিলনের স্বপ্ন জাগে, এটা তো তাই। এই সুন্দর যেন চিরদিনের মায়াহরিণী (‘মায়াবনবিহারিনী হরিণী’), সে যেন লুকিয়ে আছে এই চেনা জগতেরই কোথাও, হয়তো বা শুক্লাযামিনীর অলৌকিক জোছনার বুকের ভেতর, বা কোনও বাঁশির সুরলহরীর প্রাণে ধৃত অনুভবে, কাজল বনের গভীর রহস্যে, হয়তো বা নাম-না-জানা কোনও ফুলের অচিন চমক সৌরভে। আমাদের জীর্ণ ঘরে, আমাদের চারপাশে, সমাজজীবনের কোথাও যে-সুন্দরকে আমরা প্রতিষ্ঠিত হতে দেখতে পাই না। আমরা জানি না সুন্দরের

“সেই সঙ্গীত কী ছন্দে গাঁথিব; কী করিয়া

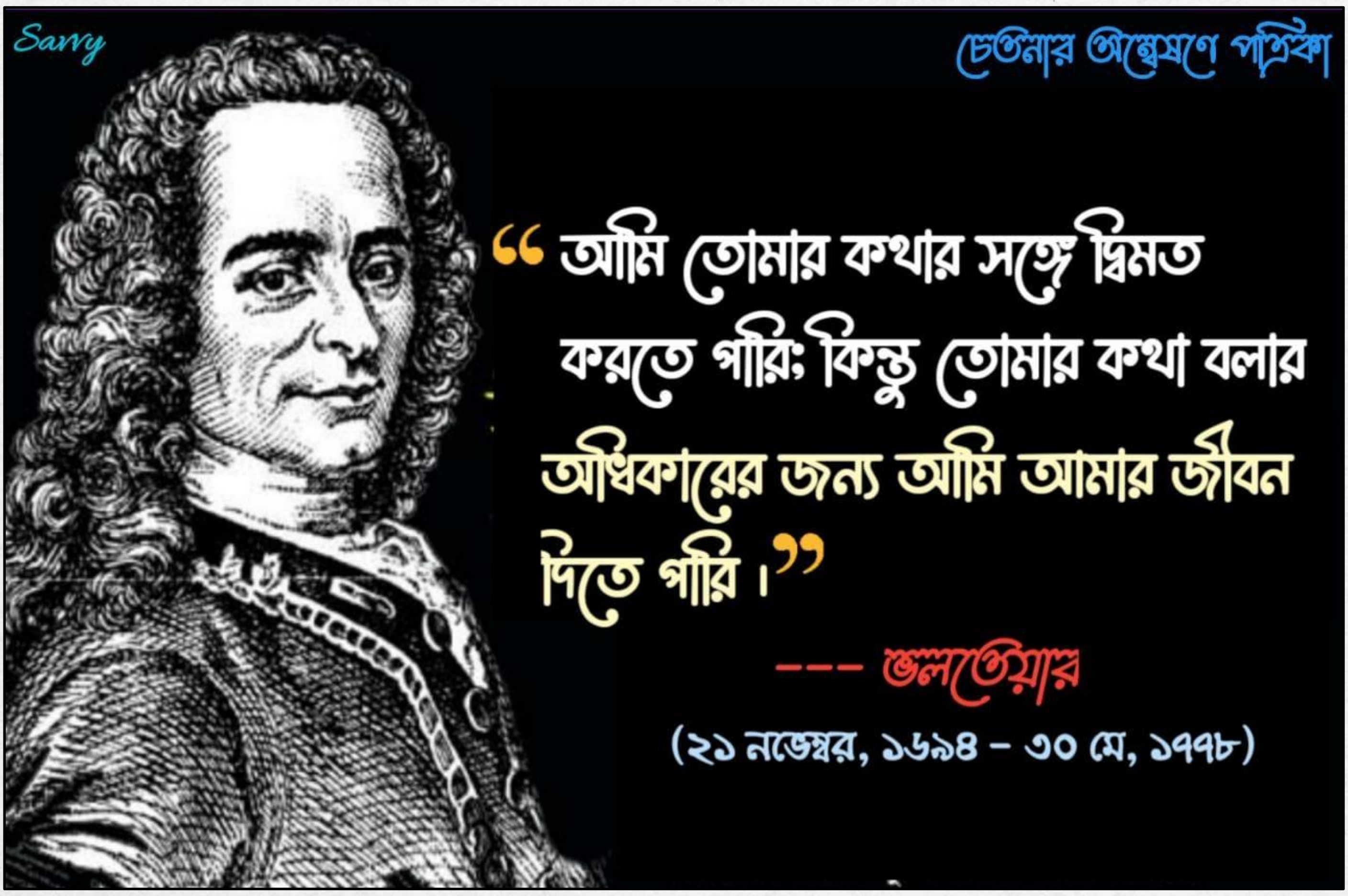
শুনাইব, কী সহজ ভাষায় ধরিয়া

দিব তারে উপহার ভালবাসি যারে
রেখে দিব ফুটাইয়া কী হাসি আকারে
নয়নে-অধরে, কী প্রেমে করিব তারে
জীবনে বিকাশ। সহজ আনন্দখানি
কেমনে সহজে তারে তুলে ঘরে আনি
প্রফুল্ল সরস। কঠিন আগ্রহ ভরে
ধরি তারে প্রাণপণে মুঠির ভিতরে ---
টুটি যায়! হেরি তারে তীব্রগতি ধাই!
অন্ধবেগে বহুদূর লঙ্ঘি' চলি যাই --- (তবু)
আর তার না পাই উদ্দেশ...!" (সুখ/চিত্রা)

কবির এই সুন্দর, এই ঈশ্বর আমাদের খুব চেনা, খুব বেশি লৌকিক। কারণ, সে তো আমাদের, সৌন্দর্যপ্রত্যাশী সব মানুষের মনেই আছে। সে মঙ্গলময়। এই ঈশ্বর রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কাব্যিক ঈশ্বর। কর্মে, প্রেমে, শুদ্ধ আনন্দকল্যাণসাধনায় যে আমাদের পূর্ণ হবার প্রেরণা দেয়। কল্পিত আসমান থেকে সে কোনও কিতাব নাজিল করে না। মানুষে মানুষে কোনও যুদ্ধ, রক্তারক্তির উস্কানিও দেয় না। সহস্র বছর ঘুমিয়ে থেকে হঠাৎ জেগে উঠে -- যে-মানুষ বস্ত্র আবিষ্কার করেছে, এতদিন যাকে ন্যাংটা রেখেছিল, --- তাকে বলে না, দ্যাখো, তোমাদের এইভাবে পোশাক পরতে হবে, নইলে..." ইত্যাদি।

হ্যাঁ, এই ঈশ্বর কোমল, ভালবাসার কথা বলে। এই ঈশ্বরই রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর, প্রেমের দূত। এই ঈশ্বর স্বয়ং মানুষ, তারই পূর্ণতর স্বপ্নকল্পপ্রতিমা। তারই ভেতরের এখনো না-হয়ে-ওঠা পূর্ণ প্রেমের স্বরূপ, ব্যথা পেলে যে আমাদের বুকে হাত রাখে। আমাদের প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করে। আমাদের ঘরের ভেতর চির অভিষেকের আয়োজনে যে দূরে অপেক্ষমান। এই ঈশ্বরে তো আমার কোনও সমস্যা হবার কথা নয়। আমি নিরীশ্বরবাদী হয়েও তাই কবির এই ঈশ্বরে নির্দ্বিধ আনন্দবিশ্বাস রাখি।

যাত্রাবাড়ি, ঢাকা ১২৩৬



সূচিপত্র

বাঙালীপাড়া

লি খে ছে ন – প্র তী ক মা ই তি



আমাদের পাড়ায় থেকে থেকে জ্বলে ওঠে বাহারি আলো। সমস্ত উৎসবেই আলো জ্বালাতে হবে দিব্যি দেয়নি কেউ। কিন্তু সমস্ত উৎসবই পালন হচ্ছে সুদিন আসছে ভেবে। আলো আর সুদিন নিয়ে বলতে বসলে মনে হবে

খুন খারাপি, প্রেম প্রত্যাখ্যান এইসব আমাদের পাড়ায় হয়নি কখনও। বস্তুত আমাদের পাড়াটা টিপটপ, গোছালো।

সকালের চায়ের কাপ থেকে কিছুটা ধোঁয়া নিয়ে বানিয়ে ফেলছি একটা মৃত্যুঞ্জয়ী কুহক। কথায় কথায় ভলিয়েস্কি, চার্বাক, জিডিপি, সপ্তাহান্তে সভা - সমাবেশ। আলোর চকমকি হাতে এমনভাবে হাত ঘোরাছি মনে হবে ভারতবর্ষ শ্রীলংকা হয়ে যাবে আমাদের পাড়াটা না থাকলে!

আমাদের পাড়ায় থেকে থেকেই শোনা যায় গর্জন।

সমস্ত প্রতিবাদেই ভয়ংকর ব্রহ্মনাদ হবে এমনটা নয়। রিকশাওয়ালাকে পাঁচটাকা বেশি দিতে হলে, মাছওয়ালাকে আঁশ ছাড়ানোর পয়সা ধরে দিতে গেলে, পাশের বাড়ীর ড্রেনের জল সদর দরজায় জমা হলে যে আর্তনাদ হয় তাতে মনে হয় আমাদের পাড়াটা আপোষহীন।

শুধু মোড়ের মাথা থেকে চাকরীর দাবিতে অনশন করা ছেলেমেয়েগুলোকে যখন টেনে হিঁচড়ে গাড়িতে তুললো পুলিশ, আমরা তখন নাক ডেকে ঘুমাচ্ছি।

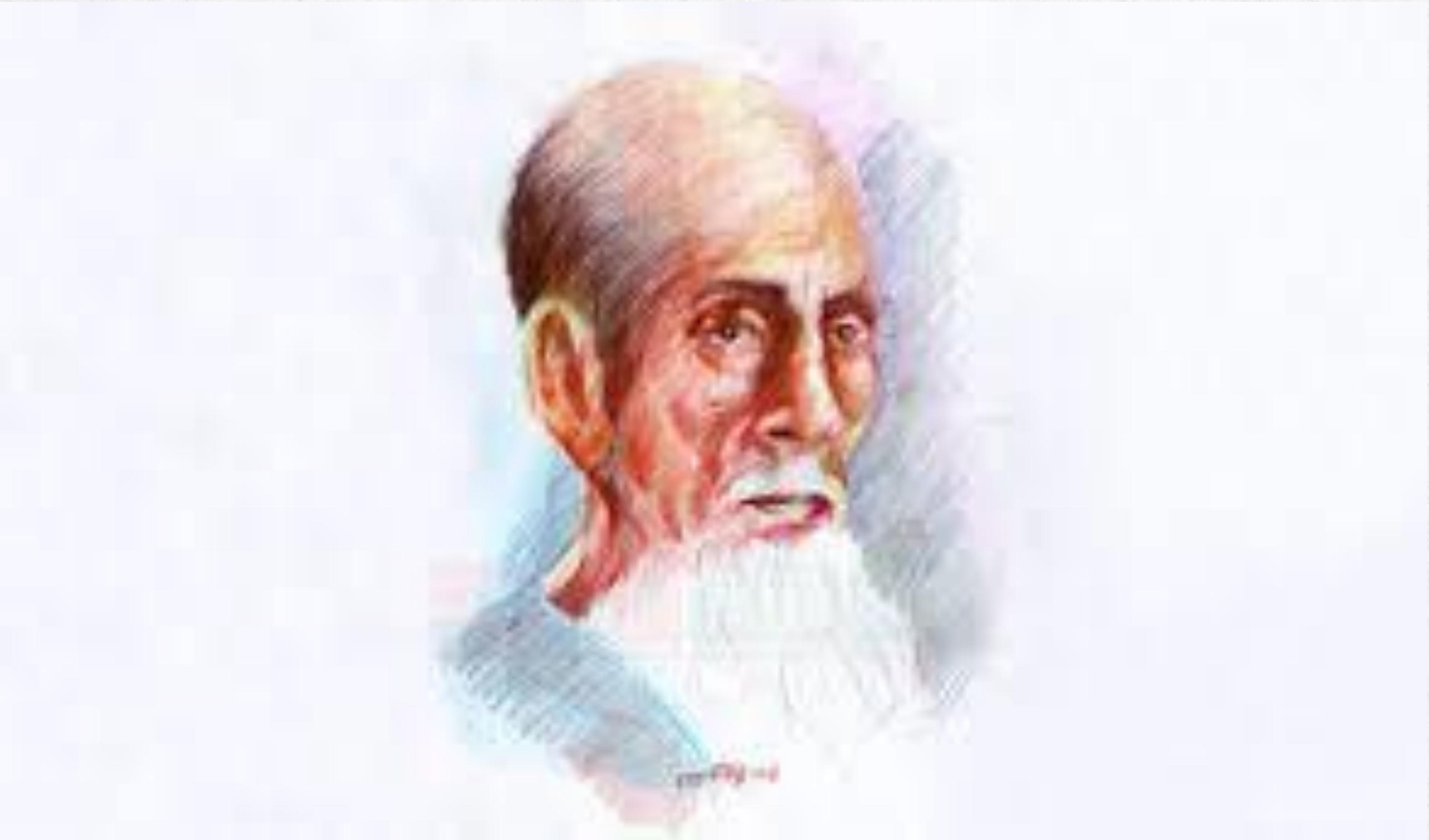
আমাদের পাড়াজুড়ে নাসিকার গর্জন।

রাজারহাট, কলকাতা।

সূচিপত্র

আরজ আলী মাতুব্বর: সত্যের অভিযাত্রী

লি খে ছে ন – জা হি দ রু দ্র



“বিদ্যাশিক্ষার ডিগ্রী আছে জ্ঞানের কোনো ডিগ্রী নেই; জ্ঞান ডিগ্রীবিহীন ও সীমাহীন”

'প্রায় ৫০-৬০ হাজার বছর আগের নিয়ান্ডারথাল মানুষেরাই প্রথম প্রশ্ন তোলে জীবন-মৃত্যু নিয়ে? মানুষ কোত্থেকে আসে? বেঁচে থাকে কেন? মারা যায় কেন? শুধু মানুষ নয়। প্রকৃতিকে নিয়েও তারা প্রশ্ন করা শুরু করেছিল। নদী প্রবহমান কেন? বাতাস কি? পাহাড় এলো

কোত্থেকে? সূর্য আলোকিত কেন? সহস্র বছর আগের অবিকশিত ও আদিম বুদ্ধি দিয়ে আদিম মানুষেরা ভেবে নিয়েছিল তাদের প্রতিটি সমস্যার সমাধান। প্রাণীজগতের সব প্রাণীই নিজেদের যেকোন সমস্যায় নিজ নিজ বুদ্ধি, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই আধুনিক যুগেও প্রাণীদের চোখে মটরগাড়ীগুলো শব্দকারক ও দূর্গন্ধযুক্ত একটি বিদঘুটে প্রাণী ছাড়া কিছুই নয়। একটি যন্ত্র সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণের জন্য আমরা প্রাণীদেরকে দোষ দিতে পারি না। কারণ যন্ত্রকে যন্ত্র মনে করার জন্য যে জ্ঞান, মেধা, মণীষা, অভিজ্ঞতা থাকা দরকার তা তাদের নেই। জীব জগতের কোটি বছরের ইতিহাসে মনুষ্যেতর প্রাণীগুলো কখনো যন্ত্র নিয়ে গবেষণা করেনি, বা করতে চায়নি। বানর, কয়েক প্রজাতির পাখি এবং অন্যান্য কয়েকটি মাত্র প্রাণী অবশ্য যন্ত্রের ব্যবহার করে। উঁচু ডাল থেকে ফল পাড়তে লাঠি, শত্রু তাড়াতে ঢিল, খাদ্য ভাঙতে পাথর ইত্যাদির ব্যবহার তারা করে থাকে। কিন্তু তাদের যন্ত্র সম্পর্কে এই অভিজ্ঞতা অতটুকু প্রাথমিক অবস্থাতেই থেকে গেছে। আর কোন অগ্রগতি হয়নি এবং তা সহজাত প্রবণতায় পরিণত হয়েছে। কারণ যন্ত্রের ঐ সীমিত ব্যবহারটুকুর বেশি তাদের প্রয়োজন হয়নি। তাই যন্ত্রের আবিষ্কার বা উৎকর্ষের জন্যও কোন রকম অভ্যন্তরস্থ আগ্রহ তারা বোধ করেনি। কিন্তু মানুষ মানবেতর নয়। ক্রমাগত নিজেকে পেরিয়ে যাওয়ার এক অদম্য আগ্রহ মানুষকে সবসময় তাড়িয়ে বেড়ায়। ফলে মানুষ নিরন্তর

তার পূর্বতন অনভিজ্ঞতা, অনগ্রসরতা, পশ্চাৎপদতা, সীমিত যান্ত্রিক শক্তি প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করেছে এবং সাগ্রহে বরণ করেছে ভবিষ্যতের নতুনত্ব, জ্ঞান, আবিষ্কার, মনন। তাই অন্যান্য পশুদের জীবন যাত্রা এখনও আদিম যুগের ন্যায় থাকলেও মানুষের ক্ষেত্রে তা পাল্টে গেছে। মানুষ এগিয়ে এসেছে বর্তমানের কুসংস্কারহীন প্রযুক্তিময় পৃথিবীতে।'

দার্শনিকরা কখনও ফুরিয়ে যায় না; বরং সময় ও সমাজ তাঁদেরকে ধারণ করে। সময়ের সমান্তরালে তাঁরাও বহমান। একটা সমাজকে প্রগতিশীল হতে হলে দার্শনিক দরকার। দর্শন আসে জীবনবোধ থেকে, দর্শন আসে প্রশ্ন ও চিন্তার স্বাধীনতা থেকে। অথচ আমাদের সন্তানরা প্রশ্ন করতে জানে না, চিন্তা করতে জানে না। বাঙালির জীবন খুব সংকীর্ণ। কোনোভাবে পঞ্চাশটা বছর কাটাতে পারলে মৃত্যুর প্রহর গুনে তাঁর দিন কাটে। জীবনের বিকাশ ও জীবনবোধ তাঁর কাছে অনর্থক। লালনের মতো দার্শনিককে আমরা এখনও পাগল বানিয়ে রেখেছি। একটা সমাজকে কেবল লালনের গান দিয়ে সুচিন্তক বানানো সম্ভব। লালন বাংলার মাটিতে বেড়ে ওঠা মানুষ, এখানকার পরিবেশ ও জীবনের সাথে তাঁর সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। আরবদের জীবনীর বদলে বাংলা বইয়ে লালনের জীবন পাঠ অনেক বেশি জরুরী ও প্রাসঙ্গিক। লালনের জীবন কোনো

পয়গম্বরের থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু সেই লালন আমাদের কাছে উপেক্ষিত। আমরা লালন দর্শনে চর্চা করি না।

আরজ আলী নামের একজন মানুষ এই পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছেন তা প্রথম জানতে পারি ডিগ্রি ফার্স্ট ইয়ারে। সত্যের সন্ধানে বইটা পড়ি পিডিএফ আকারে ঠিক তারিখ মনে নেই তবে সালটা ২০১৫-১৬ হবে। যেহেতু নামটা আগে শুনেছি তবে তাঁর বই পড়ার সুযোগ হয় নি। যদিও কলেজে পড়ার সময় হেগেল, কনফুসিয়াস, দেকার্ত, মার্কস, এঙ্গেলস, মাও, বার্ট্রান্ড রাসেল পড়েছি। সময় সুযোগে তাঁদের জীবন ও দর্শন সম্পর্কে জেনেছি এবং অভিভূত হয়েছি কিন্তু আরজ আলী মাতুব্বর পড়া হয়নি। সক্রেটিস বা প্লেটো বাঙালির খুব পরিচিত নাম। সক্রেটিস পড়ছিলাম ক্লাস টেনে ইংরেজি সাবজেক্টে একটা পাঠ ছিল, তখন।

বার্ট্রান্ড রাসেল খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন, জাঁ-পল সার্ত্র ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু তাঁরা নিজ দেশে অনেক সম্মান পেয়েছেন। দার্শনিক নিটশে বলেছেন, ‘ঈশ্বর মৃত’। কিন্তু নিটশে পড়ানো হয় পৃথিবীর সব দেশে। আরজ আলী মাতুব্বরকে একজন বিজ্ঞানী ও লৌকিক দার্শনিক অভিধায় ভূষিত করা হয়, তাঁর লেখা হেগেলের দ্বান্দ্বিকতাবাদের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। একদিকে বলা যায়

তিনি যুক্তিবাদী দর্শনের একনিষ্ঠ অনুসারী, আবার অন্যদিকে বলা যায় তিনি আধুনিক চার্বাকবাদী।

আরজ আলী মাতুব্বর প্রশ্ন করতে ভালোবাসতেন। শুধু প্রশ্ন করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, সেগুলোর উত্তর সন্ধানের চেষ্টা করেছেন। মানুষের জীবন ও প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর মনে কৌতুহল বা কোনোরকম প্রশ্নের উদয় হলে তিনি ‘বস্তুবাদ’ বিষয়টা নিয়ে নড়াচড়া করতেন। বই থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান এবং নিজের অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে তিনি নিজস্ব চিন্তার জগৎ তৈরি করতেন। একটি প্রবাদ আছে "স্বশিক্ষিত লোক মাত্রেই সুশিক্ষিত।" সে হিসেবে 'স্বশিক্ষিত' আরজ আলী মাতুব্বর অবশ্যই একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি। তিনি শুধু একজন ব্যক্তি নন, নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। আরজ আলী মাতুব্বর বিশ শতকের একজন অনন্য ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। বিজ্ঞানে আস্থাবান যুক্তিবাদী আরজ আলী বাঙালির মানসমুক্তির সহায়।

আমাদের সমাজ আরজ আলীকে ধারণ করে না। আরজ আলীকে নিয়ে চর্চা হয় না। দেশে হাতেগোনা কিছু মানুষই হয়ত আরজ আলী নামের সাথে পরিচিত। অথচ আরজ আলী সবার পাঠ্য হওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথ বা নজরুলের মতো মুখস্ত থাকা উচিত আরজ আলীর জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকী। প্রসঙ্গক্রমে কেউ যদি আরজ আলীর জন্ম বা মৃত্যু

নিয়ে দু একটা লাইন লিখে ফেসবুকে পোস্ট করে তবে তাকে নানা উপাধিতে ভূষিত করা হয়। নাস্তিক-আস্তিকের প্রশ্নে ভেসে যায় কমেন্টবক্স। এখানে চিন্তার স্বাধীনতা নেই, প্রশ্নের স্বাধীনতা নেই। ধর্ম নামক জাতাকলে পিষ্ঠ সবাই। সেসবের বিপরীতে আরজ আলী চিন্তা করার সাহস যেগায়, প্রতিনিয়ত অনুপ্রেরণা দেয়।

আরজ আলী মূলত বস্তুবাদী দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি অনেক অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে লেখালেখি করেন। আরজ আলীর রচনায় মুক্তচিন্তা ও যুক্তিবাদী দার্শনিক প্রজ্ঞার ছাপ রয়েছে। মানবকল্যাণ ও বিশ্বধর্ম আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য বৃত্তি প্রদান, পাঠাগার স্থাপন ও রচনা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। এছাড়া তিনি নিজ দেহ ও চক্ষু মানবতার সেবায় উৎসর্গ করেন। মাতুব্বর বরিশালের অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদির, অধ্যাপক মুহাম্মদ সামসুল হকসহ অসংখ্য সাম্যবাদী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজমান ছিলো।

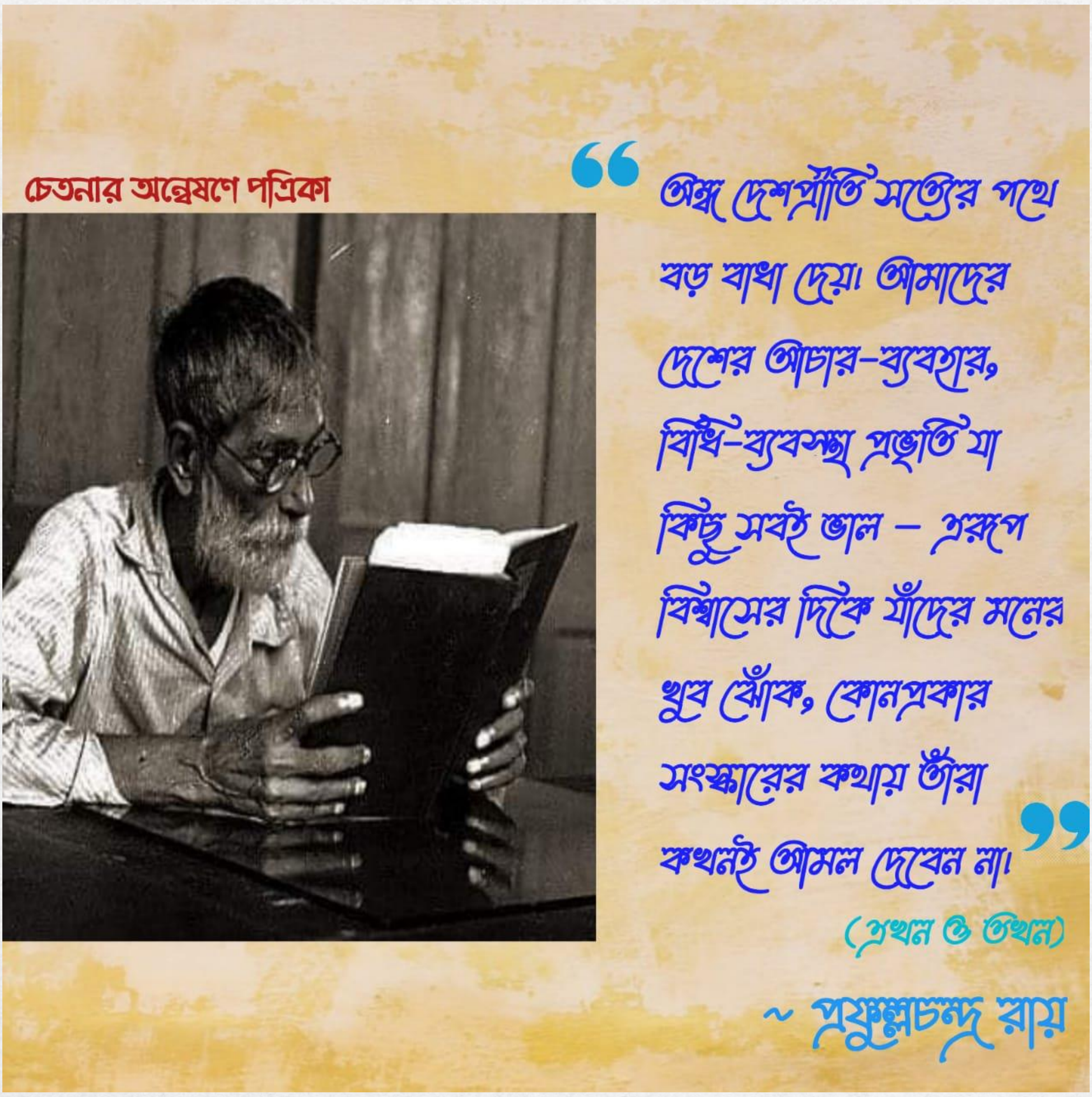
তাঁর বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতার কথা তিনি একাধিক গ্রন্থে প্রকাশ করেন। তার লিখিত বইয়ের মধ্যে ‘সত্যের সন্ধান’, ‘সৃষ্টি রহস্য’, ‘সীজের ফুল’, ‘শয়তানের জবানবন্দী’ অন্যতম। আরজ আলীর রচিত পাণ্ডুলিপির সংখ্যা মোট

১৫টি। এর মধ্যে তার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়েছিল ৪টি। এই বইগুলো হলো- 'সত্যের সন্ধান' (১৯৭৩), 'সৃষ্টি রহস্য' (১৯৭৭), 'অনুমান' (১৯৮৩), ও 'স্মরণিকা' (১৯৮৮)। আরজ আলী মাতুব্বর তার প্রথম বইয়ের প্রচ্ছদও আঁকেন। বইটি লিখেছিলেন ১৯৫২ সালে। প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালে 'সত্যের সন্ধানে' শিরোনামে। বইটি তাকে এলাকায় 'শিক্ষিত ব্যক্তি' হিসেবে সুনাম এনে দিয়েছিল।

তাঁর সত্যের সন্ধান গ্রন্থে আরজ আলী মাতুব্বর যে মৌলিক প্রশ্নগুলি উল্লেখ করে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন তার মধ্যে রয়েছে: '১. আমি কে? ২. প্রাণ কি অরূপ না স্বরূপ? ৩. মন ও প্রাণ কি এক? ৪. প্রাণের সহিত দেহের সম্পর্ক কি? ৫. প্রাণ চেনা যায় কি? ৬. আমি কি স্বাধীন? ৭. অশরীরী আত্মার কি জ্ঞান থাকিবে? ৮. প্রাণ কিভাবে দেহে আসা যাওয়া করে?'..... ঈশ্বর সম্পর্কিত প্রশ্নে আরজ আলী মাতুব্বর জিজ্ঞেস করেছেন 'স্রষ্টা কি সৃষ্টি হইতে ভিন্ন?' ঈশ্বর কি স্বেচ্ছাচারী না নিয়মতান্ত্রিক?'

কেবল দার্শনিক চিন্তায় নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ বোধের আর এক প্রকাশ ঘটেছে তার এরূপ কর্মে যে, তিনি জীবিত অবস্থাতেই জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মানুষের হিতার্থে তাঁর দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে উইলের মাধ্যমে বরিশাল মেডিক্যাল কলেজকে দান করে গেছেন। প্রতি

বছরই ১৫ই মার্চ আরজ আলী মাতুব্বরের জন্মদিন পালন করা হয়। এত বছর পরে আরজ আলীকে নিয়ে কেউ উৎসাহ দেখাবে তা হয়ত তিনিও ভাবতেন না। ঠিক এভাবেই আরজ আলী সময়ের সমান্তরালে বহমান। শত বা সহস্র বছর পরেও আরজ আলী আরো বেশি প্রাসঙ্গিক হবেন।



সূচিপত্র

খালিস্থানী অর্থোডক্স শিখ মৌলবাদী

লি খে ছে ন – সৌ রা ষ্ট্র দা শ



স্বাধীনতার আগেও বহু সমস্যা ছিল। স্বাধীনতার পরেও বহু সমস্যা আছে এটা আমরা সবাই জানি! এ আবার নতুন কি? কিন্ত বর্তমানে যে ধরণের সমস্যা আমরা আজকে দেখছি তা এক দিনের সমস্যা নয়, বহু দিনের

সমস্যা। সেই সব সমস্যার মধ্যে একটি অন্যতম ছিল শিখ'দের জন্য একটি আলাদা রাষ্ট্র, আলাদা সংবিধান গঠন। সালটা ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে মুসলিম লীগ যখন মুসলিমদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্রের দাবী জানায়, তখন কিছু শিখ নেতা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন যে হিন্দু ও মুসলিমের ভিত্তিতে ভারত বিভাজিত করলে শিখ সম্প্রদায়ের কোন স্বাধীন মাতৃভূমি থাকবে না। তারা তখন বৃহত্তর পাঞ্জাব অঞ্চলে বিস্তৃত খালিস্তান নামক একটি ধর্মরাষ্ট্র সৃষ্টির ধারণা পেশ করেন। এই কথা আমরা অনেকেই জানি, কিন্ত এই শিখ রাষ্ট্র বা খালিস্থান কি স্বাধীনতার আগে বা পরের আলোচনা? উত্তর হলো, না। পাঞ্জাব অঞ্চল শিখদের ঐতিহ্যগত মাতৃভূমি। এই কথা সবাই জানি এবং ইংরেজ দ্বারা অধিকৃত হবার আগে পাঞ্জাব শিখদের দ্বারা ৮২ বছর শাসিত হয়, যা ১৭৬৭ থেকে ১৭৯৯ সাল পর্যন্ত সমগ্র পাঞ্জাব শিখ মিসল (সার্বভৌম শিখ রাষ্ট্র) সমূহের অধীন ছিল, তারপর মহারাজা রণজিৎ সিং শিখ মৈত্রী সঙ্ঘকে শিখ সাম্রাজ্যের মাঝে একীভূত করেন। তবে সেখানে শিখদের পাশাপাশি অনেক হিন্দু ও মুসলিমও বসবাস করত, তারপরেও ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাস আমরা জানি...

শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদীরা দাবী করেন যে শিখরা বরাবরই একটি পৃথক ও সার্বভৌম জাতি ছিল এবং দক্ষিণ এশিয়ার

শিখ অধ্যুষিত এলাকাগুলো দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধে ব্রিটিশদের কাছে পরাজিত হবার পূর্ব পর্যন্ত বহু শতাব্দী ধরে স্বাধীন ছিল। যা ১৮৪৮-১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত এ যুদ্ধের ফলে শিখ সাম্রাজ্য ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনস্থ হয়, পাঞ্জাব অঞ্চল কোম্পানি শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তা পরবর্তীতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পরিণত হয়। অনেক শিখ বিশ্বাস করেন যে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজনের সময়, হিন্দু-মুসলিমদের পাশাপাশি শিখদেরকেও একটি পূর্ণ সার্বভৌম অথবা পাকিস্তানের অধীনে একটি অর্ধ সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল, পরবর্তীতে রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার কারণে যা থেকে শিখরা বঞ্চিত হয় এবং পাঞ্জাব রাজ্য ভারত-পাকিস্তানের মাঝে বিভাজিত হয়। কিন্ত 1948 সেই সময় অনেকেই আলাদা ব্যবস্থা চেয়েছিল। তাদের মধ্যে জিন্নাহ, ড: ভিড় সিং, আম্বেদকর তারা এক ভারত চায়নি। যেমন আম্বেদকর মনে করতেন ব্রিটিশদের জন্য দেশের নিম্ন শ্রেণীর মানুষের উন্নতি হবে। সবার আলাদা পৃথক চিন্তাকে সেই সময় কংগ্রেস সরকার মানেনি তারা বলেছে ভারত আর ধর্মের ভিত্তিতে আর ভাগ হবে না।

এর পরের যে সব ইতিহাস ঘটেছে, পাঞ্জাবী সুবাহ - ভাষা সমস্যা, নদী জলের বিতর্ক, হরমন্দির সাহেবে ১৯৫৫ সালের হামলা, অকালি দলের দাবী, খালিস্তান জাতীয় পরিষদ, ব্লু-স্টার অভিযান, ইন্দিরা গান্ধীকে গুপ্তহত্যা ও

শিখদের গণহত্যা, জঙ্গিবাদের উত্থান, খালিস্তানী জঙ্গি গোষ্ঠী, এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট ১৮২ ইত্যাদি। তার পরেও ইতিহাস ১৯৯৫ সালের গুপ্তহত্যা; যাতে পাঞ্জাবের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বেয়ান্ত সিংহের হত্যা করা হয়েছিল। মানে এই উপরের যতগুলো বিষয় আছে তা নিয়ে লিখলে একটি হাজার পাতার বই লেখার সমান হবে। এতোটা বিরক্ত এই খালিস্থান শিখ মৌলবাদ সমস্যা। এর মধ্যে রাজনৈতিক অরাজনৈতিক ধর্মীয় আলোচনা আছেই তার সাথে সেই সময়কার পত্রিকাগুলিও ভূমিকা আছে অনেক, এইসব আলোচনা অন্য সময় করলেই ভালো আলোচনা বিষয় অনেক বড়ো ছোট ছোট আলোচনাই ভালো তবে বর্তমানে যে ঘটনা এই কিছুদিন ঘটলো সেই বিষয় একটু আমরা নজর রাখার চেষ্টা করবো...

সাল 1984 দিল্লি যখন সাম্প্রদায়িকতার স্রোতে ভেসে চলেছে। এক দিকে শিখ গণহত্যা চলছে। কংগ্রেস কর্মীদের দ্বারা এই অভিযোগ তো আছেই কতটা সত্য জানা নেই। ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করা হয়েছে। Bhindranwale মতো ব্যক্তিদের ব্লু স্টার অভিযান এর মাধ্যমে শেষ করা হয়েছে। সেই সময়ের শিখদের ধর্মীয় হরমন্দির সাহিব ব্লু স্টার অভিযান এর জন্য অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর ফলে শিখ'রা খিপ্ত হয়ে পরে। তারপর ভারতের ইতিহাসে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর দুই শিখ দেহরক্ষী সৎবন্ত সিংহ ও বিয়ন্ত সিংহ অপারেশন ব্লু

স্টার চলাকালীন "স্বর্ণমন্দির" নামে পরিচিত শিখদের সর্বোচ্চ তীর্থ হরমন্দির সাহিবে সেনা অভিযানের প্রতিশোধকল্পে তাকে হত্যা করে। তারপর অনেক বছর কেটে যায়। শিখ মৌলবাদ কিছুটা কমে গেলেও শেষ হয় না। বহু বছর পর বছর 30শের অর্থোডক্স শিখ Amritpal সে Bhindranwale এর যায়গা নেওয়ার চেষ্টায় আছে। মজার বিষয় সে এমনটা আগে ছিল না। তার কর্ম কান্ড আমরা কৃষক আন্দোলনে দেখতে পাই সে মাত্র 10 ক্লাস পড়াশোনা করে। ইস্কুল ছেড়ে দেয়। তারপর সেই বিদেশে চলে যায়। টাকা রোজগারের জন্য পারিবারিক অবস্থান ও খুব একটা ভালো ছিল না! Amritpal এর তবে বিদেশে থাকার পর কিছু টা ঠিক হয়। সে দেশে ফিরে এসে অমৃত চাক নামক অনুষ্ঠান এর মাধ্যমে নিহঙ্ক হন এবং অনেক শিখ দের সাথে যোগাযোগ করতে থাকে...

এর মাঝে তার নাম ডাক হতে থাকে যুব সমাজে সে বলতে থাকে প্রতিটা শিখ যুবক এর হিরো Jarnail Singh Bhindranwale এবং Amritpal জনসাধারণ কে বলতে থাকে যে তার উদ্দেশ্য Bhindranwale এর মতাদর্শ প্রচার করা। সে অনেক শিখদের হুমকি দিতে থাকে যে সব শিখরা দাড়ি রাখে না, মদ পান করে তাদের ছেড়ে কথা বলা হবে না। ঠিক এমন কথা তথা কর্মকান্ড Jarnail Singh করতো এবং নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে যে

Jarnail Singh কিভাবে হিন্দুদের হত্যা কথা বলতো যে শিখ আর হিন্দুদের মাঝে ব্যালেন্স রাখতে হবে, তাদের হত্যা করে। এতে শিখ হিন্দুদের মধ্যে অবশ্যই সংঘর্ষ হবে। এবং অনেক খালিস্থানী মৌলবাদীরা Rss, কংগ্রেস, কমিউনিস্ট নেতাদেরও তারা হত্যা করেছে। যারা খালিস্থান এর বিরুদ্ধে কাজ করছিল। এবং সব থেকে বড় ঘটনা হলো পাঞ্জাবের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বেয়ান্ত সিংহের হত্যা। এর পর অনেক খালিস্থানী লিডারদের কর্ম কান্ড বিদেশে নিজের শক্তিশালী করা সব রকম ভাবে 1980 আগে যেমন খালিস্থান লিডার রা যেমন লাহোর থেকে কাজ করত বর্তমানে খালিস্থান লিডাররা বিদেশ থেকে সেইসব দেশের মধ্যে সবার উপর কানাডা, জার্মানি, লন্ডন, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া দেশ গুলি আগে আছে।

তবে এই কিছু মাসে Amritpal এর যথেষ্ট রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবেও শক্তিশালী হয়েছে। পাঞ্জাব যুব-সমাজেয একটি অংশ অর্থোডক্স শিখ মৌলবাদী Amritpal এর দিকে যাচ্ছে। এই কিছুদিন আগের ঘটনা আমাদের Jarnail Singh এর ঠিক শুরুর দিকের কথা মনে করিয়ে দেয়। ভারতের বুকে শিখ মৌলবাদ হিন্দুত্ব মৌলবাদ ইসলামিক মৌলবাদ এবং আঞ্চলিক মৌলবাদ একটি বাস্তব সমস্যা যা আমাদের দেশের জন্য তথা সাধারণ মানুষের জন্য একটি খারাপ স্বপ্নের মতো আসলে

এই ভারতীয় উপমহাদেশে অর্থোডক্স শিখ হিন্দু মুসলিম বুদ্ধিষ্ট মৌলবাদ সন্ত্রাসবাদ বিশ্বাসের ভাইরাস নিজের বিস্তার করে চলেছে। আমরা দেখেছি কৃষক আন্দোলনে অর্থোডক্স শিখ কি ভাবে একজন ব্যক্তি অছুত দলিত হবার জন্য তার হাত পা কেটে নেওয়া আমরা দেখেছি একজন পুলিশ' ট্রাফিক আইন ভাঙার অপরাধে জরিমানা করাতে এক নিহঙ্গ পুলিশ এর হাত কেটে দিয়েছিল। আসলে শিখ ধর্ম নিয়ে আমি যতটা পড়াশোনা করেছি এবং বুঝেছি। এই ধর্মের ভালো দিকটা বেশি থাকলেও অল্প খারাপ দিয়ে সব টাই খারাপে পরিবর্তন করা যেতে পারে। এই অর্থোডক্স ধর্মান্ধ মানুষ গুলিই সমাজে ধর্মীয় ভেদাভেদ সৃষ্টি করে রেখেছে। নিজেদের খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে। আসলে Amritpal ভালো করে জানে টাকা ক্ষমতা ভারতে ধর্মের মাধ্যমে আসে এবং একটি সময় এটা চরম সাম্প্রদায়িকতার রূপ নেয়....

তথ্যসূত্র

1 | https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8_%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE

2 | https://books.google.co.in/books?id=XJzUzWDwZ4kC&pg=PA218&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

3 | https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CREC-1998-10-15/pdf/CREC-1998-10-15-pt1-PgE2197.pdf

4 | https://www.panthic.org/articles/5548

5 | https://theprint.in/opinion/ambedkar-changed-on-separate-communal-electorate-his-shift-was-strategic-not-voluntary/638904/

6 | https://clpr.org.in/blog/b-r-ambedkars-idea-of-separate-settlements/

7 | https://theprint.in/politics/the-former-punjab-chief-minister-who-fought-terror-and-loved-tea/109194/

8 | https://upscwithnikhil.com/article/history/assassination-of-indira-gandhi

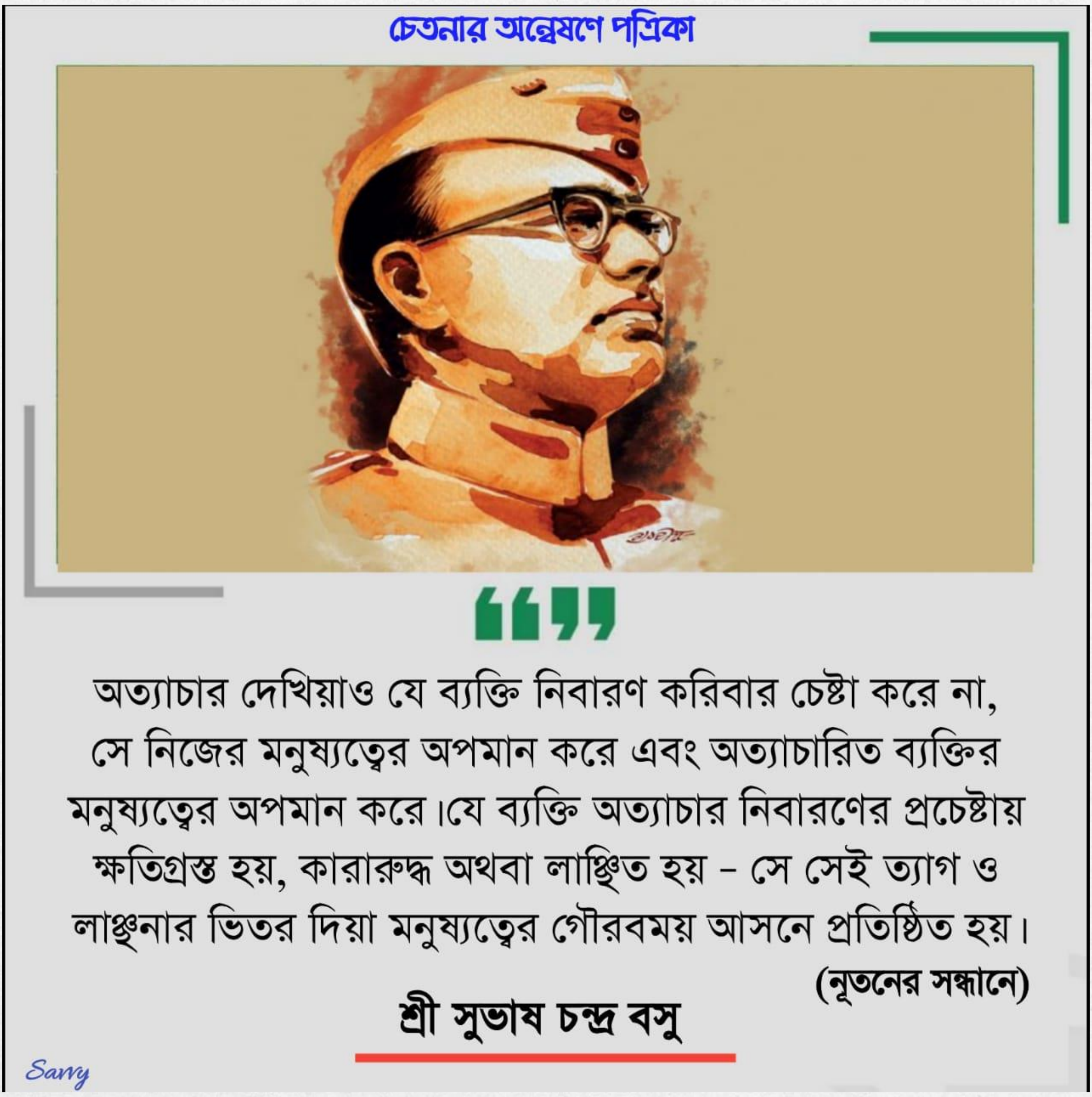
9 | https://m.thewire.in/article/rights/1984-sikh-massacre-remembrance/amp#amp_tf=From%20%251%24s&aoh=16774909179501&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com

10 | https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/sikh-terrorism-struggle-khalistan

11 | https://www.mha.gov.in/MHA1/Par2017/pdfs/par2013-pdfs/ls-050313/LSQ.1192.Eng.pdf

12 | https://www.ndtv.com/people/bhindranwale-2-0-radical-preacher-and-khalistan-sympathiser-amritpal-singh-very-active-in-punjab-3810442

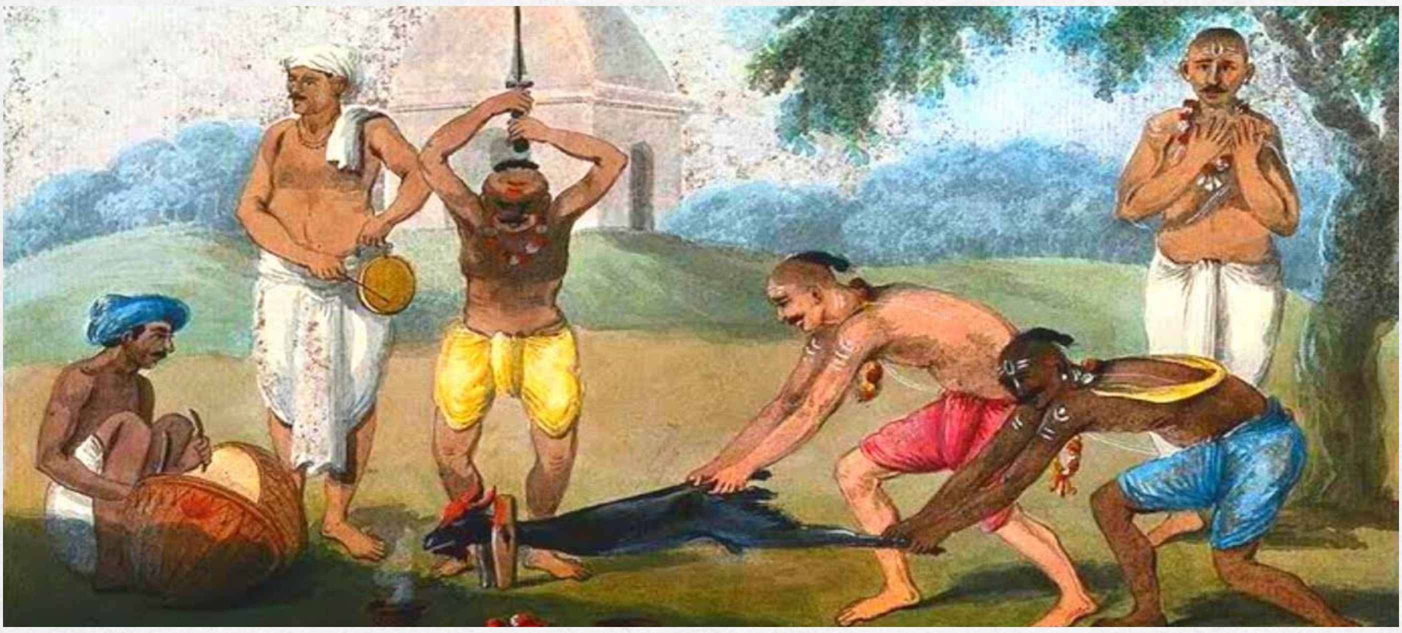
13 | https://indiankanoon.org/search/?formInput=khalistan



সূচিপত্র

ধর্মই অধর্মের মূল

লি খে ছে ন – দি বা ক র ম ণ্ড ল



ধর্ম শাস্ত্র নামক সংবিধানের যাঁতাকলে পড়ে যেমন মানুষের একটা বিশেষ সম্প্রদায় শোষণ ও নির্যাতন হয়ে আসছে, তেমনি এই ধর্ম শাস্ত্র গুলির নিষ্ঠুর লেখনী নিরীহ পশু পাখিদের কাছেও অভিশাপ হয়ে এসেছে।

এই যেমন অবলা প্রাণী হাঁস- মুরগি, গরু- ছাগল, পাঠা, মহিষ, উট, কবুতর- এরা জনেই না এদের কি দোষ! কোনো দোষ না করেও শুধু মাত্র ধর্ম শাস্ত্রের সন্মান রক্ষার্থে এই সকল প্রাণীর বলি দেওয়া হয়।

ভেবে দেখবেন যারা এই সকল ধর্ম শাস্ত্র চালাকি করে লিখেছে তারা কতটা নিষ্ঠুর মানসিকতার হতে পারে!

সেই সাথে ধার্মিক দের প্রচলিত কুসংস্কার গুলি যেভাবে পশু পাখিদের মানব সমাজে ভয়ের আর অভিশাপের বিষয় করে তুলেছে সেটা আরো লজ্জাজনক।

এই যেমন একটি উদাহরণ দিচ্ছি।বেশি উদাহরণ দিলে বেশি লেখা হবে আপনাদের পড়তে ইচ্ছা হবে না জানি।

দেখবেন সব পশু রাস্তা কাটে। বিড়াল রাস্তা কাটলে হয় দোষ।

কেনো?

কারণ, জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে রাহুকে অশুভ গ্রহ বলে মনে করা হয়। রাহুর প্রভাবে জীবনে নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। দুর্ঘটনার যোগ আসতে পারে রাহুর প্রভাবে। বৈদিক জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুসারে বিড়াল হল রাহুর বাহন। এই কারণেই বিড়াল পথ কাটলে তা অশুভ বলে মনে করা হয়। কারণ বিড়াল পথ কাটছে মানে সেখানে রাহুর প্রভাব রয়েছে। রাহু যেমন দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে, তেমনি বিড়াল রাস্তা কাটলে তার জন্য দুর্ঘটনা হতে পারে।

এদিকে বেচারা বিড়াল না জানে রাহু কে, না তাকে চেনে, না রাহু তাকে খেতে দেয়, না থাকতে দেয়। নেহাতই কোনো খাদ্যের লোভে, নয়তো বা জীবনের ভয়ে, জীবন বাঁচাতে কারো তারা খেয়ে সে তাড়াহুড়ো করে রাস্তা পার হয়েছে। আর এটাই হয়েছে তার দোষ। একেবারেই মন গড়া একটা গল্প বানিয়ে এই পশুটাকে একটা মানব সম্প্রদায়ের চোখে বিষ বানিয়েছে এই ধর্ম শাস্ত্র রচনাকার।

একই ভাবে হিন্দু ধর্ম অনুসারে সম্পদের দেবী লক্ষ্মীর বোন হলেন অলক্ষ্মী। এই অলক্ষ্মী দারিদ্রের দেবী। বিড়াল অলক্ষ্মীরও বাহন বলে মনে করা হয়। তাই বিড়াল হল অশুভ আর সংকটের প্রতীক।

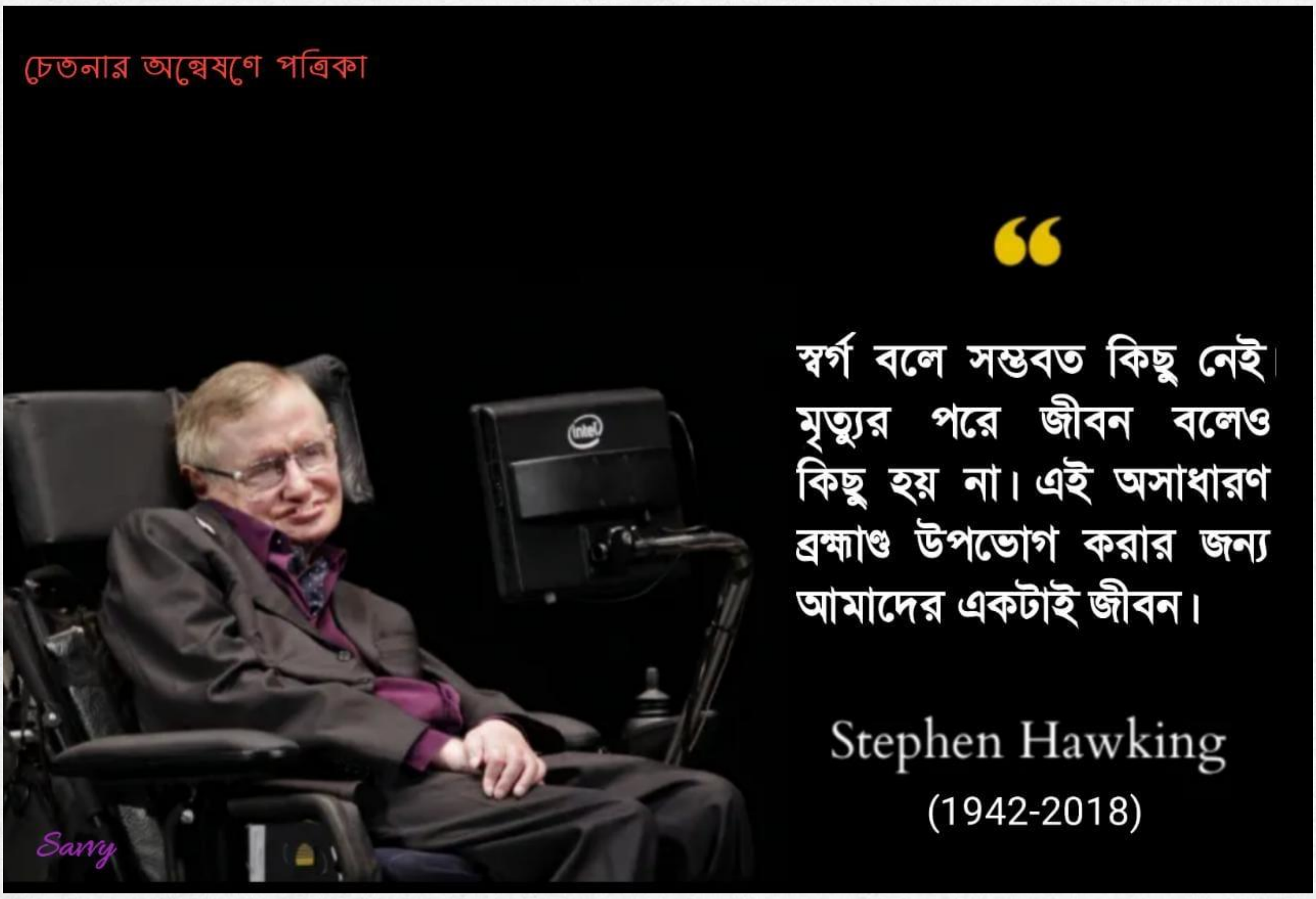
এবার আপনারাই বলুন। এটা কোনো যুক্তি হলো? লক্ষ্মী অলক্ষ্মী যতসব সাজানো নাটক আর সেই নাটকে খলনায়কের ড্রাইভার নাকি বিড়াল!

আমি তো আজ একটি পশুর দুর্দশার কথা শোনালাম। আপনারা নিশ্চয়ই আরো অনেক পশু, পাখি ও প্রাণীর নাম জানেন। আর এও জানেন এই ধর্ম মানতে গিয়ে কিভাবে এই সকল নিরীহ প্রাণীদের সাথে অত্যাচার করা হয়।

তাই একটাই কথা বলবো, কিছু করার আগে যুক্তি দিয়ে বিচার করুন, প্রয়োজনে কারো সাহায্য নিন। মানুষ হয়ে

জন্মেছেন, মানবিক হোন। নিষ্ঠুর হবেন না। আপনার কাটলে, আপনাকে মারলে, তাড়া করলে আপনার যেমন অনুভব হয়, সকল জীবের (পশু, পাখি ও প্রাণীর) একই রকম অনুভব হয়।

ফলতা, দ:২৪ পরগনা।



সূচিপত্র

বক্সা পাহাড়ে আর পড়াশোনা হবে না, বন্ধ হল সবকটি স্কুল

লি খে ছে ন – লা ল সিং ভু জে ল

(প্রতিবেদক বক্সা জঙ্গল লাগোয়া এলাকার বাসিন্দা এবং উত্তরবঙ্গ বন-জন শ্রমজীবী মঞ্চের আহ্বায়ক)



আলিপুদুয়ার জেলা তথা পশ্চিমবঙ্গের গর্ব বক্সা পাহাড়ের মাথায় সবকটি সরকারি স্কুল বন্ধ হয়ে গেল।

রাজ্যের ৮০০০-এরও বেশি স্কুল বন্ধের খবর ফলাও করে বের হলেও কেউ খেয়ালই করলেন না যে ঐ দুর্গম পাহাড়ের মাথার স্কুলগুলি একই অজুহাতে বন্ধ করে দেওয়া যায় না। সম্প্রতি সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে যেখানে ৩০ বা তার কম শিক্ষার্থী রয়েছে সেগুলো বন্ধ করবার

জন্য রাজ্য সরকারের তরফে একটি নোটিশ জারি করা হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে যেসব সরকার পোষিত বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৩০ বা তার কম সেইসব বিদ্যালয়গুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হবে। এই বন্ধ কেন? এর পেছনে গোপন রহস্য কী? সেগুলো নিয়ে আজ আর নাই বা বললাম, সে পরে হবে। আজ আসুন আমরা আমাদের ঐতিহ্যলালিত, ইতিহাসের স্মৃতি বিজড়িত বক্সা পাহাড়ে ঘুরে আসি। বক্সা আমরা যারাই গেছি তারা সান্তালাবাড়ি চিনি। সেই সান্তালাবাড়ি গ্রামের আগে যেখানে একমাত্র সরকারি বাস গিয়ে থামে সেই জায়গাটি হল ২৯ বস্তি। তার পর হেঁটে বা গাড়িতে সান্তালাবাড়ি গিয়ে মমো খেয়ে আবার এগোনো শুরু হবে। এই সান্তালাবাড়ি আর একটি গ্রাম, তারপর সদরবাজার, ডারাগাওঁ, বক্সাফোর্ট, লাল বাংলা, তাসি গাওঁ। পুবের দিকে খাটালাইন হয়ে লেপচাখা, ওছলুম-ছবির মতো গ্রামগুলো। আবার পশ্চিমে চুনাভাটি, নামনা, সেওগাওঁ আর আদমা। এই গ্রামগুলো সবকটিই ফরেস্টের ভেতরে। তা সেখানে যারা থাকে তারাও তো জংলী তাই না! সেই গ্রামগুলোর জন্য অল্প কিছু বছর আগে বরাদ্দ হয়েছিল চারটি ছোট ছোট স্কুলের, তার মধ্যে প্রাথমিক ৩টি আর একটি জুনিয়ার হাই স্কুল। আপনারা সকলেই জানেন গ্রামগুলো খুবই ছোট ছোট, জনসংখ্যা খুবই কম তাই স্বভাবতই ছাত্রসংখ্যাও কম। এবারে ছাত্র সংখ্যা ৩০এর নীচে হলে সেই স্কুল বন্ধ। তাই সবগুলো স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হল। তার নোটিশ এখনো

সোস্যাল মিডিয়ার দৌলতে সবার হাতের মুঠোয়। তা বক্সা পাহাড়ের মাথায় নামনা, সেওগাওঁ, আদমা তো ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কি ৩০এর বেশি হওয়া সম্ভব? এই সহজ সরল প্রশ্নটি শিক্ষা দপ্তরের কর্তাদের মাথায় কি আসেনি? নাকি তারা ঐ দূর দুরান্তের স্কুলগুলির ঝামেলা(?) ঝেড়ে ফেলতেই চাইছেন? আর সবকটি স্কুলই বন্ধ করে দিতে হবে। হায় রে! যখন প্রতিটি শিশুর বিদ্যালয়ে পড়বার অধিকার ভারতের সংবিধান দিয়েছে, যখন সবাই চাইছেন সব শিশু বিদ্যালয়মুখী হোক, যখন শিশুদের একটিবেলার খাবার অন্তত নিশ্চিত করতে মিড-ডে মিল চালু করা হয়েছে, তখন একটি বিস্তীর্ণ এলাকার সবকটি স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হল। একবারও ভাবলেন না যে ঐ গ্রামগুলির শিশুদের অন্য কোনো বিকল্পই রইল না।

ফরেস্ট ভিলেজের মানুষজন যাদের ছাড়া ফরেস্টটাই থাকবে না, তাদের জন্য বনাধিকার আইন প্রস্তুত হয়েছে। যুক্ত হয়েছে ভারতের সংবিধানে। যদিও তাকে খর্ব করবার জন্যও উঠে পড়ে লেগেছে সরকার। তা ঐ বনের মানুষগুলো, ঐ জংলী(?) মানুষগুলো তাদের খাবার-দাবার কীভাবে পাবে, ন্যূনতম চিকিৎসা কীভাবে পাবে তার ব্যবস্থাই ছিল এই পাহাড়ের এক জ্বলন্ত সমস্যা সেখানে এবার যুক্ত হল তাঁদের বাচ্চাগুলো পড়বার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হবে। আসলে কী সবটা মিলে একটা সম্পূর্ণ চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য? মানে সবদিকে থেকে বঞ্চিত করে

রাখো যেন নিজেরাই জঙ্গল ছেড়ে পালিয়ে যায়। তাহলেই অবাধে লুঠ করা যাবে জঙ্গল!! 'বাঘ ছাড়া হবে'- সেই ভয় দেখিয়ে, '১০লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে' তার প্রলোভন দেখিয়েও যখন কাজ হল না তখন কি এ এক অভিনব পন্থা?

আর গত তিনদিনে কোনো মিডিয়াতেই স্থান পায় না এই স্কুলগুলির অবলুপ্তির কথা!এই চক্রান্ত কতটা গভীর! হাতে মারো ভাতে মারো সব দিক থেকে মারো ঐ জংলীগুলোকে। এই চাইছেন!

৮০০ কি.মি. দূরের রাজধানীতে বসে এ নিয়ম করা খুব সহজ যে ৩০ এর কম ছাত্র-ছাত্রীর স্কুলগুলিকে বন্ধ করে দাও। বাস্তব কঠিন সত্যটি তাদের বুঝতে অসুবিধে হতেও পারে, তাহলে স্থানীয় প্রশাসন! তারা একবারও ভাবলেন না? একটি বারও মনে হল না মানুষগুলি কী করবেন? কোথায় যাবেন? অথচ ভোটের সময় একদিন আগেই টিম পাঠিয়ে ভোট নেবার আশ্রয়স্থল ঐ স্কুলগুলির একটি। সত্যি কি বিচিত্র এই দেশ!

শিক্ষার অধিকার তো প্রতিটি শিশুরই আছে। তা এবার কোথায় যাবে শিশুগুলি? তাদের কি কোনও বিকল্প ব্যাবস্থা আছে ঐ পাহাড়ের মাথায়? তাহলে পড়া বন্ধ। শিক্ষা বন্ধ। মিড-ডে মিল বন্ধ। থাক অশিক্ষিত হয়ে। এটাই কি চাইছেন প্রকারান্তরে! আমরা খুব গর্ব করি আমার জেলার, আমার রাজ্যের ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলির মধ্যে

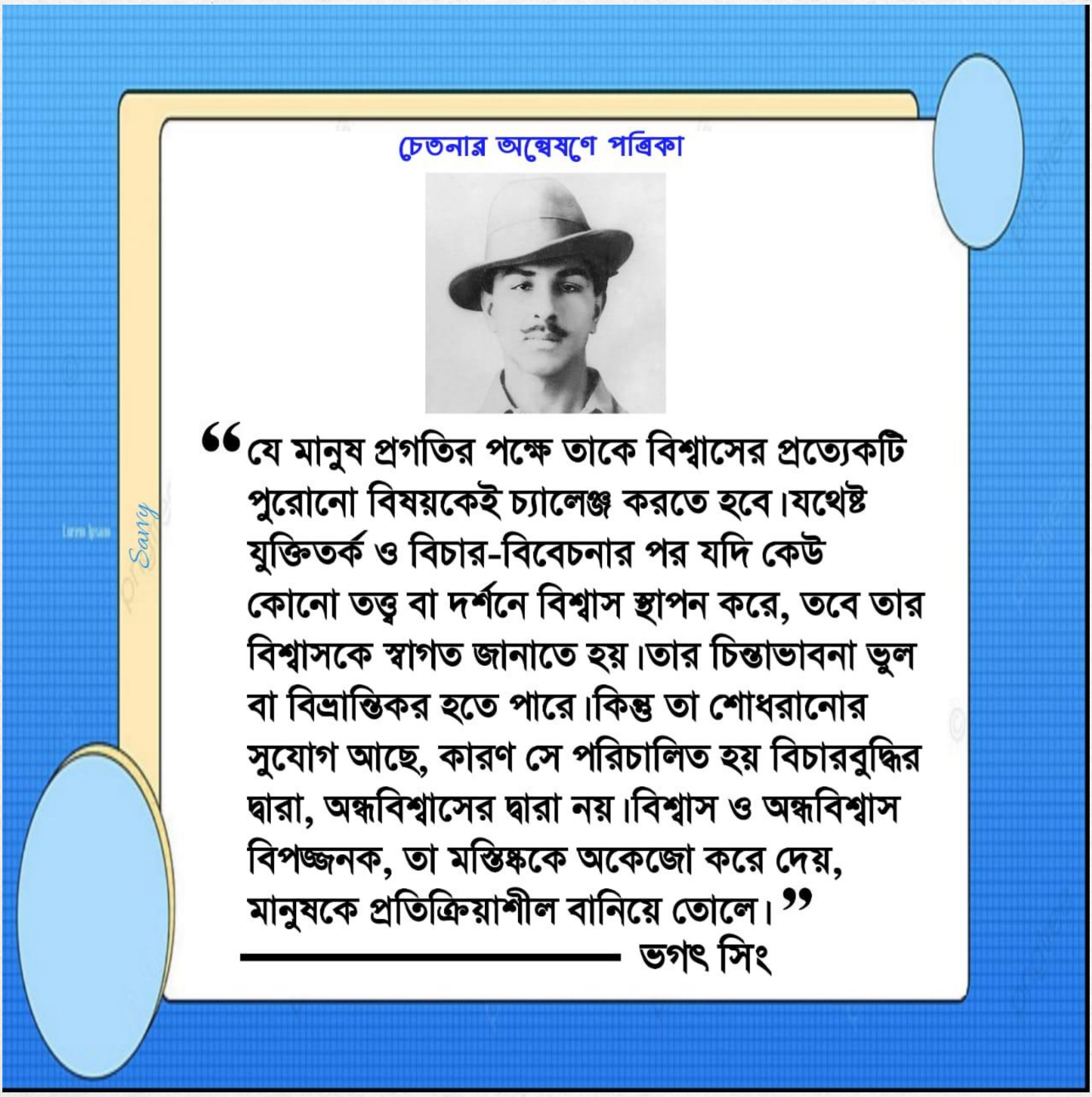
বক্সা পাহাড় একটি। প্রতিবছর সেখানে হাজির হই ১৫ আগস্টের পতাকা ওড়াতে (সরকারি খরচে)! কোটি কোটি টাকা খরচ করে (?) হেরিটেজ রিনোভেশনের নামে বক্সা পাহাড় নিয়ে ব্যবসার বুদ্ধি ঠিক জোগাড় হয়ে যায় আর বাচ্চাগুলো পড়তে পারবে না, সেটা একবারও মাথায় আসে না? বাঃ কি বিচিত্র ভাবনা!

তপশিলী উপজাতির পশ্চিমবঙ্গের তালিকায় ভুটিয়া, শেরপা, টোটো, ডুকপা, টিবেটান, ইয়েলমো এক সারিতে আছে। তার মধ্যে ডুকপা জনজাতির সবচাইতে বেশি মানুষ বাস করেন এই বক্সা পাহাড়ে। সংখ্যায় তারা কত? ১০০০ বা তার আশেপাশে। এদের পাশে কি দাঁড়াবার কথা ছিল না? না ওদের শিক্ষার ন্যূনতম ব্যাবস্থাটুকুও বন্ধ করে দেওয়া হল। তাহলে স্থানীয় প্রশাসন, শিক্ষা দপ্তর, আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর, অনগ্রসর শ্রেণি কল্যান দপ্তর কাদের কল্যাণে? কী কাজে ব্যস্ত? পশ্চিমবঙ্গের আর পাঁচটা জেলায় কী হল তা আজকের বিষয় নয়? এই বক্সা পাহাড়ের বিষয়টি একটু অন্যভাবে দেখাই যেত। না তা হল না। ফরমান বেড়িয়ে গেল স্কুল বন্ধ।

এরপর আবার যখন বক্সা পাহাড়ে যাবেন স্ফুর্তি করতে তখন দাঁড়াতে পারবেন তো ঐ মানুষগুলোর সামনে? ওদের বাড়িতে আপনার জন্য রান্না করে দিতে বলতে লজ্জা করবে না? আপনার শিশুটির জন্য খাবার তৈরি করে দিতে বলবেন ওই না পড়তে পারা নিষ্পাপ শিশুদের? আজ

একবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে এই প্রশ্নগুলিই করুন। যদি উত্তর পান...।

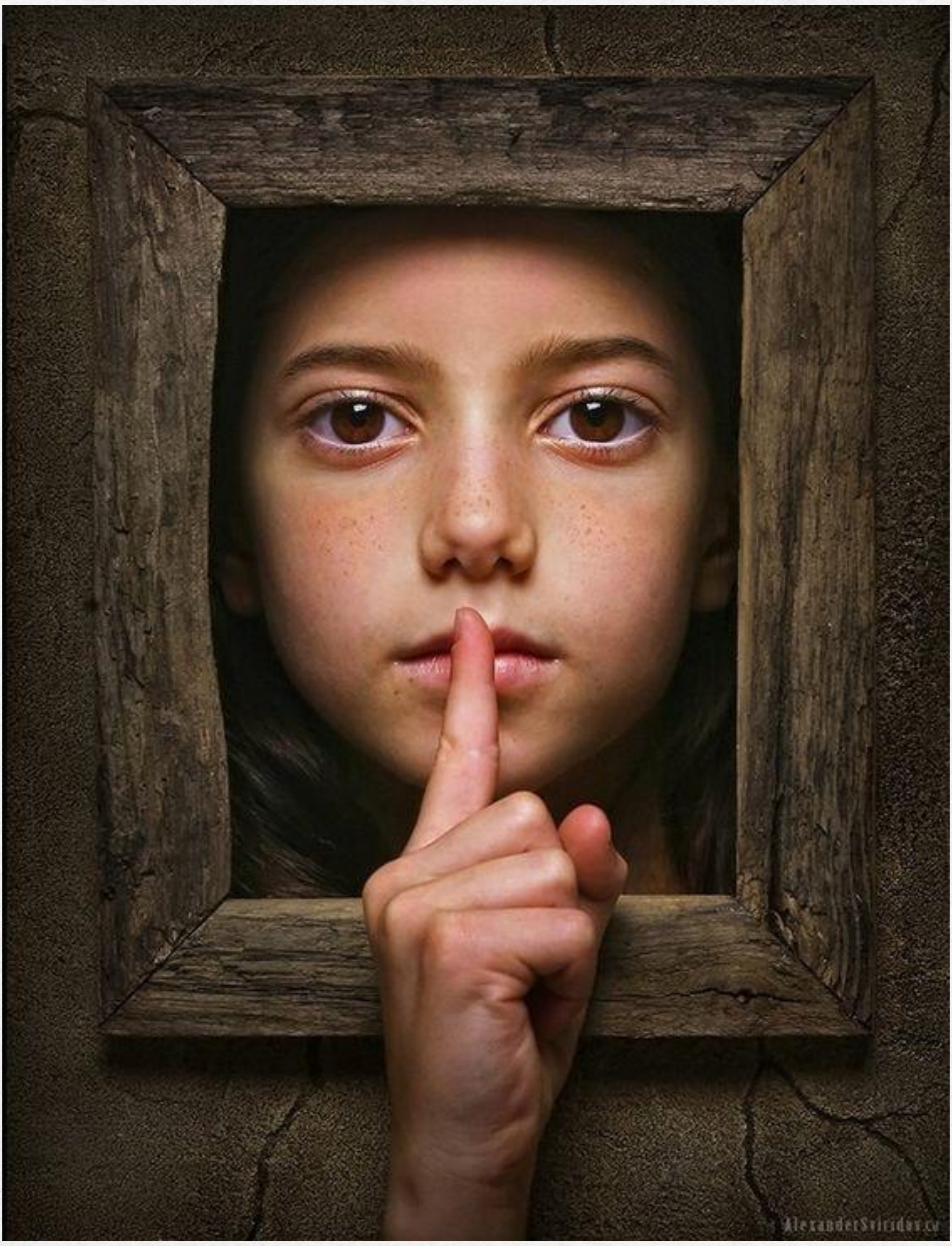
সংগ্রহ: http://www.ba.cpiml.net/deshabrati/2023/03/all-schools-will-be-closed-in-buxa-hills



মেয়েরা কতটা স্বাধীন?

লি খে ছে ন – শু ভ জি ৎ বি শ্বা স

(কলেজ ছাত্র)



সারাদেশ জুড়ে যখন শিক্ষা, শিক্ষা আর শিক্ষার বিতরণ চলছে ঠিক এমন সময় আমি বারান্দার ব্যালকনিতে বসে ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভেবে এক শব্দের

পাহাড় সাজিয়ে ফেলেছি। যে শব্দ পাহাড় ভেদ করে যাওয়ার ক্ষমতা যদিও আমার হয়নি তবুও স্বপ্নের সাথে কল্পনা মিশিয়ে মিথ্যা ভবিষ্যতের জটলা পাকাতে অসুবিধা কোথায়? হ্যাঁ, মিথ্যা ভবিষ্যৎ ....স্বপ্নহীন পৃথিবী, উদ্দেশ্যেহীন জীবন এই সব নিয়েই যে আগামী আমার জন্য অপেক্ষা করছে। কারণ আমার মতো পরিবারের মেয়েদের তো অন্ধকার নিয়েই জন্মাতে হয়। তাই আলোকিত জীবন আমাদের মানাই না। তবুও কাজের ফাঁকে আলোকিত জীবনের ছবি আঁকি, অনেক বড়ো হওয়ার, চাকরি করার, নিজের পায়ে দাঁড়ানোর। আমার পাশের বাড়ির সৌমিতা দিদির মতো নার্স হয়ে অসহায় মানুষের পাশে থাকতে ইচ্ছে করে, ইচ্ছে করে একজন সৎ মস্ত বড়ো পুলিশ অফিসার হই, দেশের জন্য প্রাণ দেব। ইচ্ছে করে আরও অনেক কিছু করতে কিন্তু আমার ইচ্ছেগুলো আমার থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে আমার বয়স। এই তো কয়েকদিন হল আঠারো বছর পূর্ণ হল। পাত্র দেখাশোনা চলছে বেশ কয়েকবছর ধরে। হয়ত পছন্দও হয়েছে অনেক পরিবারের।

একবার আমার যখন ষোলো বছর বয়েস তখন বাবা বিয়ে দেওয়ার জন্য খুব উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। বাবা যখন মেয়ের বিয়ের যাবতীয় আয়োজন প্রায় শেষ করে ফেলেছেন তখনই একদিন সকালে একটা পাশের বাড়ির কাকু এসে

কন্যাশ্রী, রূপশ্রী'র বিস্তারিত আলোচনায় জমে উঠলেন বাবার সাথে। বিয়েটা পিছিয়ে দেওয়া হল। আমি মনে মনে খুব খুশি হয়েছিলাম। সেদিন আমি বাবাকে অনেক বুঝিয়েছিলাম, আমি বিয়ে করতে চাই না, কিন্তু কে শুনবে? একটা মেয়ের দায়িত্ব কে নেবে? বয়স বাড়ছে। মেয়েরা তো কুড়িতেই বুড়ি। খুব অদ্ভুত এসব প্রবাদ। তবে যাই হোক আমার মন খুশির জোয়ারে ভেসেছিল বিয়েটা বাতিলে। আবার পড়াশোনা করার সুযোগ, স্বপ্নপূরণ ইত্যাদি সবই হবে। হয়েছিল সেটা তবে দু'বছরের জন্য। কন্যাশ্রী পেয়েছি কিন্তু বিয়ে না ঠিক হলে তো রূপশ্রী পাওয়া যাবে না। আবার পাত্র দেখা শুরু হল জোর কদমে। হয়ত দু'মুটো ভাতের জন্য, আশ্রয়ের জন্য আবারও আমি নীরব হলাম। অবশেষে পাত্র মিললো আমার থেকে বছর দশকের বড়ো। রূপশ্রী'র ফর্মও ফিলাপ হয়ে গেল খুব দ্রুত। হয়ত টাকাটা পাওয়ার পরেই বিয়ের পিরিতে বসতে হবে। সময়ের সাথে সাথে স্বপ্নগুলো অস্পষ্ট হয়ে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। অনেক কিছু করার থাকলেও কিছুই করতে পারছি না।

এখন আমি ব্যালকনিতে বসে আছি। বাইরের বৃষ্টি দেখছি। বৃষ্টির শব্দের সাথে ভাবনার এক অদ্ভুত মিল খুঁজে পাচ্ছি। ভাবনাগুলো বন্ধ ঘরে আমায় গলা চেপে মেরে ফেলে দিতে চাই। টাকার কাছে বিক্রি হয়ে গেল আমার স্বপ্ন, খুব অল্প

দামে। হয়ত কন্যাশ্রী রূপশ্রী'র জন্য আমার ষোলো বছরে ছন্দপতন হয়নি। তবে যাই হোক আমার ভাবনা এগুলো নয়। আমি ভাবছি আগামী প্রজন্ম কি আঠারোতেই আটকে যাবে নাকি স্বপ্নের কাছে পৌঁচ্ছাতে পারবে? জানি না তবে এটুকু বুঝতে পারছি বাল্যবিবাহ বন্ধ হলেও কোনো মেয়ের স্বপ্নপূরণের দায়িত্ব কেউ নেই না। এমনকি নিজের পরিবারও না। মেয়েরা যে কুড়িতেই বুড়ি।

সূচিপত্র

জ্বিন বা ভুতে ধরা আসলে কী?

লি খে ছে ন - পা র্থ প্র তি ম পা ল



আমাদের মত দেশে জ্বীনের আছর বা ভুতে ধরা ঘটনা দেখেননি এমন লোক বিরল। সুস্থ স্বাভাবিক একজন মানুষ হটাৎ অস্বাভাবিক কিছু কর্মকান্ড শুরু করে চারিদিকে হৈচৈ ফেলে দেয় তারপর ওঝা বা ফকিরের ভুত জ্বীন তাড়ানোর নাটকীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পর্বের সমাপ্তি হয়।

কিন্তু এই জ্বিন বা ভুতের ভরের আসল কারন কী?

কী বলছে চিকিৎসা বিজ্ঞান? কী কারনে জ্বিন ভুতে পাওয়া মানুষ এমন করে?

জ্বিন/ভুতে ধরা কেসের অধিকাংশ হিস্টেরিয়ায় আক্রান্ত।

হিস্টেরিয়া ছাড়াও সিজোফ্রেনিয়া, স্কিটসোফ্রেনিয়া, ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভড বা পারকিনসিনিজম সহ আরো কিছু রোগে এই রকম আচরণ দেখা যাতে পারে। কিন্তু হিস্টেরিয়াই হল কমন কারন।

হিস্টেরিয়া কি?

হিস্টিরিয়া হচ্ছে ব্যক্তির মধ্যে দুর্দমনীয় ভয় ও অতিরিক্ত আবেগের প্রকাশ। এই অবস্থায় রোগীর অনিয়ন্ত্রিত এবং সহিংস আচরণ করে থাকে।

হিস্টেরিয়ার লক্ষণ -

১)শরীরের অংশ বা পুরো শরীরই অবশ হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হওয়া।

২) কথা বলতে না পারা, ঢোক গিলতে না পারা, গলার কাছে কিছু একটা আটকে আছে বলে মনে হওয়া।

৩)কখনো চোখে না দেখা বা কানে শুনতে না পারা।

৪) খিঁচুনি। খিঁচুনি হয়ে তারা অজ্ঞান এর মত হয়ে যায়। যদিও সেটা প্রকৃত খিঁচুনি বা অজ্ঞান নয়। মৃগী রোগের প্রকৃত খিঁচুনির মতো এখানে জিব বা ঠোঁট কেটে যায় না।

৫)হাত-পায়ের অস্বাভাবিক নড়াচড়া, বারবার চোখের পলক পড়া, জোর করে চোখ বন্ধ করে রাখা, ঘাড় বাঁকা করে থাকা এবং বমি করা বা বারবার বমির চেষ্টা করা।

৬)সহিংস মনোভাব ও অস্থিতিশীল হৃৎস্পন্দন।

৭)কোনো কারণ ছাড়াই অট্টহাসি বা কান্না করা।

হিস্টেরিয়া কেন হয়?

যেকোন কারণে মানসিক ক্রিয়াশক্তি দুর্বল হয়ে গেলে সেই অবাঞ্ছিত অবদমিত কামনাগুলো সজ্ঞান চেতনায় উঠে আসতে চায়।

শুরু হয় দ্বন্দ্ব, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে নানা শারীরিক লক্ষণে।

- সামাজিক বা পারিবারিক অবহেলার শিকার হওয়া
- স্ট্রেস
- যৌন নিপীড়ন
- অলসতা
- কাছের কারো থেকে থাকলে
- নার্ভাসনেস
- আবেগের ত্রুটিপূর্ণ চর্চা
- মেন্টাল স্ট্রেস
- ভয়
- দুশ্চিন্তা

এগুলোই মূলত কারন।

হিস্টেরিয়া মেয়েদের কেন বেশি হয়?

নারীর ক্ষেত্রে সামাজিক বিধিনিষেধ বেশি থাকে। বিধিনিষেধের কারনে নারী তার কামনা-বাসনাগুলোকে অবদমিত করে রাখে।

অবদমিত সহজাত কামনার সঙ্গে সামাজিক আচারের সংঘাত ঘটে। সৃষ্টি হয় সহ্যাতীত উৎকণ্ঠা ও মানসিক চাপ।

সহজে কিভাবে বুঝবেন এটা হিস্টেরিয়া নাকি প্রকৃত খিঁচুনি?

যেহেতু হিস্টেরিয়ায় কেউ প্রকৃত অজ্ঞান বা সেন্স হারায় না তাই এদের কখনো দাত লেগে জিভ কেটে যায় না। বরং দাতের পাটি খুলতে গেলে আরো জোরে আটকে রাখার চেষ্টা করে। একটা টর্চ নিয়ে চোখে ফেললে চোখের পিউপিল ছোট হয়ে যাবে আলোর জন্য যেটা অজ্ঞান হলে ছোট হয় না। ব্যাথা দিলে এরা ব্যাথা পায়।

ওঝা ফকিরে কিভাবে ভাল করে এদের?

হিস্টেরিয়ার ভুক্তভোগীরা মূলত আদর ভালবাসার কাঙ্গাল এবং অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে।

নিজের অবদমিত ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর পর এদের ক্ষোভ প্রশমিত হয় এবং সেটা থেকে স্বাভাবিক হবার পরিচিত কোন পদ্ধতি খোঁজে এরা যেটা হল ওঝা ফকিরের ঝাড়ফুক।

হিস্টেরিয়াতে/ ভুতে/ জ্বিনে ধরলে কি করণীয়?

ফকির ওঝা দিয়ে অপচিকিৎসা না করিয়ে রোগীকে যথোপযুক্ত চিকিৎসা করানো উচিৎ মনোরোগ বিশেষজ্ঞ এর মাধ্যমে।

পারিবারিক মানসিক সাপোর্ট হল চিকিৎসার সবচেয়ে বড় পার্ট। প্রতিটা হিস্টেরিয়া রোগী যথোপযুক্ত চিকিৎসা এবং সহায়তা পেলে সুস্থ এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে।

সূচিপত্র

প্রসঙ্গ: ধর্ম

লিখেছেন – রাজু দত্ত



ধর্ম কথাটার মানে হল ধারন করা। যে যা স্বভাব বা বৈশিষ্ট্য ধারন করে সেটাই তার ধর্ম। যেমন জলের একটি ধর্ম, আধারের আকার ধারন।

মানুষের ধর্ম তাই-ই যা মানুষ ধারন করে থাকে। এক্ষেত্রে ঔচিত্যবোধের প্রশ্নটি জড়িত। আপনি যে স্বভাব বা বৈশিষ্ট্য ধারন করে আছেন, সেটাই আপনার ধর্ম।

মানুষের শারীরিক গঠন তার ধর্ম। যেমন তার মস্তিস্ক, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, গায়ের রঙ ইত্যাদি। আবার তার স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যও তার ধর্ম। এই স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের সাথে ঔচিত্যবোধের প্রশ্নটি জড়িত। যেমন চুরি করা চোরের ধর্ম, কিন্তু তা উচিৎ নয়। তাই এই ধর্ম গ্রহনযোগ্য নয়। আবার বিপদে আপদে মানুষ হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানো উচিত। এটা গ্রহণযোগ্য।

অর্থাৎ যে শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলি মানুষ ধারন করে থাকে সেগুলিই তার ধর্ম। মানুষের মানসিক বৈশিষ্ট্য, যা তার ও অন্যান্য জীবের পক্ষে মঙ্গলজনক তাকেই মানবধর্ম বলা যায়।

মানুষের সততা, ভালবাসা, মুল্যবোধ, জ্ঞানপিপাপা ইত্যাদি হল তার ধর্ম। এটাই মানবধর্ম। মানুষ হিংস্র জন্তকেও রক্ষা করার চেষ্টা করে যাচ্ছে অবিরত, এটা মানবধর্ম। অপরদিকে মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা, বিদ্বেষ, হিংসা ইত্যাদি মানবধর্ম নয়। আপনি যে ধর্মাবলম্বীই হোন না কেন, আপনি মানুষ। তাই মানবধর্ম আপনাকে মেনে চলতেই হবে। আপনি চান বা না চান। মানবধর্ম বিরোধী হলে আপনি দয়া মায়া, সততা, প্রেম সহ সকল সদ

আচরণ এর বিরোধী। কারণ এগুলোই মানুষের ধর্ম। মানুষের ধর্মই মানবধর্ম।

কোনো মানুষ যদি মানবধর্মে বিশ্বাসের কথা বলে অসদাচরণ করে, তা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। তার অসদাচরণ দেখে মানবধর্ম ভ্রান্ত হয়ে যায় না। তাই



আপনার বিচারবুদ্ধি দিয়ে ভেবে দেখুন, মানুষের কী করা উচিৎ। তাই করুন। এটাই আপনার কর্তব্য।

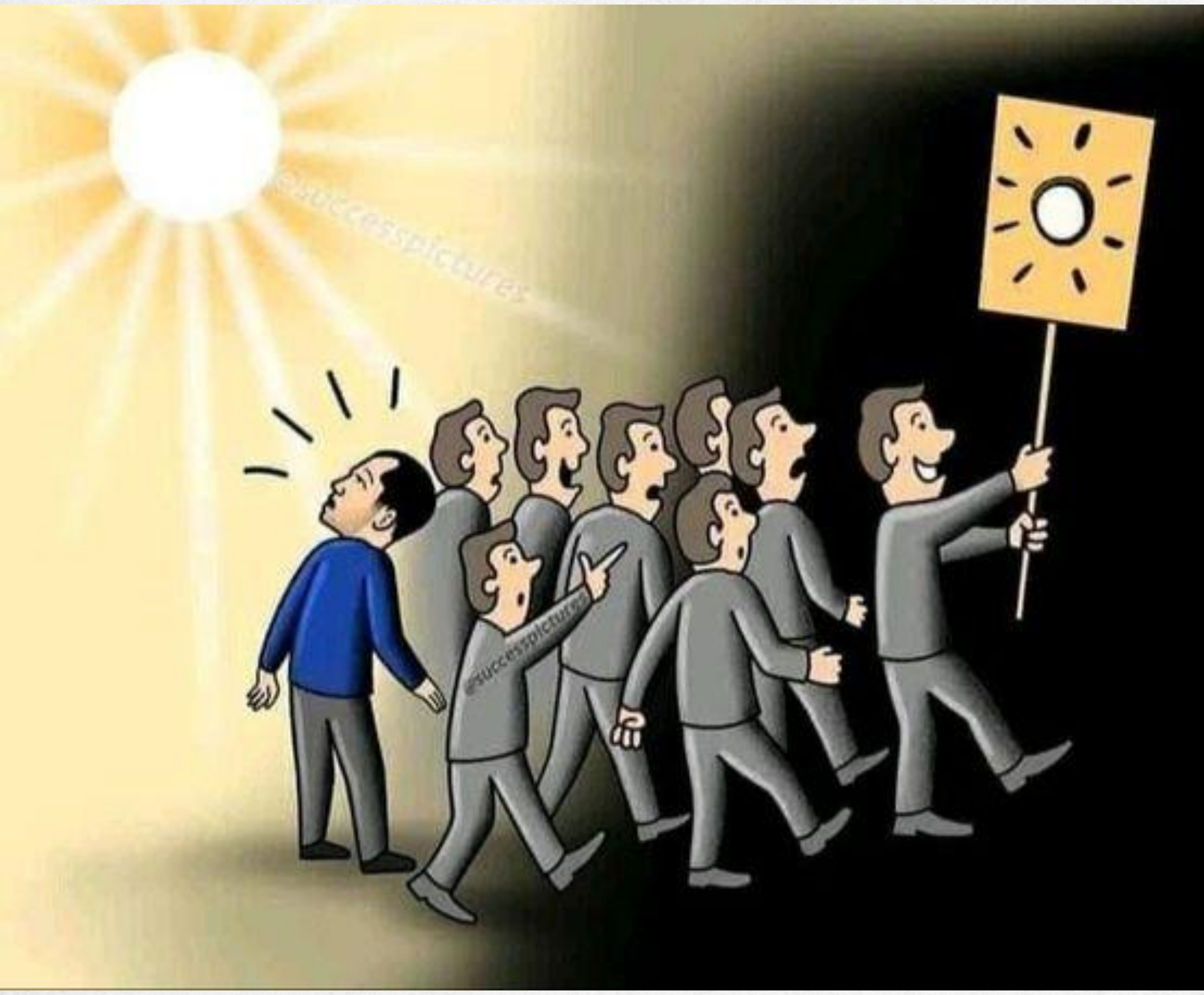
জাতি ও বর্ণগত বিদ্বেষ, অর্থনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, অসহিষ্ণুতা, ঘৃণা, হিংসা, কলহ, অসততা,

দ্বিচারিতা, স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা সহ সকল অসদাচরণ মানবধর্ম বিরোধী। এগুলি পরিত্যাগ করুন। এগুলি মানুষের ধর্ম নয়।

সূচিপত্র

বাস্তবে যুক্তিবাদী হতে পারা ও তার প্রয়োগ নিয়ে কিছু কথা

লি খে ছে ন – বি শ্ব না থ মু র মু



আমরা অনেক সময়ই খুব সাধারণ একটা কথা, খুব সাধারণভাবেই ব্যাবহার করে থাকি, charity begins at home. অর্থাৎ কিনা, বাড়ি থেকেই আসল বিদ্যাশিক্ষার

শুরু করতে হয় (এখানে যুক্তিবোধ বা যুক্তিবিদ্যা শিক্ষা)। আক্ষরিক অর্থে, এক্ষেত্রে শুধু নিজের বাড়ি বা বাড়ির লোকই ধরা হয় না, ধরা হয় প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় পরিজন, সহপাঠী, সহকর্মী, ইত্যাদি। কিন্তু, ভেবে দেখলে ধরা পড়বে যে যারা নিজেদের যুক্তিবাদী বলে বা যাদের যুক্তিবাদী বলে লোকে জানে এবং যারা যুক্তিবাদী নয়, অনেক ব্যাবহারিক ক্ষেত্রেই তাদের সবার আচরণ এক হয়ে দাঁড়ায়, যা হল অযৌক্তিক অনেক কিছুই, না দেখার ভান করে থাকা বা অনেক সময় বাধ্য হয়েই চেপে যাওয়া। যারা যুক্তিবাদী নয় তারা তো গড্ডলিকা প্রবাহের লোক, কাজেই কিছু বলারই নেই। কিন্তু যারা জীবন যাপনে আদর্শবাদী, সত্যবাদী, অন্তত নিজেদের সেইভাবে তুলে ধরতে চায়, তাদের যদি গলায় তুলসি মালা, কপালে তিলক দেখা যায়, এটা কি আদর্শবাদী বা সত্যবাদীর আচরণ বলে মেনে নেওয়া যায়?

এটা হয়ে যায় আর এক প্রবাদের বহিঃপ্রকাশ, তামাকও খাব, আবার ডুডুও খাব। যুক্তিবাদ ছাড়া না আদর্শবাদ মানা যায়, না সত্যবাদের অনুসরন করা যায়। যুক্তিবাদ হল বাস্তবতা, বাস্তবতাই সত্য (এই সত্যই ধর্ম/ন্যায়), এর কোন দরাদরি হয় না। কাজেই, অবাস্তবতার আদর্শবাদ যেমন হতে পারে না, তেমনই অবাস্তবতার সত্যবাদও হতে পারে না।

চাই সচেতনতার পাঠ, প্রসার যা কিনা বিজ্ঞান মঞ্চগুলিই পালন করতে পারে। অবশ্য, এটা সত্যি, সব ক্ষেত্রে এবং সব সময়ে এককভাবে প্রতিবাদ করা যায় না বা যুক্তিটুকুও প্রকাশ করা যায় না। প্রচলিত ধারনার মূলে কুঠারাঘাত করা চাই পাল্টা যুক্তির অর্থাৎ বাস্তবতার ধারনা প্রচার করে। এরজন্য, সব জায়গায় সব সময়ে বিলি করা যায় এমন হ্যান্ডবিল ছাপা থাকলে, বিলি করলে হয়, যা কোন সংগঠনের মাধ্যমে করা হয়ে থাকলেই ভালো হয়, জোরদার হয়। বড় বড় বই কিনে পড়ে লোকে যুক্তিবাদী হবে, কুসংস্কারের ব্যাবসায়ী ধান্দাবাজরা পিছু হঠবে, এটা আশা করাই হাস্যকর। এবং যে কোন একক প্রতিবাদীই হয় হাসির পাত্র।

যখনই কেউ নতুন বাড়ি বানায়, কর্তা গিন্নি দুজনেরই কল্পনায় থাকে ছোট্ট একটা ঠাকুরঘর। যারা পারে না বা যাদের নেই, তারা একটা কোনে বসিয়ে নেয় ঠাকুরের আসন। কেউ, ঠাকুরের জন্য কাঠের আসন বা সিংহাসন, ফার্নিচারের দোকান থেকে কিনে এনে দেওয়ালে টাঙিয়ে দেন এই আসন। এই মানসিকতার পরিবর্তন দরকার। চাই যুক্তিবাদী ফার্নিচারের দোকান, যে তার বিজ্ঞাপনে লিখে রাখবে, এখানে কোন ঠাকুরের আসন বিক্রি হয় না বা বানানো হয় না। বাড়ি বানানোর সিভিল ইঞ্জিনীয়ার লিখে রাখবে, আমি মানুষের ঘরের প্ল্যান বানাই, ঠাকুরঘরের প্ল্যান বানাই না।

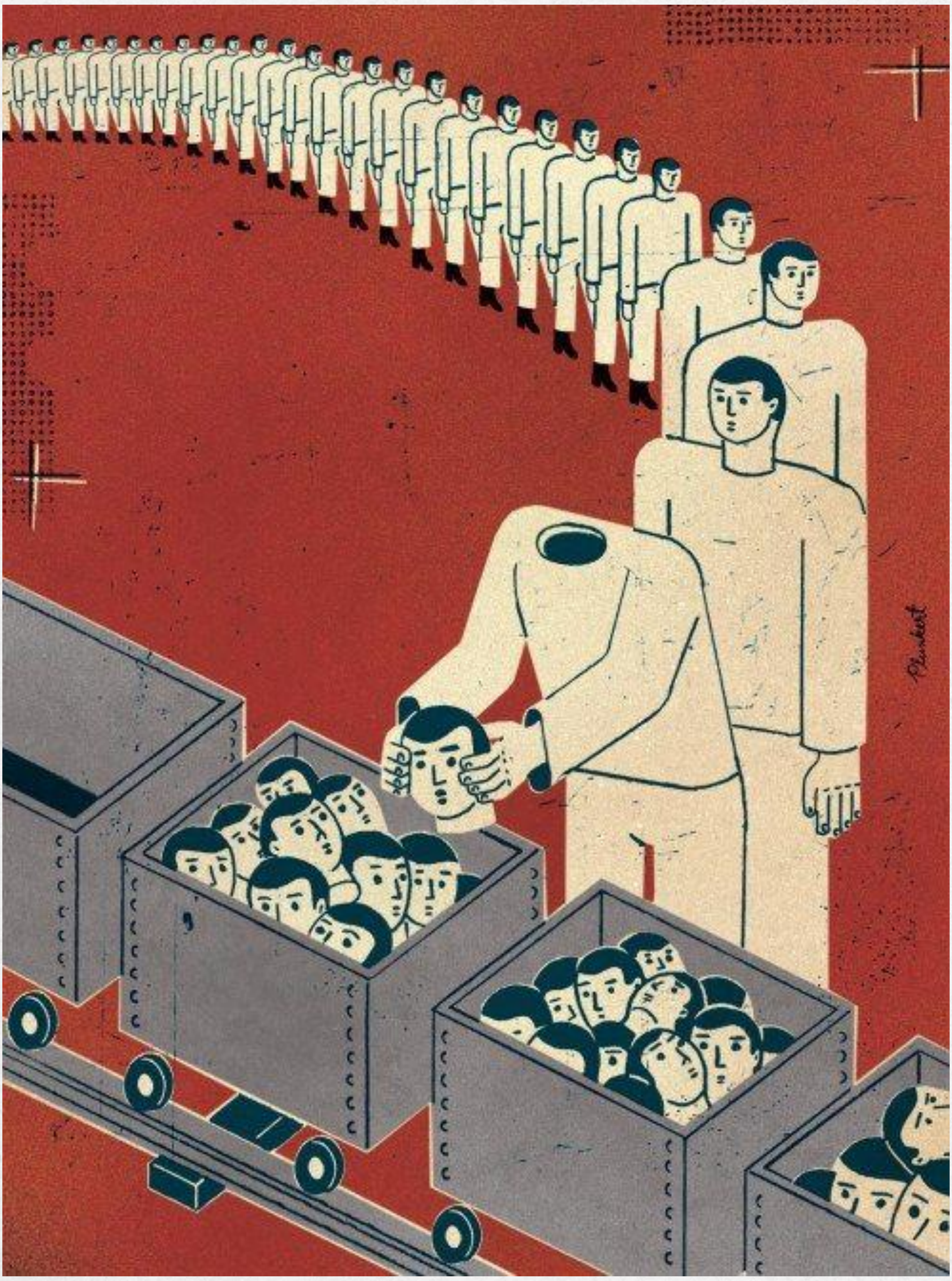
বাড়ির বাচ্চা কোলে করে কাজের মাসি কি আপন মাসি, তাকে ক্যালেন্ডারে ঠাকুর চেনাচ্ছে আর বলছে, নমো কর, নমো কর। কোন ক্যালেন্ডার ওয়ালার কি হিম্মৎ হবে, শুধুই রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সূর্য সেন, ক্ষুদিরামের ক্যালেন্ডার বানানোর? সে কি লিখে রাখার হিম্মত দেখাতে পারবে, যে সে ঠাকুরের ক্যালেন্ডার ছাপায় না? একশ' টাকার বিজনেসে তার হয়ত আঠানব্বই টাকাই আসে নানাবিধ ঠাকুরের ছবির (হনুমানেরও হতে পারে) ক্যালেন্ডার বেচে। আমাদের একমাত্র ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ বলে আমরা সস্তায় ফেসবুকে আলোড়ন তুলতে ব্যাস্ত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের র' জানতে চিনতে অনীহা। কেননা তাতে প্রভূত পরিশ্রম আছে।

বাড়িতে পূজোর আয়োজন হয়েছে। ছোটখোকা ঘোর নাস্তিক। সে তার নিজের ঘর থেকে বেরোবে না। বাড়ি ভর্তি পাড়ার লোক, আত্মীয় স্বজন। বড়খোকার উপর ভার দেওয়া হল, তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে একঘন্টার জন্য যেন নিয়ে আসে পূজোর ঘরে।

নিজের বাড়ি হোক কি পরের বাড়ি, কাউকে যখন বেরোতে দেখা যায় বাড়ির কোন সদস্য বা সদস্যা হয়ত বলে ওঠেন দুর্গা, দুর্গা। এটা হয় এবং হয়ে থাকে আজন্ম সংস্কার বা শিকড়হীন এক বিশ্বাস থেকে। যেন, রাস্তাঘাটে অদৃশ্য মা দুর্গা তাকে রক্ষা করবেন। যে যাচ্ছে, তার যাত্রার শুভ কামনা করাই উদ্দেশ্য। সেখানে বাস্তবতা মেনে, যাত্রা শুভ

হোক বললেই তো হতে পারে। সবচেয়ে বলা ভালো, চোখ কান খোলা রেখে যেও। সত্যিই যা দিনকাল পড়েছে!

বাড়ির লোকজনের মধ্যে কোন একটা বিষয়ে হয়ত আলোচনা চলছে। এমন সময়ে বেয়াদপ টিকটিকি ডেকে উঠল, আর কেউ একজন হাতের আঙুলে তিন তুড়ি মেরে বলল, 'ঠিক, ঠিক, ঠিক'। চোখে ভেসে ওঠে হীরক রাজার দরবার, রাজা তিনজন পারিষদকে পরপর প্রশ্ন করেন 'ঠিক কিনা?' উত্তর আসে, 'ঠিক,' 'ঠিক,' 'ঠিক'।



ছেলেমেয়েরা মা বাবাকে প্রণাম করে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে, মা হয়ত বলে উঠলেন, মা সরস্বতীকে স্মরণ করো, তিনি

সব ঠিক করে দেবেন। সত্যিই কি তাই? পড়াশুনা না করে থাকলে, কোন দেব বা দেবীই কলমের নিবের ডগায় বসে গড়গড়িয়ে প্রশ্নের উত্তর লিখিয়ে দেবে না। সরস্বতীর যুক্তিতে, রেজাল্ট খারাপ করা কোন ছাত্রছাত্রীকেই দোষারোপ করা মোটেই ঠিক না।

বন্ধুরা মিলে হুইস্কির আসর বসিয়েছে। জল, সোডা, চিপস্, বাদাম, পেঁয়াজ, আদাকুচি, কোন ত্রুটি নেই আয়োজনে। এক বন্ধু তুখোড় ব্যাবস্থাপনায়। ছিপি খুলে প্রথমেই মাটিতে তিন ফোঁটা ফেলে ভূমি পূজণ সেরে পেগ সাজিয়ে ফেলল। এই ভূমি পূজনটা কেমন বেমানান (সুপারস্টিশন) হয়ে গেল না? নাকি মদ খাওয়ার আনন্দে 'এই একটুখানি' বলে নিজের বিবেককে ফাঁকি দেওয়া যায়?

নার্সিং হোমে রুগী ভর্তি আছে। কয়েক মাসের চেষ্টায় অনেক পরিশ্রমে বেশকিছু অর্থের বিনিময়ে ভর্তির পর আজ অপারেশনের ডেট পাওয়া গেছে। অপারেশন থিয়েটারে ঢুকবার সময়ে ডাক্তার বলে গেলেন, এখন যা করবার উপর-ওয়ালাই করবেন, তাঁর উপর ভরসা রাখুন। বিজ্ঞান শিক্ষিত ডাক্তার, বিজ্ঞানের অবদান চিকিৎসা বিদ্যাকে হেয় করে উপর-ওয়ালার দোহাই দিলেন। বাড়ির মেয়েরা নার্সিং হোমের নিচতলায় কোন এক দেব বা দেবীর ছোট করে বানিয়ে রাখা মন্দিরে প্রার্থনায় বসে গেলেন। চতুর চূড়ামনি নার্সিং হোম কর্তৃপক্ষ এটাকে কি কায়দা করে বানিয়ে রাখে নি, যাতে করে, রুগীর মৃত্যুতে গাফিলতির অভিযোগ তুলে

রুগীর আত্মীয়স্বজন নার্সিং হোম, ডাক্তার নার্সের উপর চড়াও না হতে পারে?

এরকমই, প্রায় সব নার্সিং হোমে, প্রাইভেট হাসপাতালে, পুলিশ ব্যারাকে, থানা চত্বরে, বড় বড় আবাসনে, বাজারে বড় ছোট মন্দির, মসজিদ, গুরুদ্বারা, যারা যেখানে যেমন জমাতে পেরেছে, বানিয়ে রেখেছে। খুব ভালো ভাবে ভেবে দেখলে বোঝা যাবে, এতে করে কেমন ভাবে শাসক এবং শোষক শ্রেনীর স্বার্থই পুষ্টিলাভ করে। তামাম দেশবাসীকে বাসস্থান, অন্ন, বস্ত্রে স্বনির্ভর করা অসাধ্য নয়। অসাধ্য নয় ভালো শিক্ষা, স্বাস্থ্যের ব্যাবস্থা করা। কিন্তু, তাতে করে ভোট পাওয়ার আশা নাও থাকতে পারে। এবং নিজেরা একচ্ছত্রভাবে সুখের সিংহাসনে বসে ছড়ি ঘোরাতেও পারবে না। তাই, শাসকশ্রেনীর লক্ষ্য থাকে আপামর জনসাধারণকে ভাগ্যবাদী করে তোলা।

ব্যাস্ত জাতীয় সড়কের পাশেই আছে বিপত্তারিনী মন্দির। যাওয়া আসার সময়ে সব বাসের গতি ধীর হয়ে যায়, যাতে গদ্গদ ভক্তবৃন্দ একটাকা দু টাকা দেবীকে উদ্দেশ্য করে মন্দিরের দিকে ছুঁড়ে দিতে পারে। কন্ডাক্টার নিজেও ছুঁড়ে দেয় কয়েন। ওখানে অনেক দু চাকা চারচাকা, নতুন গাড়ি কিনলেই মালিকরা আসেন পূজো দিতে। দেবী নাকি দু চাকা, চারচাকা গাড়ি ও গাড়ির চালক বা আরোহীকে রক্ষা

করেন। অথচ এমনও নজির আছে, পূজো দিয়ে ফেরার সময়েই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে নতুন গাড়ি ভেঙেছে, আরোহীদের মৃত্যু হয়েছে।

বাজারের মোড়েই ডানদিকে টিনের চেয়ারে লালশালু ঢেকে বসিয়ে রাখা আছে শনির ফটো, পাশে কাঁসার থালায় কটা জবাফুল, জ্বলন্ত ধূপকাঠি, কিছু কয়েন, দশ বিশ টাকার নোট। তাঁর কোপে না পড়তে হয়, বাজার ফিরতি দশটাকার নোট ফেলে দিলাম অকাতরে। দোকান বন্ধের সময়ে এসে নজর করলে দেখতে পেতাম, শনি ঠাকুরের ব্যাপারী ফটো, শালু, থালা, খুচরো সমেত চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা মূলধন, বাজারের থলেতে ভরে, গুনগুন

গাইতে গাইতে লাভের টাকাগুলো পকেটে ভরে নিচ্ছে। তার না আছে শনির কোপের ভয়, না আছে রবি সোমের পরোয়া।

প্রবল মেঘ গর্জন, মূহুর্মূহু বিদ্যূত চমক তৎসহ ঝোড়ো হাওয়ার দাপট। নিতান্তই প্রাকৃতিক ঘটনা। বাড়ির কর্তাগিন্নি একযোগে শুরু করলেন হরি মাধবের স্তব।

বাড়ির গাছে এই বছরের প্রথম ফল, নারকেল কি আম কি কুল বা অন্য যা কিছুই হোক, দেবতাকে নৈবেদ্য না দিয়ে খাওয়া যাবে না, কাউকে দেওয়া যাবে না।

কোন গাছ কাটার দরকার পড়েছে। বৃক্ষদেবতার কাছে করজোড়ে মাপ চেয়ে নিয়ে কেটে ফেললেই হল। যুক্তি

তক্কে যাই না যে, আগে একটা বিকল্প বৃক্ষরোপন করি, তারপরেই না হয় গাছ কাটবো।

এক পানগুমটি দোকানদারের অকুণ্ঠ স্বীকারোক্তি, সারাদিন তো লোকজনকে পান, দোক্তা, জর্দা, বিড়ি-সিগারেট খাওয়াচ্ছি, কোনটাও ভালো জিনিস নয়, তাই সকাল সন্ধ্যা ধূপ জ্বালিয়ে ঠাকুরের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিই, যাতে পাপ না দেন (ঠাকুর ঠাকুরানীরা ঘুষখোর কিনা পাঠকই বলবেন)।

রেলের কোন শিলান্যাস কি, জলজাহাজ উড়োজাহাজের কোন কিছুর উদ্বোধন হোক, ধূপ জ্বালিয়ে, কাঁসর বাজিয়ে, নারকেল ফাটিয়ে মঙ্গল কামনা করছেন বিজ্ঞান শিক্ষিত চিফ ইঞ্জিনিয়ারের দল।

তারকেশ্বরই হোক কি বৈদ্যনাথধামই হোক, ভোলে বাবা কি জয় চিৎকারকারীর সংখ্যা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। তরুন প্রজন্ম একে অ্যাডভেঞ্চারের চোখেই দেখছে নাকি ভক্তির চোখে দেখছে, বলা অসম্ভব। অন্যদিকে রেল এবং রাজ্য সরকার গ্রাফ এঁকে চলেছেন, এই বছরে কত তীর্থযাত্রীর সংখ্যাবৃদ্ধি হল। গঙ্গাসাগর নিয়েও একই কথা বলতে হয়। এরকম বহু উদাহরণ চেষ্টা করলেই খুঁজে পেতে অসুবিধা হবে না।

সেই বোকা গৃহস্থ আর চালাক চোরের কথা মনে পড়ে নাকি? যে গৃহস্থ, বাড়িতে চোরের ঢোকা থেকে, তার নিজের বালিশের তলা থেকে চাবি নেওয়া থেকে, আলমারি

খোলা পর্যন্তও, শুধু দেখে গেল এবং তখনও ভেবেই যাচ্ছে যে 'দেখি না, এরপর কি করে?' ফল যা হবার তাই হল, চোর বাবাজী ধীরে সুস্থে গৃহস্থের লুঙ্গি খুলে পোঁটলা বেঁধে, দরজা হাট করে খোলা রেখে, বামাল বেরিয়ে গেল।

চোর নিরাপদ দূরত্বে গেলে (আসলে গৃহস্থ নিজেকে নিরাপদ মনে করলে তবেই), তারস্বরে আর্তনাদ শুরু করল চোর, চোর বলে।

সূচিপত্র

অচ্ছুতের সমস্যা

লি খে ছে ন – ভ গ ৎ সিং

(অনুবাদে তাঞ্জন)



কাকিনাড়াতে ১৯২৩ সালে এ কংগ্রেস অধিবেশন হয় তাতে মহম্মদ আলি জিন্না নিজের ভাষনে ভারতের দলিত সমাজকে হিন্দু আর মুসলিম মিশনারি সংস্থার মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার প্রস্তাব আনেন। এইভাবে দলিতদের বন্ধু সেজে সাহায্য করার নামে তাদের মধ্যে জাতিগত ভেদভাবনা জানানোর যে অপচেষ্টা শুরু হয় তার বিরুদ্ধে দেশব্যাপি শোরগোল পড়ে যায়। সেই সামাজিক অবস্থায় দাঁড়িয়ে ভগৎ সিং ১৯২৮ সালে কীর্তি পত্রিকায় অচ্ছুতের

সমস্যা নামে একটা প্রবন্ধ লেখেন। বর্তমান সময়ে ভগৎ সিংকে নিজেদের দলে টানতে ডান থেকে বাম সমস্ত দলই ব্যতিব্যস্ত। এরফলে তাঁর নাম নিয়ে বিভিন্ন প্রোপাগাণ্ডা মূলক লেখা সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। এরই বিরুদ্ধে পড়তে গিয়ে উপরের লেখাটি চোখে পড়ে। এর হিন্দি আর ইংরেজি অনুবাদ চোখে পড়লেও বাংলা কোন অনুবাদ চোখে পড়েনি। কিন্তু ভারতের দলিত সমাজের মূল সমস্যা আর মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে তাদের মুক্তির উপায় নিয়ে এই লেখা বাংলায় অনূদিত না হলে বাংলারই ক্ষতি বলে এই অধমের মত। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে যখন ইউনিয়ন সরকার সরাসরি ব্রাহ্মণ্যবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম কারণে দলিত নিগ্রহের সংবাদ আমাদের কাছে আসছে, তখন ভগৎ সিং এর এই প্রবন্ধ শত বর্ষের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আজও কতটা প্রাসঙ্গিক তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা বৃথা। তাই নিজ ক্ষুদ্র সামর্থ্য নিয়ে নেমেছি এর বঙ্গানুবাদের অসাধ্য সাধনে। ভুলত্রুটি সত্ত্বেও ভগৎ সিং এর চেতনা আপামর বাঙালির মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াই লক্ষ্য। লেখাটি অনুবাদ করা হয়েছে marxist.org তে প্রকাশিত হিন্দি প্রবন্ধ থেকে।

“আমাদের দেশের মতন দুরবস্থা অন্য কোন দেশের হয়নি। এখানে অদ্ভুত সব প্রশ্ন ওঠে মাঝেমধ্যেই। এরই

মধ্যে অন্যতম প্রশ্ন অচ্ছুৎ সমস্যা নিয়ে। সমস্যা হল, ত্রিশ কোটি জনসংখ্যার দেশে যে ছ কোটি লোক অচ্ছুৎ, তাদের স্পর্শেই নাকি বাকিরা ধর্মচ্যুত হয়ে যাবে। তারা যদি কুঁয়ো থেকে জল নিতে যায়, কুঁয়ো অপবিত্র হয়ে যায়। এই কথা বিংশ শতাব্দীতে হচ্ছে এটা ভাবতেই লজ্জা লাগে।

আমাদের দেশ আধ্যাত্মিকতার দেশ। কিন্তু আমরা মানুষকে মানুষ হিসাবে মর্যাদা দিতেও ইতস্তত করি, যেখানে পুরোপুরি বস্তুবাদী হিসাবে পরিচিত ইউরোপ কয়েক শতক ধরেই ইনক্লাবের জিগির তুলছে। তারা আমেরিকা আর ফ্রান্সের বিপ্লবের সময়ই সমতার ঘোষনা করেছেন। আজ রুশ দেশও এইরকম বিচ্ছিন্নতা ভুলে বিপ্লবের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমরা সবসময়েই আত্মা পরমাত্মার অস্তিত্ব নিয়ে চিন্তিত থাকি এবং অচ্ছুৎদের পৈতেধারণের অধিকার আছে কিনা, তারা বেদ শাস্ত্র পাঠে অধিকারী কিনা সেই নিয়ে বিতর্কে মেতে থাকি। আমরা অভিযোগ করি যে আমাদের সাথে বিদেশীরা ভাল ব্যবহার করে না। ইংরেজ প্রশাসন আমাদের শ্বেতাঙ্গদের সমকক্ষ মনে করে না। কিন্তু এই অভিযোগ করার যোগ্যতা কি আদৌ আমাদের আছে?

শ্রী মহম্মদ নুর নামক সিন্ধের একজন মুসলমান ভদ্রলোক, যিনি বোম্বাই১ কাউন্সিলের সদস্য, এই বিষয়ে ১৯২৬ সালে বলেছেন,

"যদি হিন্দু সমাজ নিজ জনগোষ্ঠীর মানুষদের সর্বসাধারণের স্কুলে ভর্তির এবং আঞ্চলিক বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, যিনি কয়েক লক্ষ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেন যখন নিজ ভাই বেরাদরদের জল খাওয়ার মতন প্রাথমিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করেন, তাদের প্রশাসনের কাছে আরো অধিকার চাওয়ার কী অধিকার আছে? অন্য ভূখণ্ড থেকে আসা মানুষদের অভিযুক্ত করার আগে আমাদের দেখা উচিত আমরা নিজেদের লোকের সাথে কিভাবে ব্যবহার করি। আমরা কিভাবে উচ্চতর রাজনৈতিক অধিকারের দাবী জানাব যদি আমরাই নিজেদের ন্যূনতম অধিকার দিতে অস্বীকার করি? " হক কথা। কিন্তু যেহেতু একজন মুসলমান ব্যক্তি বলেছেন, হিন্দুরা বলবে যে দেখ, উনি ওই অচ্ছুতদের মুসলমান বানিয়ে নিজেদের দলভারী করতে চান।

যখন তুমি ওদের জানোয়ারেরও অধম বলে মনে করবে তো ওরা অবশ্যই অন্য ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হতে চাইবে, যেখানে ওদের বেশি অধিকার মিলবে, যেখানে ওদের সাথে মনুষ্যোচিত ব্যবহার করা হবে। তখন যদি বল যে এই দেখ খ্রীষ্টান আর মুসলিমরা হিন্দু ধর্মের ক্ষতি করছে, ভুল হবে।

কথাগুলো সত্যি, কিন্তু এই শুনেই সবাই চিড়বিড় করে ওঠে। ঠিক এই ধরনের চিন্তা হিন্দুদেরও হয়েছিল। সনাতনী পণ্ডিতরাও এই সমস্যা নিয়ে ভাবতে শুরু করেছেন। মাঝেমাঝে "যুগান্তকারী " মানুষজনও এই সমস্যা নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে, যিনি অচ্ছ্যুতদের এক বড় সমর্থক, পাটনা শহরে হিন্দু মহাসভার সম্মেলনে এই নিয়ে জোর বিতর্ক হয়েছিল। অনেক তর্ক বিতর্ক হয়। প্রশ্ন এই ছিল যে অচ্ছুতদের যজ্ঞোপবিত ধারণের অধিকার আছে কী না? এছাড়াও তাদের কি বেদশাস্ত্র অধ্যয়নের অধিকার আছে? বড় বড় সমাজ সংস্কারক চুপ করে গেলেও, লালা লাজপত রায় সর্বসম্মতিক্রমে দুটো বিষয়েরই স্বীকৃতি আদায় করিয়ে হিন্দুধর্মের মর্যাদা রাখলেন। নইলে একটু ভেবে দেখুন কতটা লজ্জাজনক ঘটনা হত? একটা কুকুরও আমাদের কোলে বসতে পারে। আমাদের রান্নাঘরে নির্দ্বিধায় ঘুরতে পারে, কিন্তু একজন মানুষের স্পর্শে আমাদের জাত যায়। আজকের দিনেও মালব্য জির মতন বড় সমাজ সংস্কারক, বিশাল অচ্ছুতপ্রেমী, না জানি আরো কত কী, একজন মেথরের হাতে মালা পরে নেন, কিন্তু কাপড় শুদ্ধ স্নান না করলে নিজেকে অশুদ্ধ মনে করেন। কী সুন্দর জিনিস। ভক্তপ্রিয় ভগবানের পূজা করার জন্য মন্দির বানানো হয়, কিন্তু তাতে অচ্ছুৎ প্রবেশ করলে মন্দির অশুদ্ধ হয়ে যায়! ভগবান নাকি রুষ্ট হন! যখন আমাদের ঘরেরই এই অবস্থা, তখন বাইরে সমানাধিকারের জন্য লড়াই কি আমাদের

মানায়? তখন আমাদের এই ব্যবহারে কৃতঘ্নতাই প্রকাশ পায়। যারা নিচুস্তরের কাজ করে আমাদের স্বচ্ছন্দে বাস করতে সাহায্য করে তাদেরই আমরা দূরদূর করে তাড়াচ্ছি। আমরা পশুর পূজা করতে পারি, কিন্তু মানুষের পাশে বসতে পারিনা।

আজকাল এই নিয়ে প্রচুর শোরগোল হচ্ছে। এই বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। দেশের মুক্তি কামনার চিন্তা যে হারে বেড়েছে, তাতে সাম্প্রদায়িক মানসিকতা অন্য কোন সুবিধা না দিলেও একটা সুবিধা এনেছে। প্রত্যেকেই বেশী অধিকারের দাবীর উদ্দেশ্যে নিজ জাতের সংখ্যা বাড়াতে উৎসুক। মুসলিমরা একটু বেশিই এই বিষয়ে জোর দিচ্ছে। ওঁরা অচ্ছুতদের মুসলমান বানিয়ে নিজেদের সমানাধিকার দেওয়া শুরু করে দিয়েছে। এতে হিন্দুদের অহং বোধ আহত হয়েছে। ঝামেলাও হয়েছে। শিখেরাও ভাবল যে আমরাও কেন পিছিয়ে থাকব? ওঁরাও অমৃত ছেটাতে শুরু করেছে। হিন্দু আর শিখদের মধ্যে যজ্ঞোপবিত ধারন বা চুল কাটা নিয়ে ঝগড়া হয়ে গেছে। এখন তিনটে দলই অচ্ছুতদের নিজের দিকে টানতে শুরু করেছে। এদিকে খ্রীষ্টানরা চুপচাপ নিজেদের দলভারী করে যাচ্ছে। অন্ততএইসব দোলাচলের মধ্যেই দেশের দূর্ভাগ্য কাটছে।

এদিকে অচ্ছুতরা যখন দেখছে যে ওদের নিয়েই অন্যদের মধ্যে ঝামেলা হচ্ছে আর ওদের নিয়ে সবাই টানাটানি করছে তখন ভাবল যে ওরাই আলাদা ভাবে সংগঠিত হবে। এতে ইংরেজ সরকারের কতটা হাত আছে জানা নেই, কিন্তু এই ধরনের প্রচারে সরকারী মেশিনারির প্রচুর প্রভাব আছে। "আদি ধর্ম মণ্ডল " এর মতন সংগঠনগুলি এই প্রচারেরই ফল।

এখন আরেক প্রশ্ন উঠছে যে এই সমস্যার আদত সমাধান কোনটা? এর জবাব খুবই নির্দিষ্ট। প্রথমেই এটা বুঝতে হবে যে সব মানুষই সমান, জন্মসূত্রে বা কর্মসূত্রে কেউ ভিন্ন হয়ে যায়না। অর্থাৎ যেহেতু কেউ গরীব মেথরের ঘরে জন্ম নিয়েছেন, তারমানে সারা জীবন ময়লাই পরিষ্কার করে যাবেন, কোন রকম উচ্চতর কাজ করার অধিকার নেই, এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারবা। এইভাবেই আমাদের পূর্বপুরুষ আর্যরা এদের সাথে অন্যায় করেছিলেন এবং এদের নিচু বলে দূরে সরিয়ে নিম্নমানের কাজ করাতেন।" এখন কী করবে? চুপচাপ দিন কাটাও!" এভাবেই ওদের ধৈর্য ধরার উপদেশ দিয়ে ওঁরা অচ্ছুতদের দীর্ঘসময় ধরে শান্ত করে রাখেন। কিন্তু এটা অত্যন্ত পাপ কাজ ছিল। মানুষের ভিতর থেকে মনুষ্যত্বই শেষ করে দিয়েছিল। আত্মবিশ্বাস এবং আত্মনির্ভরিতার চিন্তাকেই বিনষ্ট করে

দিয়েছে। অনেক শোসন এবং অন্যায় হয়েছে এদের সাথে। এখন সবার প্রায়শ্চিত্ত করার সময়।

এর সাথে আরেক সমস্যাও আছে। লোকেদের মনে আবশ্যক কাজের প্রতি ঘৃণা জন্মেছে। আমরা তাঁতিদেরও নিচু চোখে দেখেছি। আজ কাপড় বানায় যে তাকেও অচ্ছুৎ বলা হচ্ছে। ইউপিতে কাহারদেরও২ অচ্ছুৎ বলে মানা হয়। এতে খুবই সমস্যা হচ্ছে। এতে বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে।

এই বিভাজনকে সামনে রেখে আমাদের আশু কর্তব্য এই যে আমরা নাতো এদের অচ্ছুৎ ভাবব, না বলব। সমস্যার সমাধান এই পথেই আসবে। নতুন ভারত সভা তথা নতুন কংগ্রেস যে পথ নিয়েছে তা যথেষ্ট ভাল। যাদের আজ পর্যন্ত অচ্ছুৎ বলে ডাকা হচ্ছে, তাদের কাছে এতদিনের পাপকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়ে, তাদের সমমানের মানুষ ভেবে, অমৃত ছেটানো, কলমা পড়া বা শুদ্ধিকরণ ব্যাতিত তাদের নিজেদের দলে সামিল করে তাদের হাতে জল খাওয়া এটাই উচিত পথ। নিজেদের মধ্যেই ভেদাভেদ করে কোন অধিকার না দেওয়া কখনই উচিত কাজ নয়।

যখন গ্রামের দিকে মজুরদের মধ্যে প্রথম প্রথম প্রচার শুরু হয়, তখন সরকারি কর্মচারীদের কৃষকদের এই বলে উত্তেজিত করত যে দেখ এরা ভঙ্গীত-চামারদের মাথায় চড়াচ্ছে যাতে এরা তোমাদের কাজ করা বন্ধ করে দেয়। এতে কৃষকরা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। এদের বোঝা উচিত যে এদের অবস্থা ততদিন পর্যন্ত শুধরোবেনা যতদিন এরা এইসব গরীবদের নিচুজাত বলে নিজের পায়ের তলায় রাখতে চাইবে। সাধারণত বলা হয় যে এরা নোংরা। এর কারণ স্পষ্ট, এরা গরীব। গরিব রোগ সারাও। উঁচু জাতের গরীব লোকেরা কিছু কম নোংরা হয়না। নোংরা কাজ না করার অজুহাতও চলবেনা, কারণ মা সন্তানের ময়লা পরিষ্কার করলে মেথর তথা অচ্ছুৎ হয়ে যায়না।

কিন্তু এই কাজ ততদিন পর্যন্ত সম্ভবপর হবেনা যতদিন না অচ্ছুতেরা নিজেরাই নিজেদের সংগঠিত করবেনা। আমি তো মনে করি তাদের নিজেদের সংগঠিত করে এবং গুনতিতে মুসলিমদের সমকক্ষ হওয়ার দরুন সমানাধিকারের দাবী যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক দিকনির্দেশ করছে। হয় জাতভেদের ঝামেলাই দূর করো,নইলে ওদের অধিকার ওদের দিয়ে দাও। অচ্ছুতদের স্কুল,কলেজ, কুঁয়া, এবং রাস্তা ব্যবহারের পূরো স্বাধীনতা দেওয়াই কাউন্সিল আর অ্যাসেম্বলির সদস্যদের মূল কর্তব্য। শুধুই মুখের কথা নয়, এদের গাড়ি করে নিয়ে গিয়ে কুয়োতে চড়াক।

ওদের সন্তানদের স্কুলে ভর্তি করাক। কিন্তু যে বিধানসভায় জাতের অজুহাতে বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত বিল নিয়ে হা-হুতাশ শুরু হয়, সেখানে তারা অচ্ছুতদের নিজেদের সামিল করার স্পর্ধা করবে কী করে?

এইজন্য আমি মনে করি ওদের নিজস্ব জাতের প্রতিনিধি হোক। যে নিজেদের জন্য বেশি অধিকার চাইবে। আমি তো স্পষ্ট ভাষায় বলি, অচ্ছুৎ নামে অভিহিত আসল জনসেবক ভাইয়েরা, ওঠো! নিজেদের ইতিহাস দেখ। গুরু গোবিন্দ সিংহের ফৌজের আসল শক্তি ছিলে তোমরাই! তোমাদের ভরসাতে শিবাজী এমন কীর্তি স্থাপন করতে পেরেছেন যে আজও ওঁর নাম উজ্জ্বল। তোমাদের বলিদান স্বর্নাক্ষরে লেখা। তোমাদের প্রতিনিয়ত সেবার ফলে আমজনতাকে সুখে শান্তিতে বেঁচে থাকতে দিয়ে যে পরম উপকার করছ, তা আমরা বুঝতে পারছিনা। ল্যান্ড - অ্যালিয়েনেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী তোমরা টাকা জোগাড় করেও জমি কিনতে পারবে না। তোমাদের উপর অত্যাচার এত বেশী হচ্ছে যে স্বয়ং মিস মেয়োও৪ তোমাদের জন্য বলে উঠেছেন, -" ওঠো, নিজেদের শক্তিকে জান। সংঘবদ্ধ হও!" আসলে স্বয়ং চেষ্টা না করলে কিছুই উপলব্ধ হয়না। (Those who would be free must themselves strike the blow)৫ স্বাধীনতার জন্য মুক্তিকামীদেরই চেষ্টা করতে হবে। মানুষের এমনই স্বভাব হয়ে গেছে যে ওরা নিজেদের জন্য

বেশী করে অধিকার চায়, কিন্তু অধস্তনদের জুতোর নিচেই রাখতে পছন্দ করে। কথাতে আছে, "যেমন কুকুর তেমনই মুগুর"। অর্থাৎ সংঘবদ্ধভাবে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে সমাজের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দাও। তখন দেখবে, কেউই তোমাকে তোমার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার সাহস দেখাবে না। অন্যের খোরাক হওনা। অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া বন্ধ করো। কিন্তু আমলাতন্ত্রের ফাঁদে পড়োনা। এরা তোমার কোন সাহায্য করিতে চায়না, উলটে তোমাকেই দাবার বোড়ে হিসাবে ব্যবহার করতে চায়। এই পুঁজিবাদী আমলাতন্ত্রই তোমাদের গরিব থাকার আসল কারণ। তাই ওদের সাথে কখনই মিশোনা। ওদের ফন্দি থেকে বেঁচে চলো। তাহলেই সব ঠিক হবে। তোমরাই আসল সর্বহারা, এককাট্টা হও। তোমাদের কিছু ক্ষতি হবে না। শুধু পরাধীনতার শিকল কেটে যাবে। ওঠো আর বর্তমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও। আস্তে আস্তে হওয়া সংস্কারে কিছুই হওয়ার নয়। সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে বিপ্লবের সূচনা করো, এবং এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত থাক। তোমরাই তো দেশের মূল আধার। আসল শক্তি। ঘুমন্ত দৈত্য। ওঠো আর বিপ্লব শুরু করো।

১ ১৯২৮ সালে বোম্বাই বানানই ব্যবহার হত। তাই বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

২ একপ্রকার নিচুজাত। মূলত জেলের কাজ করত।

৩ এরা নিচুজাত হিসাবেই গন্য হয় মূলত। ঝাড়ুদারের কাজ করে মূলত।

৪ আমেরিকান ঐতিহাসিক। পুরো নাম ক্যাথেরিন মেয়ো। এঁর লেখা বই মাদার ইন্ডিয়া ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন খারাপ দিক দিয়ে আলোচনা করেন। প্রচন্ড বিতর্কিত বই।

৫ দাস বিদ্রোহের বিপ্লবী ফ্রেড্রিক ডগলাসের কোট। পুরো লাইনটা হল Those who would be free must themselves strike the blow. Better even to die free than to live slaves."

সূচিপত্র

অনুগল্প:

টিকটিকি

লি খে ছে ন – সু ম ন ক র্ম কা র



রামিজ মিঞা গ্রিল আর তারজালির ফাঁক দিয়ে মন দিয়ে টিকটিকিটা দেখছিল। কালো, গায়ে চৌকোনা ছোপ, সামনের দিকের বাঁ পা টা পেছন দিকে কেতরে ডান পা টায় ভর দিয়ে খানিক উঁচু হয়ে সামনের দোতলার ড্রেনপাইপটায় লেপ্টে ছিল। ভঙ্গীটা এমন যেন এগোবে কিন্তু এগোচ্ছিল না। রামিজ রোজ দেখে টিকটিকিটাকে। দেখতে দেখতে একটা অভ্যেসমতো হয়ে গিয়েছে। আজ অবধি ওটাকে একচুল নড়তে দেখেনি ও। তাই সারাদিন খেয়াল না থাকলেও দুপুর বেলার এই সময়টায় বিছানায় গড়াগড়ি দিতে দিতে পাইপটার দিকে চোখ চলেই যায়। এই সময়টায় শাকিনা রোজ ফোন দেয়। বাবুদের খাওয়া

দাওয়া হয়ে গেলে বাসন ধোওয়ার পর শাকিনা খানিক বিশ্রামের সুযোগ পায়। তখনই রামিজের ফোন বেজে ওঠে। রামিজ বিরক্ত হয়। ও এটা ওটা বলে তাড়াতাড়ি ফোন কেটে আবার মন দিয়ে টিকটিকি দেখতে থাকে। আজকাল রামিজের দিনগুলো বড় মন্থর গতিতে পেরোয়। গেলোবছর বর্ষায় কারখানার মেশিন চাপা পড়ে বাঁ হাতখানা বাদ পড়ার পর মালিক কিছু টাকা দিয়ে বিদায় দিয়ে দিয়েছে। শাকিনাকে লোকের বাড়িতে কাজ করতে না পাঠিয়ে উপায় ছিল না। প্রথম প্রথম একা একা থাকতে ভীষণ খারাপ লাগতো। এখন অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। তাই শাকিনার ফোন রামিজের রোজকার একাকীত্বে খানিক ছন্দপতনই ঘটায়। আর ছন্দপতন আসে যেকোনো সরকারি ছুটিতে দোতলা বাড়িটা থেকে ভেসে আসা মাতালটার অশ্রাব্য চিৎকারে। গোটা বস্তিতে এই একটাই দোতলা বাড়ি। রামিজ যখন কাজে যেত শাকিনা রোজ বলত মাতালটার কথা। ছুটির দিন হলেই মাতালটা সকাল থেকে গলা অবধি মদ গিলে এসে বৌটাকে সারাদিন ধরে পেটায় আর যাচ্ছেতাই গালি গালাজ করে। তখন রামিজ তেমন পাত্তা দেয়নি। আজ বুঝতে পারে এই নিঃঝুম দুপুরবেলায় ওই মাতালটার চিৎকার কতখানি অসহ্য লাগে। এখন আবার চিৎকারের যোগ্য সঙ্গত করছে মাতালের বৌয়ের অস্পষ্ট গোঙানি। নাঃ অসহ্য লাগছে। রামিজ উঠে পড়লো। বাড়ি থেকে বেরোনোর পথে শাকিনার সেলাইয়ের কাঁচিটা তুলে নিলো। দরজার শিকল

দিতে গিয়ে ড্রেন পাইপটার দিকে চোখ পড়লো ওর। সেই কুৎসিত টিকটিকিটা বেশ খানিকটা নেমে এসেছে। আর ওর মুখে একটা গোটা আরশোলা, মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে। চেষ্টা করছে বেরিয়ে যাওয়ার, উদ্ধার পাওয়ার। টিকটিকিটা একটুও নড়ছেনা। পরম নিশ্চিন্ত মুখ করে লেপ্টে আছে নোংরা শ্যাওলাধরা ড্রেন পাইপটায়। কালো পুঁতির মতো চোখগুলো নিশ্চল। রামিজ বাঁ হাতের আঙুলগুলো দিয়ে কাঁচিখানা শক্ত করে বাগিয়ে ধরলো......

সূচিপত্র

গল্প:

নরকে পাওয়া প্রাণ

লিখেছেন – প্রদীপ কুমার বর্মণ



নিত্যানন্দ দাস বাবাজি বিষ খেয়েছেন, এই সংবাদ মুহূর্তেই দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল সারা গ্রামে। সেদিন গ্রামের বারোয়ারী রাধাগোবিন্দ মন্দিরে বাৎসরিক কীর্তনের আসর চলছিল। এই সময় প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ এই গ্রামে আসে হরিনাম উৎসবকে কেন্দ্র করে। প্রতি

বাড়িতে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদের ভীড় বাড়ে। গোঁসাই বাবাজির বাড়িতেও প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়েছে। আগের দিন গেছে ভীম একাদশী। ধর্মপ্রাণ মানুষ ও ভক্তিমতি মহিলারা সকাল থেকে নিত্যানন্দ দাসের মন্দিরে চাল আলু ফল টাকা পয়সা দিয়ে যাচ্ছিল একাদশীর পুণ্য পাওয়ার আশায়। দান সামলাতে মন্দিরে দুজন ভক্ত হিমসিম খাচ্ছে। বেশিরভাগ ভক্ত বাবাজির হাতে দান দিয়ে তাঁকে প্রণাম করতে চায়। কারণ তারা বাবাজির মুখে শুনেছে, শুদ্ধ ও ঈশ্বরপ্রাপ্ত মহাজনের হাতে একাদশীর দান না দিলে উপবাসের ফল মেলে না।

মাঘের মাঝামাঝি সময় শীতটা প্রায় ছেড়ে গিয়ে আবার এই কদিন বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। নাটমন্দিরের বারান্দায় সকালের রোদ এসে চিকচিক করছে, রোদটা বেশ আরামদায়ক। পুণ্যকামি মায়েরা ভোর ভোর সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম সেরে স্নান করে মন্দিরে এসেছে।তারা ভিজে চুল পিঠে ছাড়িয়ে দিয়ে সকালের রোদ উপভোগ করে। মন্দিরে তখন সদ্য ঠাকুরের বাল্যভোগ দেওয়ার পালা শেষ হয়েছে। উত্তরে হাওয়ায় মন্দিরের ভিতর থেকে ভেসে আসছে অগুরু চুয়া চন্দনের মিষ্টি সুগন্ধ। পাকশালায় চলছে ঠাকুরের মধ্যাহ্ন ভোগের আয়োজন,তরিতরকারির ভিন্ন স্বাদের কিছু গন্ধ ধূপ ধূনার গন্ধের সঙ্গে একাকার হয়ে অসাধারণ এক অনুভূতি তৈরি করছে।

বেলা বাড়ার সাথে সাথেই মন্দির প্রাঙ্গণে সাধু বৈষ্ণবের ভীড় বাড়তে থাকে। সহকারী ভক্তেরা মন্দিরে মধ্যাহ্ন ভোগ উঠিয়ে দেয়। বাবাজি নিত্যানন্দ দাস ভগবানের ভোগ লাগিয়ে শুরু করেন ভোগ আরতি কীর্তন,

ভজ ভকত বৎসল শ্রীগৌর হরি।

শ্রীগৌর হরি জয় গোষ্ঠ বিহারী।।

বেলা হল দামোদর আইস এখন।

ভোগ মন্দিরে বসি করহ ভোজন।।.......

মন্দিরের ভিতরে বিগ্রহের সামনে সাজানো হয়েছে সুগন্ধি চালের অন্ন, ষোড়শ ব্যাঞ্জন, দধি দুগ্ধ ঘৃত শর পুলি মোণ্ডা মিঠাই ক্ষীর নবনী। এইসব খাবার দেবতার খাওয়ার জন্য ভক্তরা কাঁসা করতাল মৃদঙ্গ বাজিয়ে কাতর আহ্বান করছে।

গ্রামের কিছু বয়স্ক পুরুষ মহিলা যারা বৈষ্ণব নয়, ভিক্ষা করে খায়। তারা এসেছে সুখাদ্য খাবারের আশায়। দেরিতে আসায় বাল্যভোগের খিচুড়ি তারা খেতে পায়নি। সাধুরা বলেছে অপেক্ষা করতে, ভগবানের সেবার পরে সাধু বৈষ্ণব প্রাসাদ পাবে। তারপরে তাদের খাবার মিলবে। তাদের ক্ষুধার্ত শরীরে যেন আর তর সইছে না। সাধুদের নাচানাচি ও দীর্ঘ কীর্তনে তারা অনেকটা অধৈর্য হয়ে ওঠে।

গান বাজনা শেষ হয়ে মন্দিরের দরজা খোলা দেখার জন্য তারা ভিতরে বড় ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

কীর্তন শেষে মন্দিরের দরজা খুলতে ভক্তরা হুমড়ি খেয়ে পড়ল ভগবানের ভোগ দর্শন করতে। নিত্যানন্দ দাস ঠাকুরের মুখ প্রক্ষালন করিয়ে শয়নের ব্যবস্থা করে, ভক্তদের সেবার আয়োজনে মনোনিবেশ করলেন। সারা জীবনের নিয়ম অনুযায়ী সকলকে খাইয়ে তিনি নিজে খেয়ে মন্দিরের বারান্দায় বিশ্রাম নিতে গেলেন।বয়সের ভারে জীর্ণ নিত্যানন্দের শারীরিক নানা সমস্যার সঙ্গে কাশিটা কয়েকদিন বেশ চেপে ধরেছে। এখন খাওয়া দাওয়ার পরে কাশি বাড়ায় একজন ভক্তকে বললেন ঠাকুর মন্দিরের সেল্ফ থেকে তাঁর কাশির সিরাপটা এনে দিতে। গুরু আঙ্গায় ভক্ত সিরাপের বোতল এনে বাবাজির হাতে দিতে,কাশি আটকাতে বাবাজি বোতল খুলে তাড়াতাড়ি এক ছিপি সিরাপ নিয়ে নিজের মুখে ঢেলে দিলেন। কণ্ঠে যেতে নিত্যানন্দ বুঝতে পারলেন সিরাপের বদলে তিনি হামলা বিষ খেয়ে ফেলেছেন। কয়েকদিন আগে বাগানে দেওয়ার জন্য পুরানো সিরাপের বোতলে করে বাবাজি নিজে পাড়ার ঘোষেদের দোকান থেকে বিষ এনে রেখেছিলেন।একই সেল্ফে বিষ ও সিরাপের শিশি পাশাপাশি রাখায় এই বিপত্তি।

ভূরিভোজ খাওয়ার পরে বৈষ্ণবী মায়েরা একটু শরীর এলিয়ে দিয়ে ঘর সংসারের সুখ দুঃখের গল্প শুরু করেছিল। হটাৎ নাটমন্দিরের বারান্দায় চীৎকার চেঁচামেচিতে সবাই সেখানে ছুটে এলো।বৃদ্ধ নিত্যানন্দ দাসকে ঘিরে রয়েছে তাঁর শিষ্য ও ভক্তরা। বাবাজি ওকার তুলছেন। তীব্র বিষের ঝাঁঝালো গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে।

খবর শুনে পাড়া প্রতিবেশীরাও ছুটে এসেছে। প্রতিকারের জন্য এক একজন এক এক রকম পরামর্শ দিচ্ছে। একজন তো বাবাজির গাল হাঁ করিয়ে কিছুটা সরষের তেল গালে ঢেলে দিল।আর একজন দুটো মুরগির ডিম এনেছে ভেঙে বাবাজি কে গিলিয়ে দেওয়ার জন্য। ভক্তরা চীৎকার করছে, যা করো তা করো বাপু, বাবার মুখে কিন্তু ডিম ঢালবে না কেউ। পাগলের মত ভীড় ঠেলে এক বৈষ্ণবী মা মন্দির থেকে ভগবানের পা ধোওয়া পাদদক এনে বাবাজির গালে ঢেলে দিলো। কেউ প্রসাদী ফুল এনে মাথায় বুকে ছুঁইয়ে দিলো। সহসা কার নেতৃত্বে বেজে উঠল

খোল করতাল শাঁখ কাঁসার আওয়াজ।কী হচ্ছে ঠিকঠাক কিছু বোঝা যাচ্ছেনা। ভীড়ের মাঝখানে বাবাজি মাটিতে পড়ে গোড় খাচ্ছে, ভক্তরা ধেই ধেই করে নাচছে আর ভগবানের কাছে কাঁদছে তাদের গুরুর প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য।

বাবাজির ছোটো ভাই বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিবাদী মানুষ। ভীড় থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে সাধু সন্তদের কান্ডকারখানা দেখছিল কিছুটা অসহায়ের মত। কারণ সে জানে এখন সাধু বৈষ্ণবদের কাছ থেকে তার দাদাকে ছাড়িয়ে চিকিৎসা করাতে নিয়ে যেতে পারবে না সে। ধর্মবিশ্বাসী মানুষেরা যুক্তি ও বাস্তব সত্য কে মানতে চায় না। কিছুদিন আগের ঘটনা, সেদিন মন্দিরে কি একটা উৎসব উপলক্ষে বহু মানুষের সমাগম হয়েছিল। অন্য সব অনুষ্ঠানের মতো সবজি কাটা ও রান্নার সহযোগিতা করার জন্য বাবাজি দুই বৌমাকে ডেকেছিলেন। ছোটো বৌমা স্নান করে নতুন শাড়ি পরে সবজি কাটতে গিয়েছিল। সহসা এক বৈষ্ণব ছোটো বৌমার দিকে তাকিয়ে তাকে সবজি কাটতে নিষেধ করলেন। ছোটো বৌ কারণ জিজ্ঞাসা করতে সাধুবাবা বললেন, - মা, তোমার গলায় কণ্ঠি নেই,অঙ্গে তিলক নেই। তোমার শরীর তো অশুদ্ধ মা, তোমার ছোঁয়া ঈশ্বর গ্রহণ করবেন না, এমনকি বৈষ্ণব সমাজ ও নয়।

বাধা পেয়ে ছোটো বৌ মনখারাপ করে ঘরে ফিরতে ছোটো বাবু জিজ্ঞাসা করল, - কী ব্যাপার? হাসিমুখে গেলে আর আর আষাঢ়ে মেঘের মতো মুখ কালো করে ফিরে এলে যে? সব শুনে ছোটো বাবু আর স্থির থাকতে পারল না। এমনিতে সে এসব ব্যাপারে নিজেকে জড়াতে চায় না। বাইরে কাজে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল।

কিন্তু স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে কি ভেবে বলল, - চলত দেখি।

ঝামেলা এড়াতে ছোটো বৌ বলল, - না না ছাড়ো ওসব, তুমি কাজে যাচ্ছ তাও, ওখানে যাওয়ার কোনো দরকার নেই।ছোটো বাবু স্ত্রীর কথা না শুনে তাকে নিয়ে রান্নাঘরে হাজির।সাধুবাবা ছোটো বাবুর পূর্বপরিচিত।ছোটো বাবুর জিজ্ঞাসায় হাত জড় করে বলল, - মায়ের এখনও গুরুদীক্ষা হয়নি।তিলক মালা নেই কিনা তাই....

- মানে আপনাদের বিচারে উঁনি অপবিত্র, উঁনার ছোঁয়ায় আপনাদের জাত যাবে এমনকি আপনাদের ভগবানেরও।

সাধু বিনয় করে বলল, - আপনি জ্ঞানী মানুষ, সবই তো বোঝেন। আচার বিচার তো ফেলে দেওয়া যায় না।

ছোটো বাবু বলল, - বেশ বেশ, তাহলে আচার বিচার,সূচি শুদ্ধতা আপনারা সব মেনে চলেন তো?

- বৈষ্ণব মানুষ,এসব না মানলে কী ধর্ম রক্ষা হয়?

- বেশ, তাহলে এই যে গ্যাস সিলিন্ডার থেকে গ্যাস নিয়ে ভগবানের ভোগ রান্না করছেন।এই সিলিন্ডার কালকের কোনো মুসলমানের বাড়িতে ছিল, সেখানে গোস্তো রান্না হয়েছে। অথবা কোনো হোটেল রেস্তোরাঁয় মাছ মাংস রান্না হয়েছে, সেই সিলিন্ডারে ঠাকুরের রান্না করছেন কীভাবে?

ছোটো বাবুর এমন প্রশ্নে সাধুবাবা কিছুটা খেই হারিয়ে ফেললেন, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন,
- এসব কী আর পবিত্র না করে রান্নাঘরে তুলেছি?

- মানে? কীরকম পবিত্র?

- গঙ্গাজলে ধৌত করে তবে বাইরের জিনিস ভিতরে নেওয়া হয়।

- মানে গঙ্গাজলে পবিত্র, তাইত?

- একদম ঠিক, গঙ্গা মা হলেন পতিতপাবনী। জগতের যত অপবিত্র তা পবিত্র করার শক্তি একমাত্র তাঁরই আছে।

- তাহলে সাধুবাবা, যে গঙ্গাজলে লোহার জড় বস্তু পবিত্র হয়ে যেতে পারে, সেই গঙ্গাজলে একটা রক্ত মাংসের সচল মানুষ কেন পবিত্র হতে পারল না?

- মানে? আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

- মানে গঙ্গাজল ছিটিয়ে যদি মাছ মাংস রান্নার সিলিন্ডার পবিত্র করা যায়, তাহলে সেই জল ছিটিয়ে এই অপবিত্র মানুষটির পবিত্র করে নিয়ে কাজ চালাতে পারতেন। তাহলে আপনার আচরণে এই মানুষটি মনে দুঃখ পেত না।

এইসব ভাবনার মাঝে প্রবল কান্নার আওয়াজ কানে এল ছোটো বাবুর। ভাবনার জগত থেকে সম্বিত ফিরে দেখতে পেল তার বড় বৌদি মড়া কান্না শুরু করে দিয়েছে।মানে অবস্থা ক্রমশ বেগতিক হয়ে উঠেছে।একপলক কি যেন

ভাবল ছোটো বাবু। তারপর প্রবল বিক্রমে ভীড় ঠেলে ভিতরে গিয়ে,রুগিকে ঘিরে বেষ্টনী করে গীতা পাঠ করতে থাকা মানুষগুলোকে সরিয়ে, নিত্যানন্দ দাস বাবাজি কে কোলে করে চাগিয়ে বাইরে বের করে আনল।

পাশের গ্রামে একজন গ্রামীন চিকিৎসক আছেন। সবাই বলে বিষ খাওয়া রুগির চিকিৎসায় সে নাকি একেবারে ধ্বনন্তরি। নিত্যানন্দ বাবাজি কে সেখানে নিয়ে যাওয়া হল।ডাক্তারের নির্দেশমতো প্রথমে রুগিকে এক দু-বালতি পটাস জল গেলাতে হবে। এদিকে রুগি প্রায় নিস্তেজ হয়ে এসেছে। সেই অবস্থায় প্লাষ্টিকের মগে করে মুখের কাছে জল নিয়ে যেতে বাবাজি হাত দিয়ে জল সরিয়ে দিতে চাইলেন। বোঝা গেল চিরদিনের বিশ্বাস অনুযায়ী অবৈষ্ণবের বাড়ির অপবিত্র পাত্রের জল তিনি মুখে নিতে পারবেন না।

আসলে ডাক্তার গ্রামীন জীবনযাপন করেন। বাড়িতে হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল আছে। নিত্যানন্দ বাবাজি প্রভাতী নগরকীর্তনে বেরিয়ে অনেক বাড়িতে নাম বিতরণ করলেও এইসব বাড়ির ত্রীসিমানায় আসতেন না।আজ কিনা সেই নরকে তাঁকে আসতে হলো! বাবাজির মতি বুঝে একজন বৈষ্ণবী মা ছুটে গিয়ে কয়েকটা তুলসীপাতা এনে জলে ফেলে বলল, - এবার খাও বাবা, জলে তুলসী দিয়েছি। এইসব কাণ্ড দেখে ডাক্তার কার্যত বিরক্ত হয়ে

বলল, - এসব এখানে চলবে না, এখানে বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা করা হবে।এটা বুজরুকির জায়গা নয়।

ডাক্তারের রসহীন খটখটে কথায় একজন বৈষ্ণব আহত হয়ে বলল, - বিজ্ঞানের কী ক্ষমতা আছে ডাক্তারবাবু যা নিয়ে আপনি এমন বড়াই করছেন? জগত সংসার সব তো তাঁর হাতে। রাখে হরি মারে কে?

- তাহলে এখানে কেন? হরির কাছে নিয়ে যান।

- হরি তো আপনার কাছে পাঠালো। আপনি তো শুধু উপলক্ষ মাত্র,যা করার আমার হরিই তো করবেন।

ডাক্তার এমনিতেই খুব স্পষ্টভাষী। গুলতাপ্পি দেওয়া জলমেশানো কথাবার্তা তার একদম পছন্দ নয়।বাবাজির কথার কিছু কড়া উত্তর দেওয়ার উপক্রম করতে,অন্য সাধু ডাক্তারের হাত ধরে বলে, - এখন বাকবিতন্ডার সময় নয় ডাক্তারবাবু। অনুগ্রহ করে আপনি চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন।

দিনরাত এক করে দিয়ে ডাক্তার আর ডাক্তারের ছেলে বাবাজি কে নিয়ে লড়াই করছে।বাবাজির অনুগামিরা দলে দলে আসছে। কিন্তু ডাক্তারের বাড়িতে কারো প্রবেশ নিষেধ। ডাক্তার জানিয়ে দিয়েছে আটচল্লিশ ঘন্টা পার না হওয়া পর্যন্ত ঠিকঠাক কিছু বলা যাবে না। সময় পেরোতে যখন ডাক্তারের বাড়ির দরজা সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া

হলো, তখন অনেকেই দেখল ডাক্তারকে যেন আর চেনাই যাচ্ছে না।চোখ দুটো জবা ফুলের মতো লাল হয়ে গেছে। মাথার চুল উসকোখুসকো, মুখ চেহারা সব ভীষণ রকমের শুষ্ক। তাহলে কি বাবাজি.......

বাবাজি প্রসন্নচিত্তে ঘুমিয়ে আছে। বাবাজি কে দেখে ভক্তরা হরিধ্বনিতে উল্লাস করে উঠলো। খবর পেয়ে চারদিক থেকে পিলপিল করে সাধু বৈষ্ণব ও ভক্তরা আসতে লাগল। কয়েকজন কয়েকঘড়া গঙ্গাজল ও বাবাজির জন্য নতুন বস্ত্র নিয়ে হাজির। বাবা কদিন একেবারে নরককুণ্ডে পড়ে ছিলেন। গঙ্গাস্নানে বাবার দেহ ধৌত করে নব্য বস্ত্র পরিধান করিয়ে মন্দিরে ফেরৎ নিয়ে যেতে হবে। রাধারানী করুনা করে তাদের প্রিয় মানুষটির প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছে। ভক্তের প্রতি ভগবানের কি পরীক্ষা!

আওয়াজ উঠলো রাধারানীজী কি? ভক্তরা বলল,- জয়।

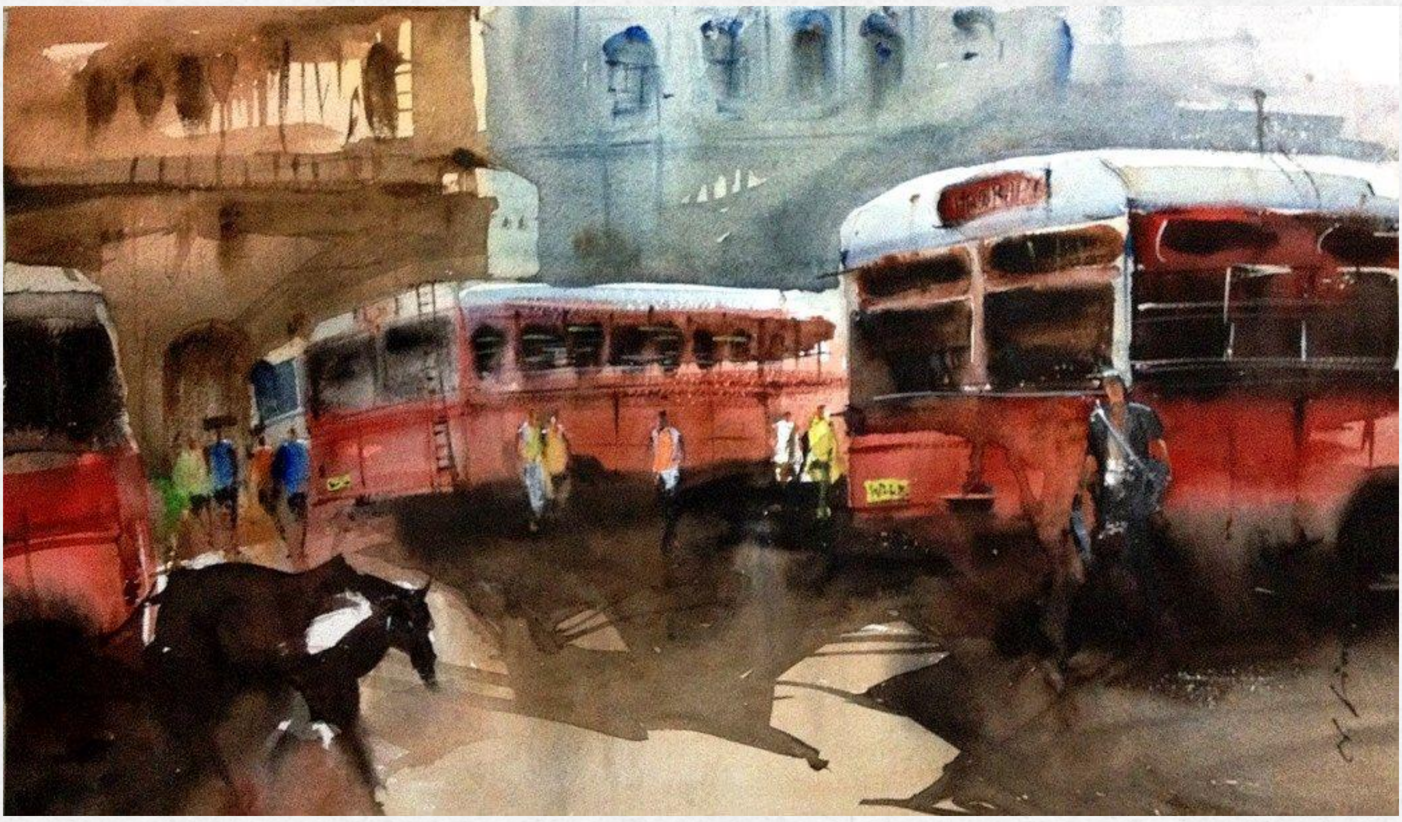
নিত্যানন্দ বাবাজি কে স্নান করিয়ে পোষাক পরিয়ে, কপালে ও সারা শরীরে তিলক অঙ্কিত করে, গলায় ফুলের মালা পরিয়ে, নরকে কলুষিত বাবাজির পোশাক নরকে নামিয়ে রেখে, দেবতার মহিমায় মৃত্যুঞ্জয়ী নিত্যানন্দ বাবাজি কে বৈষ্ণবেরা স্বর্গ যাত্রায় নিয়ে গেলো প্রবল কলরব করতে করতে।

সূচিপত্র

গল্প:

দুলাল আর মেয়ে ঝুম্পার কাহিনী

লি খে ছে ন – রা হু ল প্রা মা নি ক



গাড়িটা কয়েক বার বিকট আর্তনাদ করে থেমে গেল।

আবার তাই হল। হ্যাঁ, সম্পূর্ণ গিয়ার ফ্রি। গাড়ি তো নিউট্রাল আছে। তাহলে এমন হচ্ছে কেন? বুঝতে পারছে না ঝুম্পা। সে চাবিটা খুলে পুনরায় স্টার্ট করল। ডান পা দিয়ে এক্সসেলেটর লিভারে হালকা চাপ দিল। গাড়িটি কঁকিয়ে উঠল। সেই শব্দের মধ্যে বৃদ্ধ কণ্ঠস্বর। ঘড় ঘড়ে গলা। যেন বহু রোগভোগের পর আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কি হল বুঝতে পারল না। ৮৩ A

রুটের এই গাড়িটা সব থেকে বয়স্ক। সামনে চোখের ঘোলাটে কাঁচের মধ্যে কত স্মৃতি রয়ে গেছে। ঝুম্পা এই গাড়ির ড্রাইভার। আঠারো বছর চার মাসের মেয়েটি এ রুটের সব থেকে প্রাচীন গাড়িটির চালক। উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণের ছিপছিপে চেহারা। ওড়না হীন সালোয়ার কামিজের মধ্যে থাকা অনমনীয় শারীরিক ভাষা অদম্য। পরিপাটি করে বাঁধা চুলের ওপর হাত দিল সে। অনেক কিছু মাথায় রেখে গাড়ি চালাতে হয়। বেখেয়াল হলেই সর্বনাশ। কত কত মানুষের প্রাণ তাঁর হাতে। ফিরে চেষ্টা করল। সে মিটার বোর্ডের দিকে তাকাল। ইঞ্জিনের টেম্পারেচার ও ফুয়েলের ইন্ডিকেটর সব স্বাভাবিক। কেন এমন হচ্ছে। বুঝতে পারছে না। মাঝে মধ্যে এই সমস্যা হয়। মালিক সব জানে, তবু এই গাড়ি রাস্তায় রেখেছেন। যতই সমস্যা হোক না কেন, তাঁকে অবসর দিতে রাজী নয়। এই গাড়িটি তাঁর জীবন বদলে দিয়েছে। কয়েক দশক খেটে মালিককে কোটিপতি করেছে এই বৃদ্ধ ঘোড়া। একেবারে লক্ষ্মী গাড়ি। মালিক গণপতিবাবুর এখন রুটের গাড়ি সাতটি আর ট্রাভেল বাস দুইটি। তাই এ গাড়িকে সম্মান করেন। দেবীর চোখে দেখেন। লাভের থেকে ক্ষতি বেশি হয়। তবু তাঁকে সমাদর করেন।

বাস স্ট্যান্ডের সব থেকে সিনিয়র গাড়িটি চালাত দুলাল। দুলাল মন্ডল, বয়স আটচল্লিশ বা ঊনপঞ্চাশ হবে। সে গাড়িটি খুব যত্ন করত। নিজের অপত্য স্নেহে

ভালোবাসত। তাই মালিক তাঁর লক্ষ্মীকে দুলাল ছাড়া অন্য কোনো ড্রাইভারের হাতে দেন নি। কিন্তু দুলালের একটা এক্সিডেন্টে পা ভেঙে যায়। প্রায় তিন মাস বিছানায়। গাড়িটাও বন্ধ । দুলাল সুস্থ হলে গাড়ি রাস্তায় নামবে; গণপতিবাবু সাফ জানিয়েছিল।

দুলাল সুস্থ হয়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে দুটোর বেশি ট্রিপ দিতে পারে না। পা যন্ত্রণা হয়। কি করবে বুঝতে পারে না। যদি ছেলে থাকত তাকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে সঙ্গে নিত। কিন্তু দুলালের দুই মেয়ে। ছোটটি দশ বছরের। তাই সে বড় মেয়ে ঝুম্পাকে হাতে ধরে সব শিখিয়েছে। এখন মেয়েরা সব করছে। মহাকাশে যাচ্ছে। আর সামান্য গাড়ি চালাতে পারবে না। ঝুম্পা সব কিছু শিখে নিয়েছে , কিছু দিনের মধ্যে। বাবার কষ্ট সে সহ্য করতে পারে না। যখন সে খাবার দিতে যেত , তখন শুনতো বাবার পায়ে অসহ্য যন্ত্রণার কথা। সে নিজে তাই বাবাকে বলেছিল গাড়ি চালানো শিখবে। তাঁকে হেল্প করবে। প্রথমে সম্মত না হলেও পরে তা করেছিল। সমস্যা হয়েছিল গণপতি বাবুর দিক থেকে। তিনি মটেই রাজী হবেন না। মেয়ে হয়ে স্টিয়ারিংধরবে! নিজের লক্ষ্মীকে ছেড়ে দিতে হবে মেয়ের হাতে। তা আবার হয় নাকি। অসম্ভব ...! কিন্তু দুলাল বলে, সে গাড়িতে সব সময় থাকবে। দু ট্রিপ নিজে চালাবে। বাকি দু ট্রিপ মেয়ে চালাবে, ও ব্যাক সিটে বসে থাকবে। মালিক দুলালকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করেন।

রাজী হয়ে যান। আর তখন থেকে ঝুম্পার জীবন চলমান। পুরুষের একাধিপত্যকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে এগিয়ে চলেছে। কোমল হাতে কঠিন স্টিয়ারিং। হুশ হুশ করে এগিয়ে যাচ্ছে। কাদা অনেক ছোঁড়াছুঁড়ি হয়েছে। স্ট্যান্ডের অন্য গাড়ির চালকের তীর্যক মন্তব্য হজম করতে হয়েছে। এখন আর সেই সব কথায় কান দেয় না বাপ – বেটি।

ঝুম্পা বুঝতে পারল কোনো বড় প্রবলেম হচ্ছে। না হলে গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না কেন? ওঁর বাবাকে ডাকল। দুলাল তখন মিল খাচ্ছিল। টাইম হয়ে গেছে। গাড়ি ছাড়তে হবে। সে দুলালকে বলে, বাবা; কি হচ্ছে বুঝতে পারছি না? তাড়াতাড়ি এসো।

“ব্রেক আনলক করে দেখ্” - হাত ধুতে ধুতে দুলাল বলল।

“গাড়ি স্টার্টই নিচ্ছে না তো, আবার ...”

“আচ্ছা আমি যাচ্ছি। কি হল দেখছি।”

“হ্যাঁ এসো ... ’

গাড়িতে বসে ছিল কয়েক জন মহিলা। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে। প্রতি কথার মধ্যে শ্লেষ ঝরছে। মেয়ে মানুষকে আবার গাড়ি চালাতে দিয়েছে। যেন ছেলে খেলা ...! দুর্ঘটনায় পড়লে কি হবে তখন।

এমন সময় দুলাল এল। ওঁর কানে কথা গুলো গেল। তবু কিছু না বলে পাইলট দরজা থেকে গাড়িতে উঠল। ডান

পা এক্সেলেটরে দিয়ে চাবি ঘোরাতেই গাড়ি শব্দ করছে। স্টার্ট হয়ে গেছে। ওঁর হাতের স্পর্শ গাড়ি খুব চেনে। সামান্য টাচে গাড়ির অনেক শক্তি তৈরি হয়েছে। সে উঠে গেল। ঝুম্পা ড্রাইভারের সিটে বসল। বাম পা দিয়ে ক্লাস বেশি করে চেপে ধরল। গিয়ার লিভারটি এক নাম্বারে দিল। হাত দুটি দিয়ে শক্ত করে ধরল স্টিয়ারিং। সে নিজের মনকে এক জায়গায় জোরো করে ডান পায়ে এক্সেলেটর হালকা চাপ দিল। গাড়ি গর্জন করছে। আরো জোরে ...। এবার বাম পা এর নিচে থাকা ক্লাস লিভারটি আস্তে আস্তে ছাড়তে থাকল। গাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে। গাড়ি তার ভাঙাচোরা দেহ নিয়ে রওনা দিল। তারই শব্দে, বসে থাকা প্যাসেঞ্জার গুলোর সমালোচনা কানে আর ধরা দিল না। চুপ হয়ে গেছে । ধীরে ধীরে গতি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ফলতা বাস স্ট্যান্ড একাবারে হুগলি নদীর বুকের ওপর। বেশ কিছু দোকান নদীর কোলে আশ্রয় নিয়েছে। পাশে নরম দূর্বা ঘাসে ঢাকা ফুটবল খেলার মাঠ। অদূরে দেখা যায় জন ড্রেক এর পুরানো কেল্লা। বাংলার নবাব সিরাজ যখন কলকাতা আক্রমণ করেন, তখন ব্রিটিশদের কিছু বণিক এখানে চলে এসেছিলেন। কেল্লা সুরক্ষিত রাখার জন্য চার পাশে পরিখা কাটা। ৮৩ A বাস স্ট্যান্ড ওদের প্রতিবেশী। আর আত্মীয় রয়েছে কিছুটা উত্তরে ‘বসু বিজ্ঞান মন্দির’। মহান বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশ

চন্দ্র বসুর সাধনার মহল। প্রতি দিন নদীর ভিজিয়ে দেওয়া তরঙ্গ স্নান করিয়ে দেয় এই মন্দিরের পশ্চিম অঙ্গ।

ঝুম্পা বদর তলায় গাড়ি থামাল। এই রুটের সব গাড়ি বদর সাহেবকে প্রণাম করে । সে ও করল। একটি বিশাল জরাগ্রস্ত তেঁতুল গাছের নিচে সিমেন্টের বদর সাহেবের থান। থানটি কেন্দ্র করে চল্লিশ ফুট ব্যাস নিয়ে চারপাশে তেঁতুল গাছের ডাল পালা আচ্ছাদিত চাঁদোয়া। এই থানের মাহাত্ম্য অনেক। বাবার থানে মেলাও হয়। রফিক চাচা তা পৌরহিত্য করেন। এক সপ্তাহ ধরে হিন্দু মুসলিম মিলিত হয় এই উৎসবে। পুতুল নাচ, যাত্রাপালা, গাজন হয়। আশে পাশের চার পাঁচটি গ্রাম ভিড় করে । কত কত দোকান। বাসের কন্ডাক্টর গাড়ি থেকে নেমে পাঁচ টাকার একটা কয়েন দিয়ে ভক্তি ভাবে প্রণাম করল। এবার গাড়ি নিশ্চিন্তে এগোবে। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের সর্পিল পথ বেড় মেরে গাড়ির গতি বাড়ল। সে চপ্পল পরা ডান পা এক্সেলেটর থেকে সরিয়ে নিল, সঙ্গে সঙ্গে বাঁ পা দিয়ে ক্লাস চেপে ধরল। নিজের প্রতি খুব আত্মবিশ্বাসী সে। দমে যাবার পাত্র নয়। হাত দিয়ে গিয়ার লিভারটি দ্বিতীয় গিয়ারে দিল। হাত পা সমান ভাবে কাজ করে এই টুকু মেয়ের। দুলাল মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যায়। তার দক্ষতা দেখে নিজের যত কষ্ট আছে, সব ভুলে যায়। বাচ্ছা মেয়েটির শারীরিক ভাষা এতটা পরিণত যে সকলের কপাল কুঁচকে যায়। ঝুম্পা আবার এক্সেলেটর চেপে ধরল; চোখে দৃঢ়

প্রত্যয় লেপ্টে রয়েছে। ক্লাজ ছেড়ে দিল। গাড়ি ভালই গতি পেল। এবার সকলে খুশি। ঠিক সময়ে পৌঁছে যাবে। সে স্টিয়ারিং প্রয়োজন মতো ঘোরাচ্ছে। প্রয়োজনে হর্ন দিচ্ছে।

হেল্পার দরজার কাছে ঝুলে আছে। হাঁক দিচ্ছে 'ফতেপুর, আমতলা, বেহালা, বাবুঘাট ...। ... ফাঁকা ফাঁকা ...। চলে আসুন, চলে আসুন।'

সত্যি আজ গাড়ি ফাঁকা। কেন যে এমন হল কি জানি। কন্ডাক্টর চেঁচিয়ে বলে, - 'ঝুম্পা একটু ধীরে। লোক হয়নি। সহরার হাটে দাঁড়াতে হবে। প্যাসেঞ্জার নেই। খালি সিট নিয়ে এগিয়ে গিয়ে লাভ নেই। আজ বাজার খুব খারাপ। যাসস্... শালা সব মাটি হবে দেখছি।'

'চিন্তা করিস না মনা। সহরার হাটে ভর্তি হয়ে যাবে দেখবি। মিলিয়ে নিবি।' ঝুম্পার ব্যাক সিটে থেকে ঝুকিয়ে মুখ বের করে দুলাল বলল।

'হলে তো ভালোই হয়। তোমারটায় তো মার খেলুম। ফতেপুরে কিছু হয়ে ছিল। বাকি রাস্তায় টুকটাক। ঝুম্পার বেলায় কত হয় দেখা যাক্।' কাঁধে ঝোলানো চামড়ার ব্যাগে থেকে টিকিট বের করতে করতে মনা বলল।

গতি কমিয়ে হর্নের সাথে একটা কালভার্ট পেরিয়ে গেল। দুর্বল গাড়ির দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া বডির ঝনঝন শব্দ করে হাটে পৌঁছে গেল। অনেকে নামবে। দরজার কাছে এসেছে। হেল্পার হাতের কাছে দড়িতে টান দিল। ঘন্টা টং

টং করে ওঠে। গাড়ি থেমে গেল। ইঞ্জিন বন্ধ। এখানে অনেক প্যাসেঞ্জার দাঁড়িয়ে। এত লোক অপেক্ষা করবে সে ভাবতে পারে নি। সহরারহাট থেকে ভাদুড়াগামী রাস্তায় মিনি বাস একটি বাচ্ছাকে বেটে দিয়েছে। তাই ঐ রাস্তা বন্ধ। সেই কারনে এত এত প্যাসেঞ্জার দাঁড়িয়ে। ঝুম্পা অন্য রাস্তা দিয়ে যাবে। তাই সমস্যা নেই। গাড়ি সম্পূর্ণ ভর্তি হয়ে গেল। অধিকাংশ দাঁড়িয়ে। দুলাল খুব খুশি হল। কালো ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে জরদার কষ লাগা দাঁত বের করে মনা তাকালো দুলালের দিকে। হাসি লেগে রয়েছে। হেল্পার গলা চড়িয়ে দিল, 'ফতেপুর, আমতলা, বেহালা, বাবুঘাট ...। ফাঁকা ফাঁকা ...।'

গাড়ি আবার চলতে শুরু করল। প্রতি মোড় মাথার ভিড় ঠেলে সে এগিয়ে যাচ্ছে। দোকান ফেলে, ফাঁকা মাঠ ফেলে, আবার কলরব ফেলে সামনের দিকে। তাঁর মধ্যে কোমলতার কোনো চিহ্ন নেই।

বুড়ো ঘোড়া হাঁসফাঁস করে রাস্তা ফেলে দৌড়াচ্ছে। পেটে ঠাসা ভিড়। দরজা থেকে ঝুলছে কেউ কেউ। লুকিং গ্লাসে ঝুম্পা দেখতে পাচ্ছে। খুব সাবধানে সে চালাচ্ছে। রোড বাম্পার বা স্প্রিড ব্রেকার দেখে চালাতে হচ্ছে। একটু ভুল হলে এক্সিডেন্ট হতে পারে। হরিণডাঙা এসে হাল্কা থামল। মনা টিকিট কাটছিল। খ্যাঁসখ্যাসে গলায় হেল্পারকে বলে , 'কালো, ... এ কালো; দরজা খালি কর। এই দিকে পাঠিয়ে দে ...। এই মোড় থেকে অনেকে উঠবে।

পাঠা ... পাঠা। ও দাদা, ও দাদা এদিকে আসুন। এদিকে ...।'

কালো বুঝিয়ে সুঝিয়ে, কিছুটা ঠেলে গাড়ির ভিতরে করে দিল। দরজা এখন ফাঁকা। কিন্তু প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে গন্ডোগোল শুরু হয়ে গেল। চাপাচাপি অবস্থা। সব চিঁড়ে চাপটা হয়ে যাচ্ছে। কুলকুল করে ঘাম বেরচ্ছে। সেই গন্ধে সারা গাড়ি ভরে গেছে। মনা টিকিট কাটছে, দাঁড়িয়ে থাকা প্যাসেঞ্জারদের বলছে কোন কোন সিট ফাঁকা হবে। দূরের যাত্রীদের সেখানে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। সদ্য শিকার খাওয়া পেট মোটা অজগরের মতো ৮৩ A রুটের বাসটি গড়াচ্ছে। ঝুম্পা কোনো দিকে কান দেয় না। এগিয়ে চলেছে। চোখ সামনে কিংবা লুকিং গ্লাসে। কান ঘন্টার প্রতি, কখন কালো দাঁড়াতে বলবে। মানুষ নামবে, কিংবা উঠবে।

হঠাৎ চড়া গলা সে শুনতে পেল। কিছু কিছু যাত্রী হৈ চৈ করছে। ভ্যাপসা গরমে ভয়ঙ্কর অবস্থা হল। চড়া গলা মহিলার। পিছনের দিক থেকে আসছে। সুর আরো চড়ছে। হাতা হাতি পর্যায়ে। মনা থামাতে পারছে না। দুলাল উঁকি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করে। সে ঝুম্পাকে বলে, 'তুই এগিয়ে যা। আমি দেখি কি হল।' কিন্তু ঠেলাঠেলি দেখে সে গেল না। তিল ধরবে না, এমনই অবস্থা। মহিলা উত্তেজিত হয়ে পাশে দাঁড়ানো মাঝ বয়সী এক ব্যক্তিকে বার দুই চড় কষিয়ে দিল। সেই ব্যক্তি নাকি কনুই মেরেছে। মনা

থামাতে গেল। পারল না। মহিলা আরো গরম হয়ে গেল, ফর্সা সাদা গালপাটি লাল হয়ে গেছে। টেকসই দেহটি ভিজে লাস্যময়ী রূপ উন্মুক্ত হয়েছে। মহিলা অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন স্বরে বলেন , ‘আমি পুলিশে দেব। হারামজাদা ...। ভিড় বাসে মেয়ে পেলেই, হাত মারা এদের মতো লোকের স্বভাব। পুলিশে দিলে তবেই শিক্ষা হবে। হারামজাদা ...।’

লোকটি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সকলে তাঁর দিকে তাকিয়ে। মহিলা আবারো শুরু করল, ‘প্রথম থেকে লক্ষ্য করছি, গাড়ি থামলে উঁনি গায়ের ওপর ঢলে পড়ছে। ভাবলাম ব্রেক মারার জন্য হায়তো নিজে ভারসাম্য রাখতে না পেরে গায়ে হেলে পড়ছে। কিন্তু না, উল্টে পড়ছে আর কনুই দিয়ে পাশ থেকে বুকে চাপ দিচ্ছে। হারামজাদা ...। বাড়িতে মা – বোন নেই নাকি।’

কয়েক জন চেঁচিয়ে ওঠে। মার শালা কে; মার ...। তিন – চারটি হাত উদ্দ্যত হয় মারার জন্য। মনা ঝামেলা বুঝে, গালাগালি দিয়ে ধাক্কা মেরে দরজার কাছে নিয়ে যায়। ঝুম্পাকে থামাতে বলে, গাড়ি থেকে নামিয়ে দেয় ব্যক্তিটিকে ।

মনা গড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে বলে, ‘শালা বয়স তো ভালোই হয়েছে, এই বয়সে স্বভাব আর গেল না।’

দরজার কাছে কালো ঝুলছিল। সে মুখটাকে ধনুকের মতো করে ফিসফিস করে বলে, ‘শালা বুড়ো ভাম; কিন্তু আলুর দোষ গেল না ...। শালা ...’

ঝুম্পা ওর বাবাকে জিজ্ঞাসা করে কি হয়েছে। সে পিছনের দিকে না তাকিয়ে বলে, ‘কিসের জন্য এত গন্ডগোল হল।’

দুলাল ইতঃস্তত করে লুকিং গ্লাসে তাকায়। তারপর সে বলে , “ও কিছু না রে মা। তুই মন দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যা...। একটা বেয়াড়া লোক বদ আচরণ করছিল। তাই তাঁকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেয়।”

ঝুম্পা গাড়ির হর্ন দিতে দিতে মাথা নাড়ে। গাড়ি দিঘিরপাড় থেকে সতেরোটা ছোট বাম্পার পেরিয়ে দস্তিপুর পৌঁছলো। মাত্র সাড়ে তিন কিলোমিটার রাস্তায় এত গুলো স্পিড ব্রেকার। বুড়ো গাড়িটি উত্তাল সমুদ্রের মাঝে অসহায় জাহাজের মতো পাল্টি খেতে খেতে এগিয়ে গেল। দূর্বল কবজা গুলো তীব্র চিৎকার করছে । মনে হচ্ছে হাড়গুলো এক্ষুনি খুলে যাবে।

ঝনঝন শব্দ করে একশো সতেরো নাম্বার জাতীয় সড়কে উঠে পড়ে। ডায়মন্ডহারবার জাতীয় সড়ক খুব ব্যস্ত একটা রাস্তা। সব গাড়ি এই রাস্তায় দৌড়ায় না; সব গুলো যেন উড়ে বেড়ায়। কানের পাশ থেকে হুশ হুশ শব্দ শোনা যায়। ঝুম্পা গিয়ার পরিবর্তন করল। গাড়ির গতি বাড়িয়ে

দিল। লুকিং গ্লাসে সে চোখ ফেলতে দেখতে পায়, উলটো দিক থেকে বুলেট গতিতে আসছে অন্য রুটের ঝাঁ – চক্চকে লাক্সারি। সে জানে এই গাড়ি যদি ওদের আগে যায়; তাহলে ৮৩ A গাড়ি আর কোনো যাত্রী পাবে না। এমনিতেই কঙ্কালসার বডি, আর গতির হেরফের হলে কেউ পা মাড়াবে না। ঝুম্পা সব বোঝে। বৃদ্ধ ঘোড়া ভয়ঙ্কর ভাবে দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ফেলে। কালো কালো ধোঁয়ায় ভরে যায়। তারপর সুপার ফার্স্ট গাড়ির মতো ভোঁ ভোঁ করে অদৃশ্য হয়ে যায়। পরের স্টপেজে রাস্তার মাঝখানে এমন আড়াআড়ি ভাবে দাঁড়ায় ; যাতে অন্য গাড়ি ওর গাড়িকে ওভারটেক করতে না পারে।

লাক্সারি বাস থেকে কিছু গালাগালি ছুঁড়ে দিল। মনে হয় ড্রাইভার বলল। ঝুম্পা শুনেও কানে করল না। দুলাল বলে, 'মা রে তুই গাড়িটা ছেড়ে দে ...'

কিন্তু ঝুম্পা দমবে না। কারন আগের দিন ঐ গাড়িটি এমনই ব্যবহার করে ছিল। সে একদম ছাড়বে না। পিছনের গাড়ি কান ফাটা হর্ন দিচ্ছে। রাস্তা ছেড়ে দেবার জন্য। শিরাকোলের আগে মল্লারঠেস অপেক্ষাকৃত কম ভিড় থাকে। তাই সে নিশ্চিন্তে গতি বাড়াতে থাকে। মল্লারঠেস ফেলে বেরিয়ে যাবার সময় হঠাৎ একটা আট বছর বয়সী ছেলে খালি গায়ে রাস্তার পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে দৌড়ে যায়। গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে ছিল না। ঝুম্পার

মাথা কাজ করছে না। দুলাল বিস্ফারিত চোখে তাকায়; কিছু বলার মতো সময় নেই। একে বারে কাছাকাছি।

মুহূর্তে মাথা নিশ্চল হয়ে গেছে। ঝুম্পার অটল চোখ তাকিয়ে আছে। কিন্তু পা সর্বক্ষণ ব্যস্ত। অজান্তে এক্সলেটর থেকে পা সরে গেল। বাম পা সঙ্গে সঙ্গে ক্লাস চেপে ধরে। ডান পা পরক্ষণে ব্রেকে ধীরে ধীরে চাপ দিতে থাকে। এত দ্রুততার সাথে সবটা হল; সে নিজেও বুঝতে পারল না। গাড়িটা সামনে ঝুঁকে গেল। গাদা গাদি ভিড়ে এর ওর গায়ে হুমড়ে পড়ে যায়। অপলক সব ঘটে গেল । দুলাল হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। যাত্রীদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ রেগে গিয়ে অকথ্য কথা শুরু করল। ঝুম্পার কান সোঁ সোঁ করছে। তার কানে কিছু এল না।

আমতলায় পেট খালি হল। কিন্তু সব সিট বুক হয়ে গেছে। দরজার কাছে কালো দাঁড়িয়ে হাঁকছে, 'এই ...খালি খালি। এ... খালি খালি।'

মনা একটা দশ টাকার নোট দিয়ে কালোকে বলে পাশের দোকানে পান কিনে আনার জন্য। সে দৌড়ে যায়। রাস্তার ফুটপাত দখল করে থাকা পান দোকানে গিয়ে বিনা খয়ের শিব এনে মনার হাতে দেয়। এখানে গাড়ি ভীষণ মন্থর। প্রায় পনেরো মিনিট তো লাগবেই। চামড়ার ব্যাগের খুচরো পয়সা ঝন্‌ঝনিয়ে মনা বলে, 'কালো গাড়ি থেকে নেমে হাঁক দে ...। সব খালি । হেঁকে হেঁকে বল।'

কালো হাতছানি দিয়ে ডাকার মতো করে হাঁক দেয়, '' এ ... সিট খালি। সিট খালি। তাড়াতাড়ি ...। খালি... খালি। ''

ওদের গাড়ি যখন সিগন্যালের কাছে পৌঁছলো । তখন আলো লাল হয়ে গেল। আবার দেরি করতে হবে। কালো ওর স্বভাব ভঙ্গিতে হেঁকে যাচ্ছে , 'বেহালা, মোমিনপুর, বাবুঘাট ...। খালি খালি ...।'

সবুজ হতেই গাড়ি বেরিয়ে গেল। এক হাত ছাড়া গাড়ি আর মানুষের ভিড় মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। ঝুম্পা স্টিয়ারিং এক হাতে ধরে ছিল। সে দু' হাতে আটকে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে বেরিয়ে গেল।

সে দেখিয়ে দিতে চায় মেয়েরা পঙ্কিল নয়। পুরুষের কিছু ভুল ধারণা সমাজের মধ্যে বেদ বাক্য হিসাবে ব্যবহার করে। নিজেদের পেশি শক্তি দিয়ে সব কিছু বিচার করে। তা যে কত ভুল; সেটা সে দেখাবে। দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেবে। কিন্তু এই রোগগ্রস্ত সমাজ মানবে কি? জানতে চাইবে কি? অনেক প্রশ্ন ...। উত্তর দিতে কেউ পারে না। পারবেও না। বুকে হাত দিয়ে কথা বলতে সমাজ যে ভয় পায়।

বাবুঘাট সে পৌঁছে গেল। নির্দিষ্ট টাইম টেবিলের থেকে পাঁচ মিনিট বেশি লাগল। কেন লাগল। গাড়ির গতি মন্দ ছিল না তো। নাহ্, দেরি তো হবে। মাঝের হাটের ভাঙা ব্রিজের কাছে সময় নষ্ট হয়ে ছিল। সে তার টাইম

ক্যালকুলেশন ঠিকই করেছে। কোথায় কত সময় লেট করতে হবে সব পারফেক্ট হয়েছে। নিজেই নিজের পিঠ চাপড়ে নিল। কেউ তো আর মেয়ে বলে বেশি পাত্তা দেয় না। দুলাল এক মাত্র উৎসাহ দেয়। আর বাকিরা ওর গাড়িতে গেলেও মুখের বক্রতা এখনো থেকে গেছে। শিক্ষিত সচেতন মানুষ হলে অনেকে ওর সুনাম করে। বয়সের অনুপাতে অনেক বেশি দায়িত্ব নিয়েছে সে। এই কথা ভেবেই অধিকাংশ মানুষ অবাক হয়।

কলকাতার এক জনপ্রিয় মিডিয়া ওর সাথে দেখা করে। ঝুম্পাকে নিয়ে তাঁরা একটা স্টোরি করবে ইচ্ছা প্রকাশ করে। সে এই সব বিষয় নিয়ে কোনো ভাবেই ভাবিত নয়। খাটলে খাওয়া, আর না খাটলে অভুক্ত হয়ে থাকতে হবে।

পড়াশুনা করতে পারল না সে। মাঝ পথে সব ছেড়ে দিতে হয়। নবম শ্রেণি উত্তীর্ণ সে। মাধ্যমিকের স্বপ্ন গুলো যখন মনের মধ্যে বেড়ে উঠছিল। তখন তার বাবার এক্সিডেন্ট হয়। একটা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে ছিল তারা। সেই সময়টা মা অনেক কষ্ট করে ছিল। সবাই বলত দুলাল ; যদি ঝুম্পার বয়সী তোর একটা ছেলে থাকত কতই ভালো হত। এই অসময়ে কত কত সাহায্য পেতে পারতিস। ঝুম্পা সব শুনতো। কিছু বলত না।

প্রথম থেকে সে ডাকাত মেয়ে ছিল। ভয় কাকে বলে সে জানতো না। গ্রামের বয়স্ক পাকা মাথা গুলো

গান্ধিবুড়ি বলে খ্যাপাত তাকে । এই নামে ডাকার একটা ইতিহাস আছে। পাড়া হোক বা স্কুলে সব জায়গায় একটু বেশি সাহস দেখাত। ভুল কিছু চোখে পড়লে গর্জে উঠত সে। সে বার পাশের গাঁয়ের একটি ছেলে এক স্কুল ছাত্রীকে হাত ধরে টান ছিল। রাস্তায় তা দেখে সে ক্ষেপে ওঠে, ছেলেটার নাকে এক ঘুঁষি মেরে ফাটিয়ে দেয়। যদিও মেয়েটি ছেলেটাকে ভালোবাসত। মেয়েটার বাড়ির সবাই মেনে নিয়ে ছিল। কিন্তু ঝুম্পা মেয়েটাকে অসহায় মনে করে তা করে ছিল।

বাবুঘাট থেকে গাড়ি ছাড়বে সন্ধ্যা ছয়টা পনেরো মিনিটে। ফিরতে রাত হবে। দিনের প্রায় সবটা সময় দেয় গলন্ত পিচ ঢালা রাস্তায়। মানুষের দাপাদাপি; গাড়ির ভিড় সব অতিক্রম করে জীবন এগিয়ে নিয়ে যায় সে। মাথার মধ্যে সব সময় টাইম টেবিল কাজ করে। একটু টাইমের গড়বড় হলে খিস্তি দু – একটা তো জুটেই যায়।

এমনিতে ৮৩ A রুট অনেক পুরানো। বাস গুলো পুরানো ইঞ্জিনের ওপর নতুন চিকন বডি পরিয়ে ঝকঝকে হয়ে আছে। মাঝে মধ্যে গাড়ি গুলো বিকল হয়ে যাওয়া হৃদযন্ত্রের মতো হাঁসফাঁস করে। তাই এই গাড়ি এড়িয়ে যায় মানুষজন। সবার মধ্যে ব্যস্ততা রয়েছে। আর যদি রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে পরে; তাহলে তো এই সচল জীবনে পিছিয়ে পড়বে। তাই আগে ভাগে পাবলিক এই সব বাস থেকে দূরে থাকে। কিন্তু বছর পাঁচেক আগে ফলতার সাথে

কলকাতার যোগাযোগের এক মাত্র অবলম্বন ছিল এই বুড়ো হাঁস। তখন জোয়ান বয়স। তাই বাস গুলো হুশ হুশ করে চোখের সামনে থেকে বেরিয়ে যেত। ভিড় হত খুব।

এই ফলতা থেকে বহুকাল আগে ট্রেন চলত। আদ্যিকালের কথা, ঊনিশশো সতেরো সালের দিকে। ন্যারো গেজ রেল লাইন। ম্যাকলয়েড লাইট রেলওয়ে কোম্পানি চালাত ফলতা থেকে কালীঘাট পর্যন্ত । সকলে মায়ের পূজো দিতে যেত এই ট্রেনে করে। মাঝেরহাট পর্যন্ত যেত, তারপর নেমে যেতে হত। তারপর পায়ে হেঁটে মায়ের থানে যেত সকলে। তার অনেক পরে এই বাস। কিন্তু এখনকার উন্নত টেকনোলজির সাথে লড়াই করে টিকিয়ে রেখেছে নিজেদের অস্তিত্ব।

ঝুম্পার সময় হয়ে গেছে। ছ'টা দশ। গাড়িতে ওঠার আগে প্রণাম করে নেয়। তারপর গাড়ি স্টার্ট দেয়। পাঁচ মিনিট শব্দ করতে থাকে। মাঝে মাঝে কালো – সাদা ধোঁয়া বের হয় । সন্ধ্যায় ভিড় কম না। সারা দিনে এ শহরে যারা শ্রম দেয়, তাদের ক্লান্ত ঘাম শুকতে শুকতে ছেঁড়া সিটে শরীর হেলিয়ে দেয়। এই সময়ে ওদের গাড়িতে যারা যাত্রী হয় সবাই সকলকে চেনে। যতই রাত হোক না কেন এই বাসের জন্য অপেক্ষা করে ওরা। কারণ হয়তো অন্য বাসের থেকে ভাড়া কম।

বাবুঘাট থেকে বাস কয়েকটা হর্ন দিয়ে বেরিয়ে গেল। সারা শহরে আলোর রোশনাই ভরে গেছে। দূরে রবীন্দ্র

সেতুর অপরূপ দৃশ্য চোখ থেকে সরতে থাকে। প্রিন্সের ঘাটের পাশ থেকে হুগলী সেতুর লাইট চোখ ঝলসে যাচ্ছে। গাড়ি কিন্তু কোনো দিকে না তাকিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। ভাষা ভাষা আলোর মধ্যে থেকে অনেক কথা বেরিয়ে আসছে। অটল গতিতে গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে।

আবার সেই একই জায়গা গুলো ছেড়ে ওদের মফ্‌সল এলাকার দিকে গড়াচ্ছে চাকা। মনা কাঁধের ব্যাগ থেকে টিকিট নিয়ে আঙুল দিয়ে কয়েকটা ঘর্ষণ দিয়ে শব্দ করে । তারপর টিকিট কাটতে থাকে। সে বলে – দাদা টিকিট দেখি, টিকিট। কালো আর হাঁকছে না। দরজার কাছে চুপ করে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। তাকে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে। ঝুম্পার ঘড়িতে চোখ পড়ে, আট'টা চল্লিশ। সে গতি বাড়াতে থাকে। সুপারফাস্ট গতিতে চলছে। অনেকে সিটে থেকে বলছে, - এতো উড়ছে রে। সুপার ফাস্ট।

গতির সাথে সাথে পনেরো মিনিট হতে না হতে জোরসে শব্দ হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। এই সময় আবার কি হল। গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না। দুলালের চোখে ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুম লেগে ছিল কিছুক্ষণ। সামান্য হৈ – হট্টগোলে চোখ খুলে তাকায়। সে বলে – 'কি হল রে ঝুম্পা। স্টার্ট বন্ধ হল কি করে।

- বুঝতে পারছি না, এমন হল কেন।

- এই রাতে তো কোনো দোকান খোলা নেই। আবার এই ফাঁকা জায়গায় ...

- মনে হয় ঠেলতে হবে।

- হম্, দেখি ঠেলে। মনা ... আরে এ কালো গাড়ি ঠেলতে হবে। কয়েক জনকে নিয়ে পিছনে একটু ঠেলার ব্যবস্থা কর।

কালো গাড়ির পিছন থেকে উত্তর দেয় - প্রথমেই বুঝতে পেরেছি, ঠেলতে হবে। তাই আমি পিছনে চলে এসেছি। মনাদা কয়েক জন লোক নিয়ে পিছনে এসো।

মনা টিকিট কাটা বন্ধ করে কয়েক জন যাত্রীকে অনুরোধ করে ঠেলার জন্য। কয়েক জন ঠ্যাংড়া হে – হৈ করে নিচে নেমে যায়। ঠেলতে থাকে। ঝুম্পা গাড়ি স্টার্ট দেয়। না হচ্ছে না। সবাই চিৎকার করে কাঠের গোড়ে ঠেলার মতো গান ধরে ঠেলে। গাড়ি কঁকিয়ে ওঠে। স্টার্ট হয়ে যায়। সবাই উঠে পড়ে।

রামনগর, দক্ষিন চব্বিশ পরগনা

কল্পবিজ্ঞান গল্প:

অভিনব মন

লি খে ছে ন – মু ন মু ন পা ত্র



মায়ের মন সব সময় ছেলে মেয়ের কাছেই পরে থাকে, সকল সময় চিন্তা, কাছে থাকলেও, দূরে থাকলেও, ফোনটা করেই ফেলি, হয়তো ব্যস্ত, থাকুক ব্যস্ত, আমার মনটা কেমন করছ। কিরে কী করছিস, আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম মা। মা তোমার রান্না হয়ে গেছে? আজকে রাত্রের খাবার, তোমার হাতের রান্নায় করব। হ্যাঁ হয়ে এসেছে রান্না। মা তোমাদের ওখানে সকলে এখন

দুপুরের খাবার খাবে, আর আমি রাতের খাবার খাবো। কিন্তু একই সাথে। হ্যাঁ তুই হাতমুখ ধো, আর খাবার প্লেটগুলো সাজিয়ে রাখ। মা তুমিও খাও আজ আমার সাথে, এক সাথে খাবো আজ। তোর বাবার খাওা হয়নি, আচ্ছা ঠিক আছে, তুই আয়, হাতমুখ ধো। আমি খাবার ফাঠিয়ে দিচ্ছি। থেমার খাবার এসে গেছে, এসো একসাথে গল্প করতে করতে খাই, মা তোমার হাতের তৈরি এঁচোড়-এর তরকারি আমার খুব প্রিয় হয়েছে। যেটা পাঠিয়েছি তোর হবেতো? হ্যাঁগো মা, কাল কী খাবি বল? তৈরি করে রাখবো। নাগো মা, কালকে আমার ফিরতে আনেক দেরি হবে, বাইরে খেয়ে নেবো। কী হল তোমার মন খারাপ হয়ে গেলো, না মন খারাপ হয়নি, আমি ভাবছি অন্য কথা। কী কথা মা? তুই পৃথিবীর আর এক প্রান্তে আছিস, তোকে আমার হাতের রান্না খাওতে পারছি, গরম গরম খাবার, এবং তুই বলার সাথে সাথে এটাই অনেক। ঠিক বলেছ মা। জানিস খুব বেশি দিন আগে নয়, মানুষ এগুলো ভাবতেই পারতো না। মা তুমি যখন আমায় গ্লোব দেখাতে, আর বলতে – এই দেখ এটা আমারিকা এখানে, এখন রাত আর আমাদের এখানে দিন। আমি অবাক হয়ে শুনতাম। মা তুমি বলতে মাঝে আছে অনেক সমুদ্র। কিন্তু টেকনোলজির জন্য তোমার হাতের রান্না খেতে পাচ্ছি। মা আমাকে একটা ডিম ভেজে দাও। হ্যাঁ দিচ্ছি, গল্প করতে করতে খা, মা জানো ‘অভিনব মন’ বলে একটা যন্ত্র আবিষ্কারের প্রচেষ্টা চলছে। সেটা কী আবার, মা দারুন

হয়েছে ডিম ভাজা। মা তুমি বলতে দিদুনদির বিয়ের পর খবর আনার জন্য লোক পাঠাতো, তবে খবর পেতো। হ্যাঁ রে, একই জেলায় তাও। কতদিন আর আগেকার কথা। মা আমাদের ছোট ভিডিও কল করে যখন দিদুনদির ছবি দেখতে পেতাম, তখন দিদুনদির কী আনন্দ হতো। আর বলতো বিজ্ঞানের আর্শীবাদ। আর এখন যদি দেখতে পেতো তুমি ডিম ভেজে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে ছেলেকে গরম গরম খেতে দিচ্ছো তাহলে কি বলতো সেটা ভেবেই আমার মনটা আনন্দ হচ্ছে। 'অভিনব মন' কী বল। এই যন্ত্রটা য়দি তোমার মাথায় ঠেকনো হয় তাহলে এই মুহূর্তে তুমি কী ভাবছো ধরা পড়বে। এতে অপরাধীদের ধরা খুব সহজ হবে, সমাজে অপরাধ প্রবণতা কমবে। কিন্ত তোদের এই যন্ত্রটা আমার ঠিক পছন্দ হল না। কেন মা? মনতো কল্পনার ডানায় ভর করে পারি দেয় দূর দেশে, যন্ত্র কী করে মনের খবর রাখবে। মনকে বোঝার ক্ষমতা থাকেনা। জানিস একসাথে অনেকদিন কাটানো মানুষগুলোও একে অপরের মনকে সঠিক করে বুঝতে পারে না। তাই তো সম্পর্কগুলো কেমন যেন এলোমোলো হয়ে যায়। মা ধরো তোমার কাছে যন্ত্রটা আছে, তোমার সম্পর্কে কোন মানুষ এরকম ভাবে তা যন্ত্রে ধরা পড়বে, তুমি মানুষ চিনে মিশবে। ওরে যন্ত্র দিয়ে মানুষ চিনবে কিরে তাহলে পরস্পর ভালোবাসার সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে। নাগো মা, তুমি এই ভাবে ভাবছো কেনো? কত বড়ো ধরনের বিপদ থেকে দেশ বাঁচবে। কিজানি, মনের খবর

রাখার যন্ত্র যদি আবিষ্কার হয় তাহলে মানুষের নিজস্বতা, শিল্পীসত্তা কমে হারিয়ে যাবে। সেটা কীরকম মা? পূর্ণিমার ভরা জোয়ারের উত্তাল সমুদ্র দেখা দৃশ্য সবার চোখে সমান ভাবে কি ধরা দেবে, শধু তাই নয় আমি কার সাথে সমুদ্র দেখছি সেটার উপর নির্ভর করে, দেখার দৃষ্টি বদলে যায়। তোদের যন্ত্রে সেটা ধরা পড়বে? আজকে আমি যে ঘটনাকে দেখলাম, যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করলাম, দশ বছর পর সেই আমি সেই ঘটনাকে অন্যরকম দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখলাম। তাই তোর যন্ত্র কীকরে মানুষের মন চিনে মানুষকে মিশতে সাহায্য করবে। মা বিজ্ঞান এগিয়ে চলে বিজ্ঞানের নিয়মে, 'অভিনব মন' এগিয়ে চলবে তার নিয়মে। তবে তুমি যেভাবে ভাবছো তা ঠিক, এই যে আমি এই যন্ত্র নিয়ে অনেকের সাথে কথা বলেছি তাদের মতামত আলাদা। হ্যাঁ ঠিকই তো, মন বলে কথা। মা তুমি অতো দুর থেকে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আমার কাছে পৌঁছে যেতে পারো আর আমার মাথায় হাত বুলিয়ে গল্প বলে ঘুম পারিয়ে দিয়ে ফিরে যেতে পারো এই রকম একটা যন্ত্র আবিষ্কার হলে কেমন হয়? খুব ভালো। আমাদের মতো মায়েরা তার অপেক্ষায় রয়েছে। দূর হয়ে উঠবে আরো কাছে, তারপর আরো কাছে, আরো কাছে।

পুরশুড়া, হুগলি

শ্যামপুর এম কে প্রাথমিক বিদ্যালয় (সহ শিক্ষিকা)

সূচিপত্র

রম্যরচনা:

দুর্নীতিযোগ

লি খে ছে ন – অ শো ক দা স চা র্বা ক



[শ্রী শ্রী গীতার উনিশতম অপ্রকাশিত অধ্যায়। রম্যরচনাটি ইতিহাসসিদ্ধ নয়, ধর্মশাস্ত্র পুরাণাদির মত সম্পূর্ণ কাল্পনিক একটি গণগুজব]

অত:পর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবভাষায় উবাচ - আরেএ, অর্জুন ইয়ার, তুমি দেখিতেছি মহা বুদ্বু! পুণ্যতীর্থ কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে অনুষ্ঠিতব্য দুর্নীতির কথা ভাবিয়া

তুমি অযথা সেন্টিমেন্টাল হইয়া পড়িতেছ! সিংহাসন দখলের ধর্মযুদ্ধে দুর্নীতি হইবেনা, ভোটে নেতাদের স্বেচ্ছাসেবী ফড়িয়ারা ছাপ্পাভোট মারিবেনা, সমাজবিরোধী মা মাটি মানবসেবীরা প্রক্সীভোট দিবেনা, চোরডাকাতেরা চুরি ডাকাতি করিবেনা, সাধুবাবারা বুজরুকি করিবেনা, জ্যোতিষীরা লোক ঠকাইবেনা, নেতা- মন্ত্রী চোরাকারবারীরা কালো টাকা জমাইবেনা, কালো কালো মা লক্ষীরা মেঝের তলায় লুকাইয়া, ব্যাঙ্ক বা সিন্ধুকে বন্দী হইয়া চাকুরীচোর,গরুচোর ইত্যাদী সমাজবিরোধীদের ঘর 'আলো করিবেনা' - ইহা কিরূপে সম্ভব। ভু ভারতে এসব অবাস্তব কথা কে কবে শুনিয়াছে,না দেখিয়েছে?

শোন বন্ধুবর, রাজাকে অবশ্যই দুর্নীতিগ্রস্থ হইতে হয়। চুরি ডাকাতি, খুন খারাবী, সমুদ্রমন্থণাদিতে প্রতারনা করিয়াই সত্যযুগে দেবত্বলাভ, দ্বাপরযুগে রাজত্বলাভ এবং কলিযুগে নেতাত্ব ও মন্ত্রীত্বলাভ করিতে হয়। যুগ অনুযায়ী ভক্ত, প্রজা বা ভোটারগণের পকেট কর্তন,প্রয়োজনে তাহাদের মস্তক ছেদন করিয়াই দেববিলাস,রাজবিলাস, মন্ত্রীবিলাস নেতাবিলাস ইত্যাদি করিতে হয়। রাজার সিংহাসনই বলো, মন্ত্রীর শৃগালাসনই বল, ডাকাত নেতাদের গুপ্তধনই বল - সবই দুর্নীতির ফসল। সেই চোরাই মালের বখরা লইয়া এই যে ধর্মযুদ্ধ ঘটিতে চলিয়াছে তাহারতো গোড়াতেই দুর্নীতি। কিন্তু জানিও যে এই দুর্নীতি ধর্মসম্মত এবং এ যুদ্ধ অবশ্যই আগামী

কলিকালের ভোটযুদ্ধের মত ধর্মযুদ্ধ। দুর্নীতি দুর্নীতি বলিয়া শোরগোল তুলিয়া এ যুদ্ধে বিরত হইলে তুমি মহাপাতকী হইবে। দেবতাগণ তোমাকে ত্যাজ্যপুত্র করিবেন, কেননা তাঁহারাও চোরাইমালের বখরার নৈবেদ্যলাভ কাটমানিলাভ করিয়া দেবতাগিরি,নেতাগিরি ইত্যাদি করেন। দেবনীতি, রাজনীতি,নেতানীতি, প্রজানীতি,ভোটারনীতি মানেই দুর্নীতি। ভবিষ্যত কলিকালের গণতান্ত্রীক রাষ্ট্রে বর্ণচোরা আপাত 'সৎ' (কেতনা ত্বক) ভোটারগণ দুর্নীতি করিবার সুযোগপ্রাপ্তির গোপন আশায়-অভিপ্রায়ে দুর্ণীতিগ্রস্ত দুর্নীতিঅভিজ্ঞ নেতা মন্ত্রীগণকেই ভোট দিয়া মন্ত্রী সিংহাসনে বসাইবেন। দুর্নীতি করিবার সুযোগ না পাইলে দলবদল করিবেন, অথবা নুতন দল ফ্লোট করিবেন। অতএব তুমি দুর্নীতি ত্যাগ করিওনা। মেকিয়াভেলী, চাণক্য ইত্যাদী আগামী দিনের রাজনীতি বিজ্ঞানীরা এই উপদেশ দিবেন বলিয়া আমার দিব্য চক্ষুতে দেখিতে পাইতেছি। দুর্নীতি করিতে করিতেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে গলা ফাটাইয়া বক্তৃতা দাও, টিভির তর্কসভায় গাল ফোলাইয়া, গলা ফাটাইয়া ঝগড়াকলহ কর, বিদ্বজনের সেমিনারে গুরুগম্ভীর বক্তৃতা দাও, ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। এই পবিত্র শঠতায় সরল পাবলিক বেশ গ্যাস খাইবে। চীৎকার চ্যাঁচামেচি কুরুচিকর গালমন্দ করিবার গণত্রান্ত্রিক অধিকার লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে। পেট খালি থাকিলেও মন ভরিবে। তাহারা সন্তুষ্ট থাকিয়া ক্রোধ প্রশমিত করিবে। তাহাদের সুগার প্রেসার কমিবে। তাহা বলিয়া পবিত্র

দুর্নীতিকে সমূলে পরিত্যাগ করিবে - ইহা কদাপি ধর্মসম্মত বাস্তবসম্মত নহে।

হে প্রিয়সখা, হস্তিনাপুরের রাজত্বে তোমাদের কোন আইনসম্মত অধিকার নাই। জুয়া খেলিয়া সবই খোয়াইয়াছ। অজ্ঞ লোকে বলিবে, সে তো কপট জুয়া - বেআইনী। কিন্তু হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ, বেআইনী চুরি,আইনসম্মত চুরি বলিয়া যেমন আলাদা কিছু হয়না, তেমনি জুয়া ইজ জুয়া, চুরি ইজ চুরি, আবার জুয়াচুরিও জোচ্চুরি, চাকুরীচুরি গরুচুরি, কয়লাচুরিও চুরি। জুয়া নীতিসম্মত না হইলেও ধর্মসম্মত। কপট জুয়াও জুয়া, সৎ জুয়াও জুয়া।খাঁটি মদও মদ, আবার ভেজাল চোলাইও মদ। স্বর্গের কারণবারীও মদ আবার সুইজারল্যান্ডের হুইস্কি বা রাশিয়ার ভোদকাও মদ। ভোটযুদ্ধে সরলমতি ভোটারকে আলফাল বোঝাইয়া, পঞ্চ বৎসর পূর্বের ভোটে দেওয়া তামাদী প্রতিশ্রুতিগুলি রিনিউ বা ঘুষ প্রদান করিয়া অথবা ছাপ্পা ভোট,বুথ দখল ইত্যাদী ন্যায়সঙ্গত শাস্ত্রসম্মত দুর্নীতির দ্বারা ভোটে জয়লাভ করাও জেতা। বোমা মারিয়া, ভয় দেখাইয়া জয়লাভ করাও জেতা। আবার কালো টাকার বিনিময়ে মীরজাফর এম এল এ, এম পি,কাউন্সিলার ইত্যাদী লাইভস্টক ক্রয় করিয়া দুর্নীতি করিবার অধিকার দখল করাও জেতা।

হে পাণ্ডবকুলতিলক, চিন্তা করিয়া দেখ, রাজত্ব খোয়াইয়াছ।এখন খাইবে কি করিয়া। রাজার সন্তান হইয়াতো আর কৃষিজীবী, গোপালক বা আমার মত

রাখালবালকদিগের মত খাটিয়া খাইতে পারনা। পূজনীয় দেবদেবী,সম্মানীয় যুদ্ধে হারা রাজা মন্ত্রী,ভোটে হারা মাননীয় নেতা মস্তানগন অনভ্যস্ত হস্তে হাপর টানিয়া বা লাঙ্গল চালাইয়া দেববিলাস, রাজবিলাস, নেতা বিলাস, মস্তানবিলাস করিবে - ইহা বিধিসম্মত নহে। সশস্ত্র ডাকাতির সাহায্যে অপরের রাজ্যের দখল লইয়া প্রজাশোষণ করিয়াই তোমাদের খাইতে হইবে।

ভগবান সঞ্জয় তখন অর্জুনের কানের কাছে আস্তে আস্তে বলিলেন,হে তৃতীয় পান্ডব, পরিকল্পনা ছিল কোনক্রমে পাঁচখানা গ্রামের দখল লইয়া ধীরে ধীরে পুরা রাজ্য দখল করিবে। সুঁচ হইয়া ঢুকিবে আর ফাল হইয়া বাহির হইবে। কিন্তু ধূর্ত কৌরবরা তোমাদের মতলব ধরিয়া ফেলিল। সে কারণে পাঁচখানা গ্রামের প্রজাশোষণের সামান্য বখরাও দিতে কৌরব পার্টি রাজি হইলনা। তোমাদর কারসাজি ফাঁস হইয়া গেল। অতএব এখন আর কোনো উপায় নাই। যেনতেন প্রকারেন যুদ্ধ জয় করিয়া পুরা রাজ্যের দখল লইতেই হইবে। এখন ন্যায় নীতির কথা কপচাইলে না খাইয়া মরিবে। তুমি শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ। অস্ত্রবলে বলীয়ান তুমি। তোমার তীরের ফলাই শক্তির উৎস। ন্যায়নীতি, আইনাদী দুর্বল অক্ষম এলেবেলে ভদ্রলোকেদের নিমিত্য সৃষ্টি হইয়াছে, তোমার মত বীরের জন্য নহে। দুর্নীতি দর্শনে গেল গেল রব তুলিয়া বিচলিত হওয়া তোমার শোভা বর্ধন করেনা। প্রয়োজন হইলে

তিনশো ছাপ্পান্ন বা ইমার্জেন্সি জারি করিয়া ন্যায়ধর্মের ভন্ডামীটাও মন-গাত্র হইতে ঝাড়িয়া ফেল। পবিত্র ভারতভূমিতে সনাতন দুর্নীতিধর্ম পালন কর। এই দুর্নীতিধর্ম রক্ষা করিতে আমি যুগে যুগে আবির্ভুত হই। আমিই সব কৰিব। তুমি সরকারী আমলা রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির রবারস্ট্যাম্পের মত নিমিত্তমাত্র।

হে মহামতি অর্জুন, আমার বাম চক্ষুর দিকে তোমার চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া অতীতের ইতিহাস প্রতক্ষ কর। কি দেখতেছ?অবতারগণের শ্রেষ্ঠ মডেল মাননীয় রামচন্দ্রও রাজত্ব হারানোর আশঙ্কায় দুর্নীতির আশ্রয় লইতেছেন।পাবলিকের নো কনফিডেন্স মোশানের ভয়ে ভীত হইয়া সরলমতি পত্নীর সহিত চারশোবিশ করিয়া বেচারাকে বাড়িছাড়া করিতেছেন। দুষ্ট চক্রীদের ছড়ানো কেচ্ছা গুজব সম্পূর্ণ মিথ্যা বুঝিয়াও তাঁহার পতিব্রতা সতীকে বিনা অপরাধে অত্যন্ত বেআইনিভাবে চক্রান্ত করিয়া তালাক দিতেছেন। ভাই লক্ষণের সাথে ষড়যন্ত্র করিয়া সরলমতি রাজরাণীকে তাঁহার অজান্তে বনবাসে পাঠাইতেছেন।প্রাপ্য খোরপোষও দিতেছেননা। অসহায় অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী মরিল কি বাঁচিল সে সংবাদও লইলেননা। স্ত্রী পুত্রদের কথা বেমালুম ভুলিয়া রাজবিলাসে গা ভাসাইতেছেন। এমনকি এই আদর্শ অবতার নিজ স্ত্রীকে আত্মহত্যা করিতে পর্যন্ত প্ররোচিত করিতেছেন। তথাপি ধর্মপ্রাণ ভারতবাসীগণ তাঁহাকে হৃদয়হীন দুর্নীতিগ্রস্থ

অপবাদ দিয়া গালমন্দ করিলনা। রাজপদ পরিত্যাগ করার দাবীতে প্রজাগণ বন্ধ হরতালও ডাকিলনা, সীতাও ৪৯৮এ করিলনা, সি বি আইও রামের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিলনা। উপরন্তু আজও তাঁহাকে তাঁহারা মাথায় তুলিয়া পূজা করিতেছেন, তাঁহার আঁতুড়ঘরের দখল লইতে মারামারি কাটাকাটি, দাঙ্গা হাঙ্গামা, কোর্ট কাচারী করিতেছেন। ভবিষ্যতের কলিকালেও দেশবাসীর হৃদয়ে তিনি আদর্শ রাজা,আদর্শ স্বামী, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ শাসক হিসাবে বিরাজ করিবেন। তাঁহার সেই সনাতন আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নরকভীরু দেবভীরু মহান ভারতবাসীগন বধূহত্যা, বন্ধুহত্যা,ম্লেচ্ছহত্যা, পরধর্মীহত্যা, হরিজনহত্যা, নাস্তিকহত্যা ভিন্নমতবাদীহত্যা ইত্যাদী পুণ্যকর্ম করিতে উদ্বুদ্ধ হইবেন। কলিকালের উচ্চতম দেশশাসকেরাও সতী গৃহবধূকে ভরনপোষণতো দূরের কথা, নিজ ঘরে প্রবেশ করিতে পর্যন্ত অনুমতি দিবেননা। তাঁহার আধ্যাত্বিক আদর্শ ভারতভূমিতে জাতীয় আদর্শে পরিণত হইবে। সেই আদর্শ অনুকরন করিয়া সে দেশে কলিকালের ভবিষ্যতকালে পুনরায় রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। জয় রামসীয়ারামকি।

হে মহাধানুকী, আমি ত্রিকালজ্ঞ। তুমি আমার এক চক্ষুতে অতীতের দৃশ্যের প্রতিফলন দেখিতে পাইবে। আবার আমার অপর চক্ষুতে ভবিষ্যতের দৃশ্যের প্রতিফলন দেখিতে পাইবে। এইবার বল তুমি কি দেখিতেছ? তুমি দেখিতেছ এই আদর্শ পুরুষ মনুকৃত

ন্যায়নীতিহীন আইন পূতিগন্ধময় শাস্ত্র অনুযায়ী কিভাবে শম্বুকবধ করিতেছেন। রাস্তায় গড়াগড়ি খাওয়া রক্তাক্ত শম্বুকমুন্ড দেখিয়া অমানুষ দেবতাগণ আনন্দনৃত্য করিতে করিতে হত্যাকারীর মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন। কেননা দুর্নীতিই পরম ধর্ম। মহামতি রামচন্দ্র সেই মহান ধর্ম রক্ষা করিলেন। পাপী শম্বুক নিম্নশ্রেণীর ঘৃণ্য জাতির সন্তান হইয়াও জ্ঞানার্জনের জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল। এই অভিপ্রায় ধর্মবিরোধী পাপকর্ম। ইহাতে স্বর্গের দেবতাগণ লজ্জিত হইতেছিলেন। পৃথিবী পাপে ভরিয়া যাইতেছিল। মহামতি রামচন্দ্র শূকরবৎ নিম্নজাতির শুম্বককে খুন করিয়া দুর্নীতিধর্ম রক্ষা করিলেন। তিনি ধন্য, তিনি আদর্শ পুরুষ। তিনি পুরুষোত্তম। সে কারণে পিতৃপুরুষের হত্যাকারীকে পূজা করিবার অধিকার পাইবার জন্য শম্বুকের বংশধর নিচু জাতির ভবিষ্যতের মানুষেরা আন্দোলন করিতেছেন। পিতৃহত্যাকারীকে পূজা করিবার অধিকার জয় করিয়া আনন্দে ডগমগ হইতেছেন।

হে তথাকথিত তৃতীয় পান্ডব! দুর্নীতি সর্বত্র। অধিক আর কি বলিব, তোমার জন্মেও দুর্নীতি। তোমরা কুন্তীপুত্র, মাদ্রিপুত্র বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া সন্তান প্রজননে অক্ষম পান্ডুর ঔরসে তোমাদের জন্ম হয় নাই। তোমরা কদাপি পাণ্ডব নও। রাজত্বের দাবী ন্যায়সঙ্গত করিবার নিমিত্বে ঘুরপথে তোমাদের পাণ্ডবপুত্র সাজানো হইয়াছে মাত্র।

হে শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ, আবার বিবেচনা কর, চন্দ্রদেবকে ব্যভিচারী,ইন্দ্রদেবকে লম্পট, অথবা ব্রহ্মাকে নিজকন্যাগামী দুর্নীতিপরায়ণ আখ্যা দিয়া কেহ ঘৃণা করেনা। আমার নিজস্ব পরনারীগামী পরকীয়া লীলাও ধর্মীয় ব্যাখ্যা টিকাটিপ্পনীর ছলচাতুরীতে ধর্মসিদ্ধ ও কালে কালে আদালত দ্বারা আইনসঙ্গতও হইয়াছে। আমার শত শত নারীলীলার উপাখ্যানের বর্ণনাকীর্তন করিতে করিতে আমার ভক্তগণ দু হাত তুলিয়া নাচিতে নাচিতে, বাতাসা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে, আবীর মাখিতে মাখিতে, চক্ষের জলে বুক ভাসাইতে ভাসাইতে নগর কীর্তন করিয়া পুণ্যলাভ করিতেছে। নির্জন কুঞ্জবনে ডজন ডজন গোপিনীদের সাথে ফষ্টিনষ্টি করিতে সচক্ষে দেখিয়াও নীতিপুলিশগণ আমাকে কান ধরিয়া উঠবস না করাইয়া আমাকে পূজা করিতে লাগিল। এইরূপে কলিকালে দেবতা সমান নেতাগণের ভোটচুরি,মন্ত্রীত্ব চুরি,চাকুরী চুরি, পুকুর চুরি, গুরুবাবাদের জোচ্চুরী প্রভৃতি দুর্নীতির অকাট্য প্রমান পাইয়াও ভোটারগণ সেই দুর্নীতিগ্রস্থ নেতাদের ভোট দিয়া গলায় মালা পরাইয়া তাহাদের শোষকগদিতে বসাইবে। গুরুবাবাদের শিষ্যরা জেলখানাবাসী মহামান্য ধর্ষক গুরুবাবাদের ভেট দিবে, তাহাদের পূজা করিবে। কেননা দুর্নীতিপরায়ণ প্রশাসকরাই তাহাদের দুর্নীতি করিবার সুযোগ করিয়া দিবে।

হে কৃষ্ণসখা, আমার বাক্য মন দিয়া শ্রবন কর। পবিত্র দুর্নীতি নারায়ণের অংশ। দুর্নীতিই ব্রহ্ম। কি স্বর্গে, কি মর্ত্যে, কি সত্যযুগে, কি কলিযুগে, ইস্কুলে,কলেজে, হাসপাতালে, অফিস আদালতে,দেবস্থানে গোরস্থানে - দুর্নীতি সর্বত্র সদা বিরাজমান। প্রাকৃতিক মানবধর্ম ছাড়া বাকি সমস্ত মনুষ্যসৃষ্ট কৃত্রিম ধর্ম, ধর্মীয় শাস্ত্র, ধর্মীয় প্রথা ও নিয়মকানুনে দুর্নীতি প্রচ্ছন্ন। ধর্ম ও ঈশ্বরের জন্মও মিথ্যার গর্ভে, দুর্নীতির ঔরসে। একথা জানিও যে when rationality ends, religion begins. প্রতিনিয়ত নুতন জ্ঞান অর্জনের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় যুক্তিবাদী জ্ঞানের সীমানা যে স্থানে শেষ হয়, সেই স্থানে ধর্মের উৎপত্তি হয়। ঝড় বৃষ্টি বন্যা গ্রহণ ইত্যাদির যথাযথ প্রাকৃতিক কারণ না জানা থাকায় চতুর অসৎ দূর্নীতিগ্রস্থ মুনি ঋষিরা পবনদেব-বরুণদেব, রাহু-কেতু ইত্যাদীর মিথ্যা গল্পগুজব ফাঁদিয়া প্রচার করিয়া নিজ নিজ অজ্ঞতা গোপন করিয়াছেন এবং করিতেছেন। আর সরলমতি দৈবভীত ভক্তগণ প্রকৃতিদত্ত চিন্তনশক্তিকে নিশ্চল করিয়া সেই গুজবগুলিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। অতএব হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ, তুমি ধর্ম রক্ষার্থে দুর্নীতি করিতে বিচলিত হইওনা।

নেতা দেবতাদের পেটে টোকা মারিলে দুর্নীতির দুর্গন্ধে পৃথিবী ভরিয়া যাইবে। রাজা-দেবতাগন মানবের শ্রদ্ধাভক্তি হারাইয়া কাটমানি নৈবেদ্যাদিবঞ্চিত

হইবে। অসিযুদ্ধ অথবা ভোটযুদ্ধের পরে দেশে রাজা মন্ত্রীর পরিবর্তন হয়। কিন্তু নুতন গদিতে বসা নেতা পুরানো নেতামন্ত্রীকৃত দুর্নীতি ধরাইয়া দিবার ভয় দেখাইলেও কিভাবে আইনের কানাগলির আড়ালে ও মহামান্য আদালতের অসহায়তার সুযোগে সেসব দুর্নীতি ধামাচাপা দিতেছেন তাহা প্রত্যক্ষ কর। তাঁহারা দূর্ণীতিগ্রস্থ তাঁহাদের সহধর্মী পূর্ববর্তী নেতামন্ত্রীদের শাস্তিপ্রদান করিতেছেননা। বন্দী পুরুরাজ যেমন আলেকজান্ডারের নিকট রাজার অনুরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করিতেছেন, দুর্নীতিগ্রস্থ প্রাক্তন নেতা মন্ত্রীরা কলিযুগে তেমনি সমসাময়িক নেতামন্ত্রীদের নিকট অনুরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করিতেছেন। বর্তমানের দুর্নীতিগ্রস্থ প্রশাসক পূর্ববর্তী প্রশাসকদের দুর্নীতির শাস্তিবিধান করিতেছেননা।

হে মহামতি অর্জুন, আমি ত্রিকালজ্ঞ। এবার তুমি আমার দক্ষিণ চক্ষুর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ভবিষ্যৎ অবলোকন করিতে থাক। ঐ যে শ্বেতপাথরের দেবতাবাসটি দেখিতেছ, মঠ মন্দির দেখিতেছ - ওগুলি কিভাবে নির্মিত হইয়াছে? হাজার হাজার ক্রীতদাসের রক্তে, তাহাদের শ্রমে, তাহাদের ঘামে দুর্নীতিগ্রস্থ দেবগন স্বর্গলোভ দেখাইয়া, ক্যাডার ভক্ত নিয়োগ করিয়া তাহাদের বিলাসভবন বানিয়াছেন। ফলস্বরূপ মানবসন্তানগন অনাহারে অপুষ্টিতে মরিয়াছে। কোনারকমন্দির গড়িবার ফলে দশ বৎসরকালব্যাপী দুর্বিক্ষে লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষ

প্রাণ হারাইয়াছে। যখন ঝড় বৃষ্টি রৌদ্রে অমৃতস্য পুত্র মানবসন্তানগন মাথার উপর সামান্য আচ্ছাদন পাইতেছেনা,তখন দুর্নীতিগ্রস্থ দেবগন মানবের সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া কিভাবে মন্দিরবিলাস অট্টালিকাবিলাস করিতেছেন তাহা প্রত্যক্ষ কর। কিন্তু ইহাও জানিও যে, এই দুর্নীতি অন্যায় হইলেও ধর্মসম্মত। ভবিষ্যতের নেতা মন্ত্রীগণ এইভাবে রাজভবনবিলাস, পাঁচতারা হোটেলবিলাস,রিসর্টবিলাস করিবার জন্য জনগণের নিকট তোল্লা কাটমনি আদায় করিবে। And these corrupted Brutases are honourable men. এবং এরূপ পাপকর্ম ধর্মসম্মত।

হে পার্থ! চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখ। যখন অমৃততস্য পুত্র মানবসন্তানেরা অনাহারে মরিতেছে, তখন দুর্নীতিগ্রস্থ দেবগন তাঁহাদের সহযোগী নেতা মন্ত্রী আমলা গুরুবাবা পুরোহিতগন কিভাবে বিলাসবৈভবে অলস দিনপাত করিতে করিতে লীলা করিতেছেন, কিভাবে দেবদাসী,পুরনারীদের সহিত ফস্টিনস্টি করিতেছেন। কিভাবে তাঁহারা ধূপধুনা,পুষ্পচন্দনাদি বিলাসদ্রব্যের সৌরভ সেবন করিতেছেন, কিভাবে বলির পশু,এমন কি মানব রক্ত পান করিয়া জিহ্বা মুখমন্ডল রক্তরঙে রঞ্জিত করিয়া অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের ভয় দেখাইয়া টেররাইজড করিতেছেন। কিভাবে অসহায় ফুলগুলির বৃন্তচ্চুত মৃতদেহ অঙ্গে ধারণ করিয়া নিজ নিজ অঙ্গশোভা বৃদ্ধি করিতেছেন।

সঞ্জয় আরও উবাচ,আমি ত্রিকালজ্ঞ। সুদূর ভবিষ্যতে কি ঘটিতেছে তাহা আমি আমার দিব্যদৃষ্টিতে অবলোকন করিতেছি। পুরাকালের ঘটনাবলীও আমার নয়নে কলিকালের টিভির ছবির মত ফুটিয়া উঠিতেছে। আমার চোক্ষুদ্বয়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কলিযুগের বিস্বরূপ দর্শন কর।

অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কমললোচনের দিকে চক্ষু রাখিয়া শ্রীমান অর্জুন বলিলেন, সবুজ,গেরুয়া, সাদা নানা রঙের, নানা ধর্মের নানা ভগবানগণ তাঁহাদের প্রতিপক্ষ ভাগবানদের ভক্তদের ভাড়াটে গুন্ডার দ্বারা গুপ্তহত্যার ফতোয়া জারি করিতেছেন। মন্ত্রীরা গবাদি পশুদের যাবনা চুরি করিয়া উদরপুরণ করিতেছেন,কিভাবে গণেশজী মহারাজ শিশুদের দুগ্ধ চুরি করিয়া উদর স্ফীততর করিতেছেন, কিভাবে অপুষ্ট শত শত শিশুদের অনাহারে রাখিয়া তাহাদের দুগ্ধে লিঙ্গ শোধন করিতেছেন, কিভাবে পূজা লইবার ছলে ভক্তদের দেবস্থানে আমন্ত্রণ করিয়া পূজারত ভক্তগণকে কখনো জলে ডুবাইয়া, কখনো আগুনে পোড়াইয়া, কখনো পদপিষ্ট করিয়া, এমনকি পবিত্র শিন্নিতে বিষ মিশাইয়া গণহত্যা করিতেছেন। চিড়িয়াখানার বিশ্বাসঘাতক শেরওয়ালীমাতা সরলমতি গুজববিস্বাসী ভক্তের ঘাড় মটকাইয়া তাহার রক্ত পান করিতেছেন, নানা ধর্মের ভগবানভাইগন নরকের ভয় ও স্বর্গলাভের লোভ দেখাইয়া ভীরু,দুর্বল মনুষ্যদের

নৈবেদ্য শোষণ করিতেছেন। প্যারিস, নিউইয়র্ক,বালিতে নির্বোধ ধর্মোদ্মাদ ধার্মিকদের দ্বারা গণখুন করাইতেছেন। স্বর্গীয় শুঁড়িখানায় বিনাপয়সায় কারণবারি বিলাসব্যাসন, বেহেস্ত /স্বর্গের ফ্রী পৌনপৌনিক গণিকাভোগের লোভ দেখাইয়া টুইন টাওয়ার,তাজ হোটেলে গণহত্যায় প্ররোচিত করিতেছেন। আর দুর্নীতিগ্রস্থ পরজীবী পুরুত মোল্লা যাজকদের দক্ষিণা / কমিশন লুণ্ঠন করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

আরো দেখিতে পাইতেছি কলিযুগের দেবদেবীগণ ধর্মে দুর্বৃত্তায়ন করিতেছেন। নিজ নিজ ঘরবাড়ি, প্রভাব প্রতিপত্তি, জমি জায়গা দখল ও রক্ষার্থে বিভিন্ন সাম্রদায়ের ভগবানগন পরস্পর নিজেদের মধ্যে লাঠালাঠি মারামারি করিতেছেন। নিজ নিজ পার্টি ক্যাডার নিয়োগ করিয়া এক ভগবান অন্য প্রতিযোগী ভগবানদের ঘরবাড়ী আঁতুরঘর ভাঙিতেছেন, রাস্তাঘাট ফুটপাথ পাবলিকসম্পত্তি জবরদখল করিতেছেন, প্রতিপক্ষ ভগবানের সমর্থক ভক্তদের খুন কারাইতেছেন, ধর্মীয় রায়ট বাধাইতেছেন। দেবদেবীরা রাজা নেতামন্ত্রীদের মত গুন্ডা মস্তান পুষিতেছেন, দেবদেবীসেনা মারফত বারোয়ারী পূজা চাঁদা তোলা আদায় করিতেছেন। দুর্নীতিতে মদত দিতেছেন। কেননা দুর্নীতিই ধর্মের প্রাণস্বরূপ।

সঞ্জয় বলিলেন, বেশ বেশ, আরো দর্শন কর। আমার বাম চক্ষুর দিকে তোমার দৃষ্টি ফিরাইয়া দ্বিতীয় চ্যানেলের ছবি দেখ। কি দেখিতেছ?

অর্জুন বলিলেন,দেখিতে পাইতেছি দেবদেবীদের বিচারব্যবস্থা। এক লালচাঁদ লালচাঁদ ঝুনঝুনওয়ালা - সারাজীবন চোরাকারবারী করিল, সিমেন্টে গঙ্গামাটি মিশাইল, ওষুধে ভেজাল দিয়া গণহত্যা করিল, দেনা না মিটাইয়া ব্যাংকের টাকা আত্মস্যাৎ করিল। সে থানার আর মন্দিরের দেবতাগণের বামহস্তে প্রচুর ঘুষ প্রদান করিতে থাকিল। সেই মহাপাপী দেবদেবীদের নামে সিন্নিপার্টি দিল, অষ্টপ্রহর নামকীর্তন করিয়া দেবদেবীদের চাটুকারিতা করিল। গঙ্গাসাগরে ডুব দিয়া, সাগরমন্দিরের দেবতা/পুরুতদের চোরাই সোনাদানা, কালো টাকা ইত্যাদী উৎকোচ প্রদান করিয়া তাহার সমস্ত পাপ সমুদ্রজলে ধুইয়া ফেলিল। দেবতাদের সমর্থনে নগরকীর্তন, মিটিং মিছিল করিতে লাগিল। দেবতাদের বিলাসের জন্য শ্বেতপাথরের মন্দির বানাইয়া দিল। দূর্ণীতিগ্রস্থ দেবদেবীরা পাপী লালচাঁদের পাপপুণ্যের লেজার একাউন্ট বেআইনিভাবে পাল্টাইয়া ফেলিলেন। পূজা, চাটুকারিতা,নৈবেদ্য-উৎকোচের বিনিময়ে তাহার সমস্ত পাপকার্য ধামাচাপা দিয়া দিলেন। চুরি দুর্নীতির সমস্ত প্রমান লোপাট হইল, চিত্রগুপ্ত কেরানীর লেজার পাতা অদৃশ্য হইল। প্রমাণাভাবে স্বর্গীয় সি বি আই, স্বর্গীয় আদালত কিছুই করিতে পারিলনা।

মহামতি অর্জুন তখন এরূপ ধর্মীয় অনাচার দর্শন আর সহ্য করিতে পারিলেননা। প্রবল উত্তেজনায় তাহার চক্ষুদ্বয় নিমীলিত করিয়া ফেলিলেন। শরীর এলাইয়া অশ্বসকটের সিটে শুইয়া পড়িলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে কোনোরকমে নিজ বক্ষে আকর্ষণ করিয়া প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, " হে প্রিয়সখা, চক্ষু উন্মোচন কর। দেবতাদের দুর্নীতি দর্শন করিয়া তুমি এরূপ উতলা হইওনা। নৈবেদ্য ঘুষ প্রদান ধর্মবিরুদ্ধ নহে। পূজাপাঠ,নৈবেদ্যপ্রদান ইত্যাদির দ্বারা পাপ ধামাচাপা দিয়া আখের গোছানো অনৈতিক বা অধর্মীয় কার্য্য নহে। বরং ইহাই ধর্মপালন, ধর্মীয় অভিনয়ের আসল উদ্দেশ্য। পাপী লালচাঁদ চরম দূর্ণীতিগ্রস্থ হইলেও সে ঈস্বরভীরু ধর্মপ্রাণ মানুষ। দেবতা,রাজা,নেতা মন্ত্রীদের উৎকোচ প্রদান,ভজন কীর্তন, যাগযজ্ঞ ইত্যাদী কুকর্ম হইলেও ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী সৎকর্ম। ইহাতে পুন্য জন্মে, এবং সেই পুণ্যে মনুষ্যকৃত সমস্ত দুস্কর্মের শাস্তি মকুব হইয়া যায়। মৃত্যুর পরে নরকে যাইতে হয়না। ইহাই সত্য। তুমি তোমার চক্ষু উন্মোচন করিয়া সত্যদর্শন কর। সত্যকে স্বীকার করিয়া চিত্ত শান্ত কর। বল সখা, এইবার তুমি কি দেখিতেছ?

- আমি দেখিতে পাইতেছি মৃত পাপীদের পুত্রকন্যাগন পিতামাতার পাপপুণ্যের লেজার-বালান্সশিট উল্টাপাল্টা করিবার অভিপ্রায়ে পিতামাতার শ্রাদ্ধশান্তি করিতেছে। তাহারা পুরহিত টাউটের থ্রু দিয়া নানা দান-

ভেট -উৎকোচাদি দেবতাদের হস্তে প্রদান করিয়া মহাপাপী পিতামাতার সমস্ত অনাচার,দুস্কর্মজাত পাপ ব্যাকডোরে মকুব করাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেছে। দুর্নীতিগ্রস্থ দেবদেবীগণ উৎকোচের বিনিময়ে পাপীদের নরকের জেলখানায় না পাঠাইয়া স্বর্গরাজ্যের ভিসা মঞ্জুর করিতেছেন। তাহারা তাহাদের আজীবনকৃত দুস্কর্ম পাপের প্রাপ্য শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাইতেছে।

অর্জুন আরো বলিলেন,হে পার্থসারথী! আপনার কৃপায় আমি দ্বিব্যদৃষ্টি লাভ করিতেছি। সুদূর ভবিষ্যতের দৃশ্য আমার চক্ষুতে প্রতীয়মান হইতেছে। আমি স্পষ্ট দেখিতেছি যে ধর্মীয় চাটুকারিতা নৈবেদ্য পূজা ইত্যাদীর বিনিময়ে দেবদেবীগণ মন্ত্রী আমলাদের মত তাঁহাদের পছন্দমত ভক্তগনকে নানা সুযোগ পাওয়াইয়া দিতেছে। পূজা দিলনা বলিয়া যোগ্য বেকার চাকুরী পাইলনা, গ্যাসের ডিলারশিপ, মদের দোকানের লাইসেন্স পাইলনা, অথচ অযোগ্য,অশিক্ষিত দুশ্চরিত্র ব্যক্তি পূজাপাঠ, জাগযোগ, উৎকোচ প্রদান করিয়া দেবতাদের বেআইনীভাবে সবই বাগাইয়া লইল। অশিক্ষিত শিক্ষকগণ স্কুলে শিক্ষাদান করিতে লাগিল। অযোগ্যরা চাকুরী চুরি করিল, যোগ্যরা রাস্তায় বসিল।

আরো দেখিতেছি যে ভোটফান্ড নেতাফান্ড ইত্যাদিতে তোল্লা প্রদান করিয়া দূর্ণীতিগ্রস্তরা পার পাইয়া যাইতেছে, খুনির শাস্তি মকুব হইয়া

যাইতেছে,রাজারহাট,সল্টলেকে জমি পাইয়া যাইতেছে। প্রাসাদবাসীরা গৃহহীনদের প্রাপ্য অনুদানের অর্থ আত্মস্যাৎ করিতেছে।

তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রবল আনন্দে হাততালি দিয়া বলিয়া উঠিলেন, " সাবাস অর্জুন ইয়ার, সাবাস। তোমার বিশ্বদর্শন সম্পূর্ণ হইয়াছে। আর সময় নাই, আমার শেষ কথা শ্রাবন কর। দুর্নীতি অবশ্যই অন্যায় এবং খারাপ কর্ম, কিন্তু ইহা কদাপি পাপকর্ম নহে। অধর্মও নহে। বরং দুর্নীতি ব্যতিরেকে স্বর্গলাভ, রাজ্যত্বলাভ, মন্ত্রিত্ব, নেতৃত্বলাভ অসম্ভব। তুমি ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তুন হইতে বান তুলিয়া লও। বক্তৃতামঞ্চে, সংবাদ মাধ্যমে, টিভির তর্কসভায় ভোটনেতাদের অসভ্য বাক্যবান নিক্ষেপের মত তুমিও শত্রুর দিকে বান ছুঁড়িতে শুরু কর। শঠতাবলে, চাতুর্য্যবলে, বুদ্ধিবলে, ছলনাবলে, বাহুবলে,,আইনের অপব্যাখ্যাবলে রাজত্ব ছিনাইয়া লও।

কুরুক্ষত্রের এই ধর্মযুদ্ধ যুগে যুগে চিরকাল দুর্নীতিগ্রস্থ ধার্মিকদের পথ দেখাইবে। গীতার এই সর্বশেষ অধ্যায় ভক্তিভরে পাঠ করিয়া ধর্মপ্রাণ জনগণ একাধারে দুর্নীতিধর্ম পালন করিতে উদ্বুদ্ধ হইবে, অন্যধারে পূজাপাঠ, নৈবেদ্যঘুষ প্রদানে প্ররোচিত হইবে। উত্তরোত্তর দুর্নীতিধর্ম জনপ্রিয় হইবে, সাথে সাথে জবর দখল করিয়া দেবদেবীগণ শিশুদের খেলার মাঠ, জনসাধারণের চলার পথ জবরদখল করিয়া প্রনামীর বাক্সভ্রাইবেন।

অতএব হে কৃষ্ণসখা, জানিয়া রাখিও - নিষ্ঠাভরে দুর্নীতিধর্ম পালন করা, দুর্নীতিধর্ম প্রচার করা এবং মানুষকে দুর্নীতিগ্রস্থ রাখা, তাহাদের দুর্নীতিগ্রস্থ হইতে বাধ্য করা সত্যযুগে দেবধর্ম,দ্বাপরযুগে রাজধর্ম ও কলিযুগে নেতাধর্ম। ইহাই সনাতন মৌলবাদী ধর্মের সার কথা - গীতার সারমর্ম। যেদিন মানুষ পবিত্র দুর্নীতিধর্ম ত্যাগ করিবে সেদিন পৃথিবী পাপে পূর্ন হইবে। দেবতাগিরি,রাজাগিরি, পুরুতগিরি, গুরুবাবাগিরি সমস্ত বৃত্তি ধরাধাম হইতে অবলুপ্ত হইবে। সেই ভয়ঙ্কর দিনে দেবতা, রাজা, নেতা ফড়েদের খাটিয়া খাইতে হইবে।

সুতরাং হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! তুমি ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। দেব দ্বিজ,রাজা মন্ত্রী, নেতা শোষকদের পবিত্র দুর্নীতি ধর্মের পথ দেখাও। তাহারা দূর্ণীতিগ্রস্থ ধার্মিক হউক।

অতঃপর কুরুক্ষত্রের যুদ্ধ শুরু হইল। নব নব যুগে, নব নব রূপে সে যুদ্ধ আজও চলিতেছে। ওং তৎসত - আমেন -

প্রথম প্রকাশ: ' অনির্বান ' শারদীয় সংখ্যা ১৪০৬ / ১৯৯৯

দ্বিতীয় প্রকাশ: চার্বাক রচনাবলী ২০১৬ (সামান্য সংযোজিত)

সমালোচনা ও ত্রুটিনির্ধারণ: asokdas.godless@gmail.com

সূচিপত্র

নাটক:

আপনি ভুল দেখেছেন

র চ না – অ নু প চ ক্র ব র্তী



চরিত্র: অর্ণব। সুনীল (অর্ণবের বাবা)। অনিল (অর্ণবের কাকা)। তপতী (অর্ণবের মা)। সোমা। রথীন দত্ত। মৌসুমী, তাপস ও প্রশান্ত ওসি। সাবইন্সপেক্টর। প্রথম পুলিশ। দ্বিতীয় পুলিশ।

।। প্রথম দৃশ্য।।

(অর্ণবদের বাইরের বসার ঘর। অর্ণব, অর্ণবের বাবা আর কাকা গুম হয়ে বসে বা দাঁড়িয়ে বসে আছে। অর্ণবের মা ফুঁপিয়ে কেঁদে চলেছে। রাত ন'টা হবে। সোমা বাইরে থেকে দ্রুত আসে।)

সোমা: কী হয়েছে অর্ণব? কী সমস্যা হয়েছে যে ওভাবে মেসেজ করে এখনি আসতে বললে? একি? তোমরা সবাই এরকম গুম মেরে আছো কেন? তুমি কাকু কাকিমা ছোটকাকু? কি হয়েছে তোমাদের? এ'কি কাকিমা? আপনি কাঁদছেন কেন?

অনিল: আমি বলছি সোমা।

সোমা: হ্যাঁ। বলুন ছোটকাকু। কী হয়েছে?

অনিল: কিছুক্ষণ আগে আমার এই দাদাটি চিলেকোঠায় গলায় দড়ি দিতে গেছিলো।

সোমা: সেকি!

অনিল: আমি হঠাৎ গিয়ে পড়ায় ও সেটা করতে পারেনি।

সোমা: সেকি! কেন? (সুনীল বাবু হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেন। অর্ণবের মাও। এমনকি অর্ণবও।) একি! কী ব্যাপার? সবাই মিলে এভাবে ভেঙে পড়ছেন কেন? অর্ণব, তুমিও এইভাবে ভেঙে পড়ছ কেন? কী হয়েছে? কেন কাকু এরকম করতে গেলেন?

অনিল: আমি বলছি তোমাকে সোমা। অর্ণবের চাকরি চলে গেছে।

সোমা: সেকি! কেন?

অনিল: হাইকোর্টের অর্ডারে।

সোমা: কেন?

অনিল: তুমি জানো না কয়েকটিদিন ধরে হাইকোর্ট কি অর্ডার করে চলেছে। কয়েকদিন ধরে কয়েকশো জন প্রাইমারি টিচারের চাকরি চলে গেছে। আজকেও অনেকের চাকরি চলে গেছে। তার মধ্যে অর্ণবও একজন।

সোমা: কেন অর্ণব? তুমি তো চাকরির পরীক্ষায় পাশ করে চাকরি পেয়েছিলে। (ডুকরে কেঁদে ওঠে অর্নব)

অনিল: না সোমা।

সোমা: তার মানে?

অনিল: সে বড় লজ্জার কথা সোমা। যারা চাকরির পরীক্ষায় ফেল করে দালালদের ঘুষ দিয়ে চাকরিতে ঢুকেছিল, হাইকোর্ট তাদের ধরে ফেলে একে একে বরখাস্ত করেছে। আজ জানা গেছে অর্নবও তাদের মধ্যে একজন। আমি অর্ণবেরও এরকম ব্যাপার জানতাম না। একটু আগে সব শুনলাম।

সুনীল: সোমা, জমানো শেষ সঞ্চয় দশ লাখ টাকা দালালকে দিয়েছিলাম ওর চাকরির জন্য। ওর বোনের বিয়েতে আগেই পনেরো লাখ টাকা খরচ হয়েছিল। শেষ সঞ্চয়টা দিয়ে দিয়েছিলাম দালালকে। কেননা তুমি জানো না আমি বিএসএনএলের স্টাফ হলেও গত দু বছর কোন মাইনে

পাইনি। কোনোদিন পাবো বলে মনে হয় না। বরং একেবারে তাডিয়ে দেবে হয়তো কিছুদিন পরে। সংসারের খরচ চলত অনেক কষ্ট করে অর্ণবেরই টিউশনির টাকায়। তাই বাঁচার জন্য অর্ণবের চাকরির জন্য দালালকে দশ লাখ টাকা ঘুষ দিয়েছিলাম।

অনিল: অন্যায় করেছিলে।

সুনীল: তুই আমাকে এরকম বলছিস! এইসময়ে! একটু আগে মরতে যাচ্ছিলাম। তুই নিজেই বাঁচালি।

অনিল: তবুও বলছি দাদা খুব অন্যায় করেছিলে। চাকরির পরীক্ষায় ফেল করে ঘুষ দিয়ে যারা চাকরি পেয়েছিল তারা তো ঐ পরীক্ষায় পাশ করা ক্যান্ডিডেটদের চাকরিটা দখল করেছিল। এটা অন্যায় নয়?

সুনীল: আর আমার যে বছরের পর বছর মাইনে বন্ধ করে দিল কেন্দ্রীয় সরকার সেটা অন্যায় নয়?

অনিল: সেটাও ঘোরতর অন্যায়। সেটাও ক্রাইম। এটাও ক্রাইম।

অর্ণব: আমার এছাড়া কী করার ছিল? আমি তো অনেক রকম চাকরির পরীক্ষা আর ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম বছরের পর বছর। চাকরি না পেলে কী করব?

অনিল: হকারি করবি আমার মতো। আমি লেখাপড়ায় ভালো ছিলাম না। চাকরি পাইনি। তাই হকারি করে পেট চালাই। তাই করতিস। তাই করবি। দশ লাখ টাকা ঘুষ

দিয়ে কেন চাকরি করবি? এটা তো চরম দুর্নীতি। যোগ্য ক্যান্ডিডেটের চাকরি চুরি করে পাওয়া। শর্টকাট রাস্তায় গেছিলিস। এখন কি হলো। টাকাটাও গেল। চাকরিটাও গেলো। সম্মানটাও গেল।

অর্ণব: ঠিক বলেছ। আমারই দোষ। বাবা নয়, সুইসাইড আমারই করা উচিত।

সোমা: অর্ণব তুমি থামো। একটু শান্ত হও। আমাকে হালটা ধরতে দাও। যদিও আমি তোমাদের পরিবারের কেউ নয়।

অনিল: কে বলেছে তুমি আমাদের পরিবারের কেউ নয়? আমরা তো সবাই জানি তুমি অর্ণবকে ভালোবাসো। আমাদের সকলকে ভালোবাসো। আমরাও সকলে তোমাকে ভালোবাসি। আমরাও সবাই চেয়েছিলাম তুমি আমাদের পরিবারের একজন হও। আমাদের বাড়ির বউ হও। অর্ণবের বউ হও।

সোমা: চেয়েছিলেন ছোটকাকু? মানে এখন কি আর চান না?

অনিল: কি করে চাইবো। সবতো সর্বনাশ হয়ে গেল।

সোমা: কিচ্ছু সর্বনাশ হয়নি।

অনিল: কী বলছ তুমি?

সোমা: অর্ণবের চাকরি চলে গেল। আমার চাকরিটাতো আছে? পাকা চাকরি ব্যাংকের। আমার চাকরি যাবে না।

অর্ণব: এরপরও তুমি আমাকে বিয়ে করবে সোমা?

সোমা: হ্যাঁ। কেন করব না? কেন তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে না?

অর্ণব: তোমাকে বিয়ে করার মুখটা আমার আছে? আমারতো সম্মানটাই চলে গেল।

সোমা: ও সব ঠিক হয়ে যাবে।

অর্ণব: আমি তো চোর সমাজের চোখে।

সোমা: না। তুমি চোর নয়। তুমি ভিকটিম। এই পোড়া দেশে এই পোড়া সমাজে অন্যায় সমাজব্যবস্থার একটা শিকার তুমি। আমি চাকরিটা পেয়ে গেছি। তুমি চেষ্টা করেও পাওনি। আমার অবস্থা তোমার মতো হতে পারত। চাকরি না পেয়ে সংসার কে বাঁচাতে তুমি ঘুষ দিতে বাধ্য হয়েছিলে। অপরাধী তারা যারা তোমাদের ঘুষ দিতে বাধ্য করে। মানে যারা দেশটা চালায়। কাকে টাকা দিয়েছিলে তোমরা?

অর্ণব: এই পাড়ারই এক দালালকে। একটা নেতা।

অনিল: কে দাদা?

সুনীল: রথীন দত্ত।

অনিল: ঐ শুয়োরের বাচ্চাটা? ওর নাম্বারটা আমাকে দাও তো।

সুনীল: কেন? কি লাভ? ও কি টাকা ফেরত দেবে? হয়তো স্বীকারই করবে না।

অনিল: তুমি ওকে কল করে ফোনটা আমাকে দাও। আমি ওর সঙ্গে কথা বলব। যা বলছি করো। দ্যাখো আমি কী করি। হয়ত কাজ হবে।

(সুনীল রথীনকে কল করে ফোনটা অনিলকে দেয়)

অনিল: হ্যালো রথীন বাবু। আমি সুনীল বোসের ভাই অনিল বলছি। আপনি এখনই আমাদের বাড়িতে একবার চলে আসুন। হ্যাঁ। এখনই। ভীষণ সিরিয়াস ব্যাপার। না না। আপনি কেন আমাদের চাকর হবেন? বরং উল্টোটা। না আমরা কোথাও যাবো না। দাদাও কোথাও যাবে না। আপনি না আসলে কিন্তু আপনি বিপদে পড়ে যাবেন। কী হয়েছে? কিছুক্ষণ আগে আমার দাদা চিলেকোঠায় গলায় দড়ি দিতে যাচ্ছিল। আমি হঠাৎ গিয়ে পড়ায় দিতে পারেনি। ওর লেখা একটা সুইসাইড-নোট আমার পকেটে আছে। সেখানে আপনার বিরুদ্ধে ওর নির্দিষ্ট অভিযোগ আছে। ওর মানসিক অবস্থা ভালো নয়। ও আবার কিন্তু সুইসাইড করার চেষ্টা করতে পারে। সেটা যদি করে ফেলে তখন আমি ওর ঐ সুইসাইড নোটটা পুলিশকে দেব। তখন আপনার কী অবস্থা হবে বুঝতে পারছেন? ব্ল্যাকমেল বলুন আর যাই বলুন সেটাই হতে পারে। ঠিক আছে তাহলে আসছেন তো? না। তেমন রাত হয় নি। হ্যাঁ ঠিক এখনই আসুন। রিস্ক নেবেন না। বাইকে আসতে তো আপনার দুমিনিট লাগবে। আসুন। (ফোন বন্ধ করে)

সোমা: কাজ হবে ছোটকাকু?

অনিল: দেখা যাক। ওরা তো ভীষণই পাজি। পাক্কা ক্রিমিনাল। তবে দ্যাখো সোমা আমিও দুঁদে হকার। ওই রথীন দত্ত ওদের দলের একটা পান্ডা বটে। আমিও হকার ইউনিয়নের একটা পান্ডা। আমার গরমটা একটু দেখো।

সুনীল: অনিল, তুই কেন ওদের সঙ্গে লাগছিস? ওরা খুব খারাপ। যা গেছে গেছে। টাকার জন্যে ভাইকে হারাতে চাই না। (ফুঁপিয়ে কাঁদে)

অনিল: তুমি থামো। তাহলে টাকার জন্যে নিজেকে মেরে ফেলতে যাচ্ছিলে কেন? আমার কিছু হবে না।

(সুনীল ফুঁপিয়ে কাঁদে)

সোমা: কাকু শান্ত হোন। কাঁদবেন না। অসুস্থ হয়ে পড়বেন। একটু জল খাবেন?

সুনীল: না। থাক। ঠিক আছে।

(রথীন দত্ত বাইরে থেকে আসে। খুব বিরক্ত।)

রথীন: কী ব্যাপার? কী হয়েছে?

অনিল: আপনাকে তো ফোনে বললাম রথীনবাবু।

রথীন: সেতো জানলাম। কিন্তু ব্যাপারটা কী? দেখি সুনীলদার সুইসাইড নোটটা।

অনিল: না। সেটা এখন আপনাকে দেব না। আমাদের মুখের কথাটাই এখন আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে।

রথীন: আমি কী করেছি সুনীলদা যে আমাকে অভিযুক্ত করে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলে?

সুনীল: (চেঁচিয়ে ওঠে) তুমি কি জানো আজ হাইকোর্টের অর্ডারে অর্ণবের চাকরি চলে গেছে?

রথীন: সেকি! আমি তো জানতাম না।

সুনীল: আমাকে দশ লাখ টাকা ফেরত দাও।

রথীন: কী আজেবাজে বকছো? আমি তোমাকে টাকা দেব কেন?

সুনীল: কারণ তুমি অর্ণবের চাকরির জন্যে আমার কাছ থেকে দশ লাখ টাকা নিয়েছ। আমি নিজের হাতে তোমাকে সেই টাকা ক্যাশ দিয়েছি।

রথীন: কোন প্রমাণ আছে?

সুনীল: মানে!!! তুমি অস্বীকার করছ?

রথীন: হ্যাঁ করছি।

সোমা: আপনাদের মতো চোরেরাই এভাবে অস্বীকার করতে পারে।

রথীন: এই সোমা। মুখ সামলে। খুব সাবধান। তোমার পলিটিক্স করা ঘুচিয়ে দেব। আমি তোমাকে চিনি। কিন্তু তুমি আমাকে ঠিক চেনো না।

সোমা: ভীষণ চিনি। আমি ভয় পাচ্ছি না। যা ইচ্ছে করবেন।

অনিল: রথীনবাবু, আপনি অস্বীকার করছেন তো? দাদার মানসিক অবস্থাটা দেখছেন? ও যদি সত্যিই আত্মহত্যা করে, তাহলে কিন্তু সুইসাইডাল নোটটা আমরা পুলিশের কাছে জমা দেব। নিজেকে বাঁচাতে পারবেন তো তখন?

রথীন: (একটু থেমে) দেখো সুনীলদা। তুমি ওসব করতে যেও না। হ্যাঁ। স্বীকার করছি তুমি টাকা দিয়েছ।

অনিল: এইবার পথে এসেছে।

রথীন: কিন্তু বিশ্বাস করো। আমি তার থেকে এক লাখ টাকা মাত্র নিয়েছি। কাল সকালে ব্যাংক থেকে তুলে সেটা তোমাকে ফেরত দেব।

সুনীল: আর বাকি ন লাখ টাকা?

রথীন: ওটা আমার কাছে নেই।

সুনীল: নেই মানে? কার কাছে আছে?

অনিল: ওটা ওপরতলায় চ্যানেলে পাঠানো হয়ে গেছে।

অনিল: বুঝতে পারছ সোমা চুরির জালটা কতদূর ছড়িয়ে আছে?

সোমা: আমরা সেসব শুনতে চাই না। আপনি দশ লাখ টাকা নিয়েছেন। আপনি ঠিক দশ লাখ টাকাই ফেরত দেবেন।

রথীন: মাস্তানি করছ? তুমি এসব বলার কে?

সোমা: আমি অর্ণবের ভাবী স্ত্রী।

রথীন: পুরো স্ত্রী হলে তখন গলাবাজি করবে।

সোমা: তার মানে আপনি পুরো দশ লাখ টাকা দেবেন না?

রথীন: না। কোত্থেকে দেব? ওটা আমার কাছে নেই। বললাম তো চ্যানেলে পাঠানো হয়ে গেছে।

সোমা: ফেরত আনুন।

রথীন: সম্ভব নয়। চাইলেও ফেরত পাব না।

সোমা: কাদের পাঠিয়েছেন? তাদের নাম বলুন।

রথীন: বলব না।

সোমা: কেন?

রথীন: বলা সম্ভব নয়।

সোমা: কেন?

রথীন: আমি মার্ডার হয়ে যেতে চাই না।

সোমা: আমরা কিন্তু পুলিশে যাব। বলবো আপনি দশ লাখ টাকা নিয়েছেন।

রথীন: যাও। আমি অস্বীকার করব। বলব তোমরা মিথ্যে কথা বলছো। কী করবে তখন? প্রমাণ করতে পারবে?

অর্ণব: (লাফিয়ে উঠে রথীনের গলা টিপে ধরে) স্কাউন্ড্রেল!

রথীন: এই কি করছ! ছাড়ো। ছাড়ো আমাকে।

(ধস্তাধস্তি হয়। অনিল ছাড়িয়ে দেয়।)

রথীন: (রাগে কাঁপছে)খুব খারাপ করলে অর্ণব। তুমি আমাকে জানো না।

অর্ণব: খুব জানি। আপনি এলাকার মার্কামারা খতরনাক দুনম্বরী নেতা। আপনার হাতে অনেক গুন্ডা। অনেক মার্ডার করিয়েছেন। আমাকে মার্ডার কোরবেন তো? যান। আমাকে মার্ডার করান।

অনিল: রথীন বাবু আমার ভাইপোর আর কোন ক্ষতি করবেন না। এই পর্যন্ত যথেষ্ট ক্ষতি হয়ে গেছে। বাড়ির দশ লাখ টাকা চলে গেছে।ওর চাকরিটাও চলে গেছে। সম্মানটাও চলে গেছে। এবার রেহাই দিন। এরপরেও যদি কিছু করেন। তাহলে এই সুইসাইডাল নোটটা কিন্তু আমরা থানায় জমা দেব। আপনিও দেখবেন আমরা কতদূর যেতে পারি। (আগুনের মত তাকিয়ে রথীন চলে যায়।)

অনিল: ব্যাপারটা খুব খারাপ হল। তুই মাথা গরম করে ওর গায়ে হাত না দিলেই পারতিস অনু। খুব ডেঞ্জারাস ওরা।

অর্ণব: কী করবে? আমাক মেরে ফেলবে তো? ওকে তো বললাম আমি সেটার পরোয়া করি না। বাবার শেষ সঞ্চয়টা তো নষ্ট করে দিলাম। চাকরিটা চলে গেল। সবাই জেনে গেল। সম্মানটাও চলে গেল। আর বেঁচে কি হবে? আমাকে আটকালে কেন? ওকে আজই গলা টিপে মেরে ফেলে না হয় ফাঁসি যেতাম।

সোমা: কেন অর্ণব? একটা আরশোলাকে মেরে ফেলে নিজের জীবন নষ্ট করবে কেন? ঐ নরকের কীটের চেয়ে তোমার জীবনের দাম লক্ষ গুণ বেশি। যা গেছে যাক। টাকা, চাকরি, সো কলড পাবলিক প্রেস্টিজ - সব কিছুর চেয়ে তোমার জীবনের দাম বেশি। কিসের পাবলিক প্রেস্টিজ। ভালো ছাত্র হয়েও তুমি বছরের পর বছর সৎভাবে চেষ্টা করে কঠিন পরিশ্রম করে চাকরি পাওনি। আমি তো জানি। ঐ পাবলিক আমজনতা তোমাকে কি বেকারত্ব থেকে মুক্তি দিতে চেষ্টা করেছিল? ওদের কথা ছাড়ো।

অনিল: সোমা আমি আসছি। অনেক রাত হয়ে গেল। আমাকে ভোরের লোকাল ধরতে হবে। সামান্য হকারি করে খাই। তুমি বাড়ি ফিরবে তো? অনেক রাত হয়ে গেল তো।

সোমা: না ছোটকাকু। আমি বাড়িতে বলেছি আজ ছোটমাসির বাড়ি থাকবো। ছোটমাসির সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে। অর্ণবের মেসেজ পেয়ে বুঝেছিলাম মারাত্মক কিছু হয়েছে। তাই মাসিকে ম্যানেজ করেছি। মাসি আমাদের রিলেশনশিপের ব্যাপারটা জানে। আমাকে বন্ধুর মত ভীষণ কোঅপারেট করে।

অনিল: ঠিক আছে। আমি তাহলে যাচ্ছি। তোমার ছোটকাকিমাও মনে হয় চিন্তা করছে। ও তো এসব কিছুই জানেনা। আমি একটা দরকারে দাদার কাছে এসেছিলাম।

দেখলাম বাড়িটা থমথমে। বৌদি আর অর্ণব ভীষণ চুপ করে আছে। দাদা কোথায় বলতে বলল চিলেকোঠার ঘরে আছে। বুঝলাম কিছু সমস্যা হয়েছে। যাই হোক ভাগ্যিস চিলেকোঠার ঘরে গেলাম। আ্য একটু দেরী হলেই দাদাকে হারিয়ে ফেলতাম।

সুনীল: সেটা ভালোই হতো। কেন বাঁচালি আমাকে?

অনিল: বাজে বোকো না।

(অর্ণবের বাবা ও মা দুজনেই হাউ হাউ করে কাঁদে) কান্নাকাটি কোরোনা। যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে। এবার সবাইকে বাঁচতে হবে। জীবন কি অত সস্তা। লড়াই করে বাঁচতে হবে। আমাকে দেখছ না? সারাদিন লড়াই করে বাঁচি। আর তোমাদের এত সুন্দর একটা বৌমা হচ্ছে। যে তোমাদের সবাইকে এত ভালোবাসে। এতো তোমাদের বিরাট সহায়। যাও বৌদি দাদাকে ঘরে নিয়ে যাও। চোখে চোখে রেখো। আর দাদা তুমি কাপুরুষের মত আর ওরকম নোংরা কাজ করতে যেও না। ছোট ভাই হলেও জ্ঞান দিয়ে বলছি। মানুষের মতো বাঁচো। কাপুরুষরাই লড়াই না করে নিজেকে মেরে ফেলতে যায়। যাও। তোমরা ভেতরে যাও। (অর্ণবের বাবা ও মা ভেতরে চলে যায়) আমি যাচ্ছি সোমা। যাচ্ছি অর্নব। মনের জোর বাড়া। রথীন দত্ত তোর কিছু করতে পারবে না। বাবারও বাবা আছে। আমি ঘরে গিয়ে জটাদাকে একটু পরে ফোন করে সব বলব। জটাদা

যেরকমই লোক হোক আমাকে খুব ভালোবাসে। আমি যাচ্ছি। সোমা এদের সবাইকে একটু দেখো।

সোমা: হ্যাঁ। ছোটকাকু। আমি আছি। চিন্তা করবেন না। আপনি আসুন। (অনিল বেরিয়ে যায়)

সোমা: মন খারাপ করে থেকো না অর্ণব।

অর্ণব: তুমি রাতে এ বাড়িতে রয়ে গেলে কেন? বাড়ির সবাই বাবা-মা কাকু কাকিমা তোমাকে যদি খারাপ ভাবে, তাহলে আমার খুব খারাপ লাগবে।

সোমা: আমাকে কেউ খারাপ ভাববে না। কেননা ওরা কেউ খারাপ নয়। আর ওরা জানে আমিও খারাপ মেয়ে নয়।

অর্ণব: কোথায় থাকবে রাতে?

সোমা: (হেসে) তোমার ঘরে।

অর্ণব: তাহলে খারাপ ভাববেই।

সোমা: (হেসে) ভয় নেই। আমি চিলেকোঠার ঘরে একলা থাকব।

অর্ণব: আবার ওখানে?

সোমা: (হেসে) ভয় নেই। মরব না। মরার কোনো ইচ্ছে নেই। বরং বাঁচার ইচ্ছে ভীষণ। তোমাকে নিয়ে। তোমার সঙ্গে। (সোমা দুহাত দিয়ে অর্ণবের গলা জড়িয়ে ধরে হাসিমুখে গান গাইতে থাকে। অর্ণবের ক্রমশ চোখ ভিজে যায়।)

অর্ণব: (আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে)কেন এখনও আমাকে এত ভালোবাসছ তুমি? আমার মতো একজন অপদার্থ দুর্নীতিপরায়ণ ছেলেকে।

সোমা: নিজেকে গালাগালি দেবে না অর্ণব। একদম নয়।

অর্ণব: গালাগালিরই যোগ্য আমি।

সোমা: আমি তা মনে করি না।

অর্ণব: কী মনে করো?

সোমা: বললাম তো একটু আগে। তুমি সিস্টেমের শিকার। তুমি ভালো। শতকরা একশ ভাগ ভালো।

আমার চোখ ভুল দেখেনি।

অর্ণব: কিন্তু আমি তো তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি।

সোমা: কীভাবে?

অর্ণব: তোমাকে তো বলিনি দশ লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে আমি চাকরি পেয়েছি।

সোমা: কোন ছেলে কি এত সহজে তার প্রেমিকাকে এসব বলতে পারে?

অর্ণব: আমি একজন কাওয়ার্ড। আমাকে তুমি ডিফেন্ড করছ?

সোমা: করছি। আমাদের বিয়ের পর তুমি নিশ্চয়ই সেটা বলতে।

অর্ণব: তখন আমাকে ঘেন্না করতে না?

সোমা: না। কারণ ওটাই। তুমি সিস্টেমের শিকার। আমি তো জানি তুমি ভালো ছাত্র। উন্নত সুস্থ রুচি আর মন তোমার। কেন তোমাকে কোনদিন ঘৃণা করব? আমি তোমাকে ভালোবাসি অর্ণব। তোমার সমস্ত সত্তাকে। আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে। কাটাছেঁড়া করে, ভুল ঠিক বিচার করে, দোষগুণ বিচার করে এই ভালোবাসার কোন ব্যাখ্যা করা যায় না। আমরা কেউ ত্রুটিমুক্ত নই পৃথিবীতে। ভুল ত্রুটি, দোষ গুণ - কোন কিছুই বিচার্য নয়। শুধু ভালোবাসাই বিচার্য। শুধু প্রেমই একমাত্র সত্য অর্ণব। কী হল অর্ণব? এত গুম হয়ে আছ কেন? দেখো এই প্রথম তোমাদের বাড়িতে অতিথি হয়ে আমি রাত কাটাচ্ছি। আমার এই রাতটা ব্যর্থ করে দিও না।

অর্ণব: কেন তুমি আমার মত একটা মানুষের জন্যে এত ভাবছ? কেন রয়ে গেলে এখানে? চলো তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিই।

সোমা: তাড়িয়ে দিচ্ছ আমাকে?

অর্ণব: আমার আর কোন ভবিষ্যৎ নেই। থাকবে বলেও আমি বিশ্বাস করি না। আমার জীবনটা শেষ হয়ে গেছে।

সোমা: শুধু বাজে কথা। কিচ্ছু শেষ হয়নি।

অর্ণব: হ্যাঁ সব শেষ হয়ে গেছে। আর যাদের জন্য শেষ হয়ে গেছে তাদের আমি ছাড়বো না| আমি চরম প্রতিশোধ নেব।

সোমা: কী সব পাগলের মতো বলছ মাথা গরম করে?

অর্ণব: কিচ্ছু পাগলের মত নয়। আমি আবারও বলছি। আমি চরম প্রতিশোধ নেব। রথীন দত্তদের আমি ছাড়বো না।

সোমা: কী সব বলছ! তুমি ওদের সঙ্গে আর লাগবে না। ওরা ভয়ংকর খারাপ। যা গেছে গেছে। যা হবার হয়ে গেছে। তুমি ওসব করতে গেলে তোমার বাকি জীবনটাও নষ্ট হয়ে যাবে অর্ণব। আমাদের বাঁচতে হবে। আমাদের সুন্দর করে ভবিষ্যতের এক সুন্দর জীবন গড়ে তুলতে হবে।

অর্ণব: না তা আর হবে না।

সোমা: কেন হবে না? আমি তো আছি তোমার সঙ্গে অর্ণব।

অর্ণব: আমাকে তুমি ভুলে যাও সোমা। আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম।

সোমা: কী পাগলামি করছ?

অর্ণব: পাগলামি নয়। আমি ঠিক বলছি। আমি চাকরির পরীক্ষায় ফেল করে অসহায় কপর্দকশূন্য বাবার দশ লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে চাকরি জুটিয়ে ছিলাম। আমি অপদার্থ। দুর্নীতিপরায়ন। চোর| অবৈধ পথের পথিক। তুমি একটা

সৎপরিশ্রমী মেধাবী ছাত্রী। পরীক্ষা দিয়ে নিজের যোগ্যতায় ব্যাংকে চাকরি পাওয়া একজন সম্মানীয়া মহিলা। আমার সঙ্গে - আমার মতো দুর্নীতিগ্রস্ত ছেলের সঙ্গে তোমার জীবন যুক্ত করে তোমার সম্মান নষ্ট কোরোনা। আমি অপদার্থ। সংসারের সর্বনাশ করলাম। নোংরা রাস্তায় চাকরি জুটিয়ে ছিলাম। তাই হাইকোর্টের অর্ডারে আমার চাকরি চলে গেল। সবাই জেনে গেল। সমাজে আমার সম্মান চলে গেল। আমার এই সম্মানহীন জীবনের সঙ্গে তোমার জীবন যুক্ত করে তোমাকে অসম্মানিত করতে চাই না।

সোমা: বার বার সেই একই কথা। সেই অপরাধবোধ।

অর্ণব: হ্যাঁ অপরাধ বোধ। কারণ আমি অপরাধ করেছি। আমি অপরাধী।

সোমা: আমি তো বার বার বলছি আমি তা মনে করিনা। কেননা আমার স্বাভাবিক বুদ্ধি দিয়ে সমাজ সচেতনতা দিয়ে বৃহত্তর দৃষ্টিতে সার্বিক পরিপ্রেক্ষিত বিচার করে বলছি তো তুমি অপরাধী নও। আবার বলছি তুমি সিস্টেমের শিকার। কেন আমাকে একই কথা বলে বোর করছ?

অর্ণব: আমাকে নিতান্ত ভীষণ ভালোবাসো বলে আজ এই কথা বলছ। তোমার সঙ্গে বিয়ে হলে একদিন কিন্তু তুমি হয়ত অন্য কথা বলতে পারো। আমাদের সন্তানদের হয়ত বলতেই পারো তোর বাবা ছিল একটা করাপটেড দুর্নীতিগ্রস্ত চোর। দশ লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে চাকরি পেয়ে

তারপর ধরা পড়ে চাকরি খোয়ানো একটা রাস্কেল জানোয়ার। বলতেই পারো ভবিষ্যতে তাদের - তাদের শুধু কেন – হয়ত আমাকেই একদিন বলতে পারো এইসব।

সোমা: তাই নাকি? এতদূর ভেবে ফেলেছ? আমাকে এই চিনেছ? এত অবিশ্বাস আমাকে?

অর্ণব: হ্যাঁ। তাই। আমি আর কাউকেই বিশ্বাস করি না। কোনকিছুই বিশ্বাস করি না। তাই?

সোমা: তাহলে সত্যি আমাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকা উচিত নয়। অবিশ্বাস দিয়ে আমিও জীবন শুরু করতে চাই না। (বাষ্পারুদ্ধ কণ্ঠে) ঠিক আছে অর্ণব। তোমাকে মুক্তি দিলাম। আমি চলে যাচ্ছি। (প্রচন্ডভাবে কেঁদে ফেলে)

অর্ণব: দাঁড়াও। এত রাতে কোথায় যাচ্ছ?

সোমা: নিজের বাড়িতে। লাস্ট বাস পেয়ে যাব।

অর্ণব: আমি পৌঁছে দেব?

সোমা: না। (চলে যায়)

।। দ্বিতীয় দৃশ্য।।

(থানা। ওসির চেম্বার।)

অর্ণব: বলুন অফিসার আমাকে কেন ডেকে পাঠিয়েছেন।

ওসি: আপনি বুঝতে পারছেন না নাকি ন্যাকার মতো বুঝেও না বোঝার ভান করছেন?

অর্ণব: আমি নিশ্চয় অনেক কিছু আন্দাজ করছি। কিন্তু আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই আমার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ কী।

ওসি: আপনি লিফলেট ছাপিয়ে চতুর্দিকে সেগুলো ছড়িয়ে এলাকার কিছু সম্মানীয় রাজনৈতিক নেতার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার করে তাদের সম্মান নষ্ট করছেন।

অর্ণব: সম্মানীয় নেতা? হাসালেন। হ্যাঁ। করছি। কারণ সেটাই তাদের প্রাপ্য। দরকার হলে ওরা আমার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করুক। এসবে আপনার সমস্যা কিসের?

ওসি: আমার কাছে কৈফিয়ত চাইছেন?

অর্ণব: না কৈফিয়ত চাইছি না। শুধু জানতে চাইছি কারণটা।

ওসি: আপনার কথা কে শুনবে? কে বিশ্বাস করবে? আপনি তো চাকরির পরীক্ষায় ফেল করে তারপর দশ লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে চাকরি জুটিয়েছেন আর তারপর ধরা পড়ে গিয়ে হাইকোর্টের অর্ডারে আপনার চাকরি খুইয়েছেন।

অর্ণব: ঠিক। একদম ঠিক বলেছেন। আমি তো লিফলেটে এই সমস্ত কথাই লিখেছি।

ওসি: কিন্তু লিফলেটে যাদের নামে আপনি অভিযোগ করেছেন, তারা নির্দোষ সম্মানীয় নেতা।

অর্ণব: তাই নাকি?

ওসি: আপনি প্রমাণ করতে পারবেন তারা আপনার কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন?

অর্ণব: না। পারবো না। আমি অভিযোগ করছি। তদন্ত করার কর্তব্য আপনাদের। রথীন দত্ত আর আমার বাবার কল লিস্ট চেক করে রথীন দত্তকে জিজ্ঞেস করুন কী এত কথাবার্তা হয়েছিল ওর সঙ্গে আমার বাবার। আপনারা ওকে পেঁদিয়ে ওর স্বীকারোক্তি আদায় করুন।

ওসি: আপনার কথায়?

অর্ণব: হ্যাঁ। আমার কথায়। আমি তো বলছি ওদের দশ লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে চাকরি পেয়েছি।

ওসি: আপনি মিথ্যেকথা বলছেন।

অর্ণব: তাহলে আমার চাকরি গেল কেন? আমি চাকরির পরীক্ষায় ফেল করতেও আমার চাকরি হলো কেন?

ওসি: আপনি ঘুষ দিয়েছেন। তাই হয়েছে।

অর্ণব: হ্যাঁ। বলছি তো দিয়েছি। ভূতকে তো ঘুষ দিইনি। আমরা সেই সব ক্ষমতাবানদের ঘুষ দিয়েছি যারা আমি চাকরির পরীক্ষায় ফেল করা সত্ত্বেও আমাকে চাকরি তে ঢুকিয়েছিল। তারা কারা?

ওসি: সে আমি কি করে জানব আপনি কাদের ঘুষ দিয়েছেন? সেটা তো আপনি জানেন।

অর্ণব: জানি তো। তাদের নামই তো লিফলেটে লিখেছি। তাদের অ্যারেস্ট করে ইনটারোগেট করুন।

ওসি: আপনার কথায়?

অর্ণব: হ্যাঁ। আমার অভিযোগের ভিত্তিতে।

ওসি: আপনি নির্দোষ লোকদের নামে মিথ্যে অভিযোগ করছেন তাদের ফাঁসাবার জন্য। আসল অপরাধীদের আড়াল করতে।

অর্ণব: আমার মোটিভ?

ওসি: আপনি বিরোধী রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে এই কাজ করছেন। এটাই আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ।

অর্ণব: আপনার কথার প্রমাণ?

ওসি: কোনো প্রমাণ বা কৈফিয়ত আপনাকে দেব না। আপনি আজকেই আবার একটা লিফলেট ছাপিয়ে সেখানে লিখবেন বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্ররোচনায় আপনি সম্মানীয় নেতাদের নামে মিথ্যা অভিযোগ করেছেন।

অর্ণব: তাই নাকি? আমাকে এতই ভেড়া আর রামছাগল মনে করেন? আমার তো সব গেছে। টাকা কড়ি চাকরি সম্মান। আমার আর হারাবার কিছু নেই। ভয়েরও কিছু নেই। শুনুন অফিসার। আমি আর কোন লিফলেট ছাপাবো না। যেটা ছাপিয়েছি, সেটাই বরং আরো অনেক জেরক্স করে সব জায়গায় বিলি করব। আর রাস্তাঘাটে বাজারে

মোড়ে সর্বত্র মাইক ভাড়া করে আপনাদের ওই সম্মানীয় নেতাদের মুখোশ খুলে দেব। ওদের বলবেন আমি ওদের ছাড়বো না।

ওসি: আপনাকে অ্যারেস্ট করব।

অর্ণব: করুন। তারপর জামিন নিয়ে বেরিয়ে আবার একই কাজ ক্রমাগত করে চলব। আপনাদের ওই ঘুষখোর সম্মানীয় নেতাদের সম্মানটা ধুলোয় মিশিয়ে দেব। যেভাবে আমার সম্মান ওরা ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে।

ওসি: আপনি বেরিয়ে যান। আ আর এক মিনিট থাকলে আপনাকে লকআপে পুরব।

অর্ণব: যাচ্ছি। এখানে এক সেকেণ্ডও থাকার ইচ্ছে নেই। আপনি ডেকেছিলেন। তাই এসেছিলাম।

(সেই মুহূর্তে মৌসুমী, তাপস ও প্রশান্ত বাইরে থেকে এসে ওসির ঘরে ঢুকে পরে।।)

মৌসুমীঃ দাঁড়াও অর্ণব। তুমি যাবে না। আমরা বাইরে থেকে সব শুনেছি।

ওসি: কী ব্যাপার? আপনারা বিনা পারমিশনে ওসির ঘরে ঢুকলেন কেন?

তাপসঃ বেশ করেছি। রথীন দত্ত ঢুকলে এটা বলতেন?

ওসি: এই তাপস! বড় ফুটবলার হয়ে গেছ? ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব।

প্রশান্তঃ তার আগে বলুন আমাদের কি অপরাধ? অর্ণবদার মতো একইরকমভাবে রথীন দত্ত স্কুলে চাকরি দেওয়ার নাম করে আমার কাছ থেকে দশ লাখ টাকা নিয়েছে। আর কোর্টের অর্ডারে ওর মতো আমারও চাকরি চলে গেছে।

তাপসঃ রথীন দত্ত আমার কাছ থেকেও দশ লাখ টাকা নিয়েছে। আমারও চাকরি চলে গেছে কোর্টের অর্ডারে।

মৌসুমীঃ আমরাও বাড়ি থেকে রথীন দত্তকে দশ লাখ টাকা দিয়েছি আমার ছোট ভাই তপনের চাকরির জন্যে।ওরও চাকরি চলে গেছে কোর্টের অর্ডারে।

ওসি: কোর্টে যান। কোর্টে গিয়ে প্রমাণ করুন। আমার কাছে এসেছেন কেন?

তাপসঃ আপনি কি জানেন আমার বাবা জমি বেচে টাকা দিয়েছে রথীন দত্তকে?

প্রশান্তঃ আপনি কি জানেন আমি মায়ের গয়না বেচে টাকা দিয়েছি রথীন দত্তকে?

মৌসুমীঃ আপনি কি জানেন আমার ভায়ের চাকরি চলে যেতে ও কাউকে কিছু না বলে গতকাল পাগলের মত বাড়ি থেকে চলে গেছে? শুধু রথীন দত্ত নয়। রথীন দত্ত বরফের চূড়ো। অনেক রাঘব বোয়াল পেছনে আছে।

ওসি: ওসব ফালতু কথা আমাকে বলতে এসেছেন কেন?

তাপসঃ ফালতু কথা? আপনি সব জানেন।

প্রশান্তঃ ওই কয়েকটা লোকের জন্য আমাদের সকলের সর্বনাশ হয়ে গেছে।

ওসি: তোমরা আমাকে বলছ কেন?

মৌসুমীঃ কাকে বলব? আপনি তো এলাকার ওসি। ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছি।

ওসি: বললাম তো। কোর্টে গিয়ে অভিযোগ করুন। এটা কোর্ট নয়।

মৌসুমীঃ কোর্টে যাবার পয়সা কে দেবে? আপনি? আমরা অভিযোগ করছি রথীন দত্তর নামে। আপনি স্টেপ নিন।

তাপসঃ হ্যাঁ। রথীন দত্তর বিরুদ্ধে আমরা ডায়েরি করব।

ওসি: (হেসে) রথীন দত্তর বিরুদ্ধে আমরা ডায়েরি করবে?

প্রশান্তঃ হ্যাঁ। আর আপনাকে ডায়েরি নিতে হবে।

মৌসুমীঃ আর ওকে অ্যারেস্ট করতে হবে।

ওসি: (হেসে) তাই নাকি?

মৌসুমীঃ হ্যাঁ। তাই।

অর্নবঃ আর তা যদি না করেন, আমরা গণআদালত করে ওর বিচার করব।

ওসি: (হেসে) তাই নাকি? এতবড় নেতা হয়ে গেছ? এরকম বেআইনি কাজ করলে আমরা কী করব জানো?

তাপসঃ হ্যাঁ। আইন দেখিয়ে আমাদের অ্যারেস্ট করবেন। কিন্তু ঐসব চোরেদের চিটিংবাজির ব্যাপারে আপনাদের আইন চুপ করে থাকে।

(রথীন দত্তর প্রবেশ)

রথীন দত্ত: কী ব্যাপার অফিসার?

ওসি: (হেসে)এরা আপনাদের বিরুদ্ধে ডায়েরি করতে এসেছে।

রথীন দত্ত: তাই নাকি?

ওসি: (হেসে) আপনাকে অ্যারেস্ট করতে বলছে।

রথীন দত্ত: আচ্ছা?

ওসি: (হেসে) বলছে গণআদালতে আপনার বিচার করবে।

রথীন দত্ত: পিটিয়ে বের করে দিন থানা থেকে।

ওসি: ঠিক। সেটাই করতে হবে। বহুৎ বাড়াবাড়ি করছে।

অর্ণব: (চিৎকার করে) দিন। পিটিয়ে বের করে দিন আমাদের থানা থেকে। কিন্তু আমাদের মুভমেন্ট থামবে না। প্রতিদিন বেড়ে চলবে। প্রতিদিন ছড়িয়ে পড়বে। আর আপনাদের নেতাদের চামচাবাজি করার মুখোশ টেনে খুলে ফেলবে।

ওসি: (পুলিশদের ডাকে) এই! এদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দাও।

(দুজন পুলিশ ওদের ধাক্কা দিয়ে বার করতে থাকে। ওরা বেরোবার সময় প্রবলভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিবাদী চিৎকার করতে থাকে।)

।। তৃতীয় দৃশ্য।।

(অর্ণদের বাড়ি। রাতের বেলা। কলিং বেল। অর্ণবের বাবা দরজা খুলে দেন। একজন সাবইন্সপেক্টর ও দুজন পুলিশ ঢুকে পরে।)

সাবইন্সপেক্টর: কোথায় আপনার ছেলে? তাকে ডাকুন।

সুনীল: কেন?

সাবইন্সপেক্টর: আমরা ওকে থানায় নিয়ে যাব।

সুনীল: এত রাতে কেন ওকে থানায় গিয়ে যাবেন?

সাবইন্সপেক্টর: সেই কৈফিয়ত আপনাকে দেব না।

সুনীল: আপনাদের কাছে ওর কোন নামে কোন আরেস্ট ওয়ারেন্ট আছে?

সাবইন্সপেক্টর: আপনাকে কোন জবাবদিহি করব না। ওকে ডাকুন।

সুনীল: ও ছাদের চিলেকোঠার ঘরে ঘুমোচ্ছে।

সাবইন্সপেক্টর: (পুলিশদের)এই তোমরা ছাদে গিয়ে ওকে নীচে নামিয়ে নিয়ে এসো। (পুলিশদের কানে কানে কিছু বলে। পুলিশদুটো ওপরে চলে যায়।)_

সুনীল:একি! আপনারা আমার বিনা পারমিশনে ওপরে গেলেন কেন? আপনাদের কি কোন সার্চ ওয়ারেন্ট আছে? (অর্ণবের মা তপতী ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে)

তপতী: কী হয়েছে? পুলিশ কেন?

সুনীল: অর্ণবকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছে।

তপতী: কেন? কী করেছে আমার ছেলে? আমার ছেলেকে কোথাও নিয়ে যাবেন না।

সুনীল: ওরা অলরেডি আমাদের ছাদের ঘরে চলে গেছে অর্ণবকে ধরতে।

তপতী: না আমার ছেলেকে ধরবেন না। আপনারা এসব করতে পারেন না।

সাবইন্সপেক্টর: চোপ। আর একটা কথা বললে আপনাদের দুজনকেও তুলে নিয়ে যাব।

সুনীল: মানে? জোর যার মুল্লুক তার। গাজুয়ারি পেয়েছেন। রাত দশটার সময় বাড়িতে এসে বিনা ওয়ারেন্টে আমাদের সবাইকে তুলে নিয়ে যাবেন?

সাবইন্সপেক্টর: হ্যাঁ। যাব।

সুনীল: আপনারা এসব করতে পারেন না।

সাবইন্সপেক্টর: চোপ। একটা কথা বলবেন না।

সনীলঃ রাতের বেলায় ভদ্রলোকের বাড়িতে ঢুকে মাস্তানি করছেন পুলিশ অফিসার হয়েছেন বলে? দেশে আইন নেই? বেরিয়ে যান আমার বাড়ি থেকে।

সাবইন্সপেক্টর: চোপ। পুলিশ অফিসারকে বেরিয়ে যেতে বলছে! এত স্পর্ধা!

সুনীল: হ্যাঁ বলছি। ঐ পুলিশ দুটোকে নিয়ে এই মুহূর্তে আমর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। আপনাদের কাছে কোন ওয়ারেন্ট নেই। বেআইনিভাবে ঢুকে মাস্তানি করছেন।

(সাবইন্সপেক্টর অর্নবের বাবাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়)

তপতী: একি! আমার স্বামীকে মারলেন কেন? কেন মারলেন? কেন মারলেন? (তপতী চিৎকার করতে থাকেন। এই সময় পুলিশ দুটো নেমে আসে।)

প্রথম পুলিশঃ স্যার কাজ হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় পুলিশঃ কমপ্লিট।

সাবইন্সপেক্টর: কী ব্যাপার?

(একজন পুলিশ সাবইন্সপেক্টর কে কানে কানে কিছু বলে)

সাবইন্সপেক্টর শুনুন সুনীল বাবু। আপনার ছেলেকে পুলিশরা ধরতে গেছিল। ও পুলিশের হাত ছাড়িয়ে তিনতলার ছাদ থেকে রাস্তায় লাফ দিয়ে পালাতে গেছিল। এখন রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। ওকে হাসপাতালে নিয়ে যান। এই তোমরা চলো।

(অর্ণবের বাবা ও মা প্রচণ্ড আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। বাইরে থেকে অনিল দৌড়ে ঢোকে।)

অনিল: দাদা, এরা অনুকে ছাদ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এখনি চলো। ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

সাবইন্সপেক্টর: কে বলল ওকে আমরা ছাদ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি?

অনিল: (প্রচণ্ড চেঁচিয়ে) আমার জানলা থেকে আমি নিজের চোখে দেখেছি।

সাবইন্সপেক্টর: আপনি ভুল দেখেছেন।

প্রথম পুলিশঃ হ্যাঁ। আপনি ভুল দেখেছেন।

দ্বিতীয় পুলিশঃ ও আমাদের তাড়া খেয়ে পালাতে গিয়ে নিজেই লাফ দিয়েছে।

অনিল: (প্রচণ্ড চেঁচিয়ে) না। আপনারা মিথ্যে বলছেন। আমি নিজে দেখেছি ওকে ছাদ থেকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে।

সাবইন্সপেক্টর: (প্রচণ্ড ধমকে) আপনি ভুল দেখেছেন। এই তোমরা চলো।

অনিল: ওকে আপনারা হাসপাতালে নিয়ে যান।

সাবইন্সপেক্টর: আপনারাা নিয়ে যান। লাফ দিয়েছে ও। আমরা ওকে লাফাতে বলিনি। এই চলো| (বেরিয়ে যায়।

অনিল: দাদা! বৌদি,!এখনি চলো। এভাবে ভেঙে পোড়োনা। অনুকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

হাসপাতালে গেলে হয়ত অনু বাঁচতে পারে।কী করছ দাদা? ওঠো ওঠো। (প্রচণ্ড আকূতি করে চিৎকার করে) ওঠো ওঠো।ওঠো........................

(প্রচণ্ড আবহ। অন্ধকার।)

(অন্ধকার মঞ্চে অতি ক্ষুদ্র আলোকবৃত্তে উদ্ভাসিত হয় অর্ণবের মুখ)

অর্ণব: আমারতো মৃত্যু হল। এরপর কী কী ঘটবে আমি বলে দিতে পারি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল হইচই করবে। একদল বলবে দুর্ঘটনা। অন্যরা বলবে হত্যা। ময়নাতদন্ত বলবে দুর্ঘটনা। বিরোধী দলগুলোর প্রতিবাদ আন্দোলন বিক্ষোভ মিছিল হতে থাকবে। আমার মুমূর্ষু শোকে পাথর হয়ে যাওয়া বাবা মাকে মিডিয়ার লোকরা এসে নিয়মিত বিরক্ত করে যাবে। বাবা-মা- কাকার মুখ বন্ধ করার জন্য নিয়মিত হুমকি দেওয়া ও প্রলোভন দেখানো চলবে। বুদ্ধিজীবীদের মোমবাতিগুলো নেভানোই থাকবে। তারপর মানুষেরা কমবেশি ফ্রী লজেন্স পেতে পেতে ধীরে ধীরে সব ভুলে যাবে। একটা ছোট্ট শহীদ বেদী হয়ত হবে। সেটাও আসতে আসতে ময়লা হয়ে যাবে। এইভাবে দিন মাস বছর গুলো গড়িয়ে একদিন ভোট এসে যাবে। শপথগ্রহণ হবে। তারপর কোনদিন আবার কোন অর্ণব হয়ত পুলিশের তাড়া খেয়ে ছাদ থেকে লাফ দিয়ে মরবে বা তাকে ছাদ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে। আপনাকে

বলা হবে আপনি ভুল দেখেছেন, ভুল শুনেছেন, ভুল বুঝেছেন।

(নাটকটি প্রযোজনার অনুমতির জন্য যোগাযোগঃ 8910019589)

সূচিপত্র

কবিতা:

বিলাসিতা

লি খে ছে ন – স জ ল কা ন্তি টি কা দা র



দিব্যি আছি সুখেই আছি

ভালো মন্দে দিন চলে যায়

ঘরে আছে দুটো গোরু

এদের নিয়েই দিন

কেটে যায়।

দশ বছরের ছেলে আমার

শাকসবজি বেচে আসে---

রোজ:

সকাল দুপুর বিকেলবেলায়।

রাজনীতির ছাই বুঝিনা কিছু!
ভোটটা তবু দিয়েই আসি
ভোট চলে গেলে পরেই
গলায় ঝোলে
ক্ষুধার ফাঁসি।

নুন আনতে পান্তা ফুরায়
কাঁচা লঙ্কা তাও জোটেনা!
এরই মাঝে ছেলে আমার
পড়াশুনায় মন দিতে চায়
ধমকে উঠি কান্ড দেখে
কেমন করে ছেলে আমার
বিলাসিতায় ডুব দিতে যায়!

যে ঘরেতে পেট চলেনা
সেই ঘরেতে পড়ালেখা?
বিলাসিতা ছাড়া কি আর

অন্য চোখে যায়রে দেখা?

শুনিসনি কি কোন এক নেতা

নামটা তো পড়ছেনা মনে

শিক্ষিতদের চাকরী মেরেই

আছে এখন জেলের কোণে।

তাইতো বলি বই গুটিয়ে

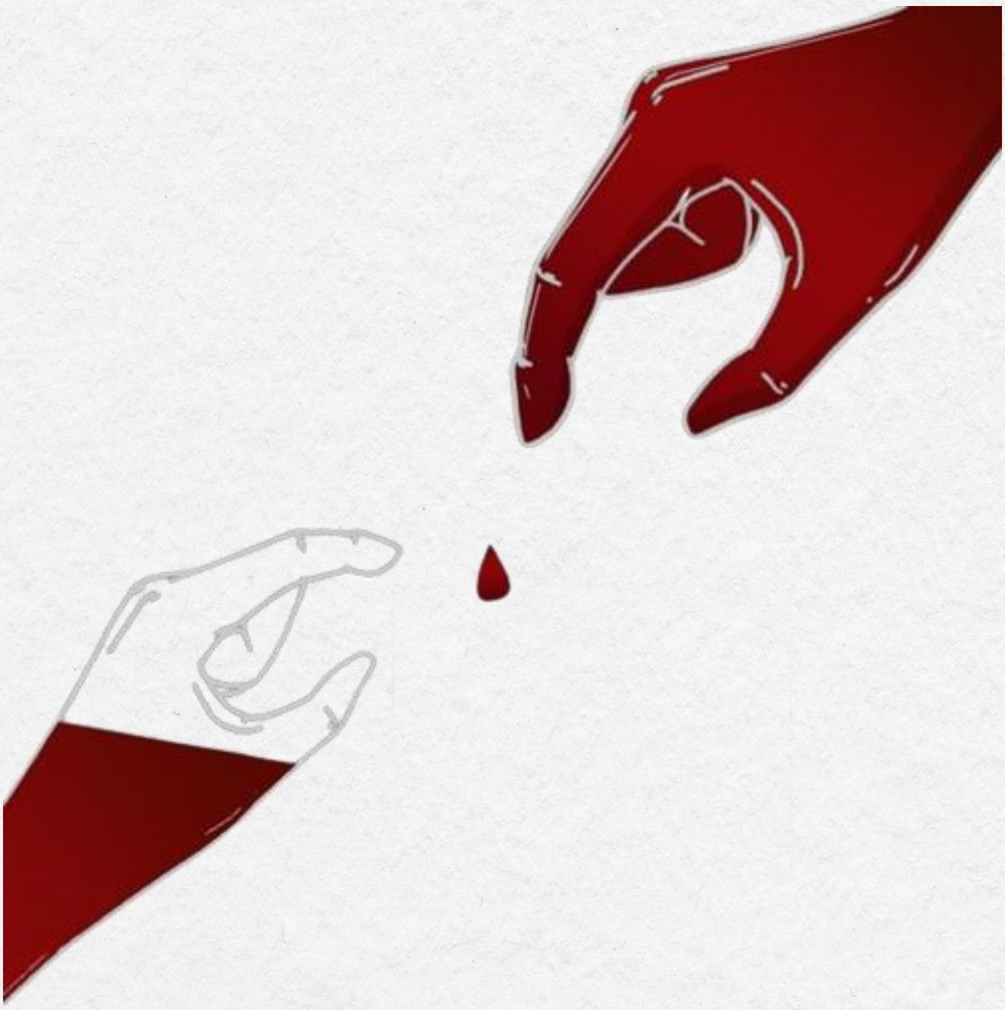
চলনা এবার মাঠে যাই

পড়া শিখে চাকরী পাবি?

আমার যে অত টাকা নাই

লাল

লিখেছেন – প্রদীপ চক্রবর্তী



জাতের নামে বজ্জাতি

আর কতদিন চলবে?

ধর্মের ধ্বজাধারীরা

আর

কবে সত্যি কথাটা বলবে?

মিথ্যাচারের ফানুসটাকে

নামাতে হবে তাই,

পৃথিবীটা সব মানুষের

মানুষ মানুষের-ই ভাই।

রক্তদান শিবিরেতে

রক্ত দিলাম কাল,

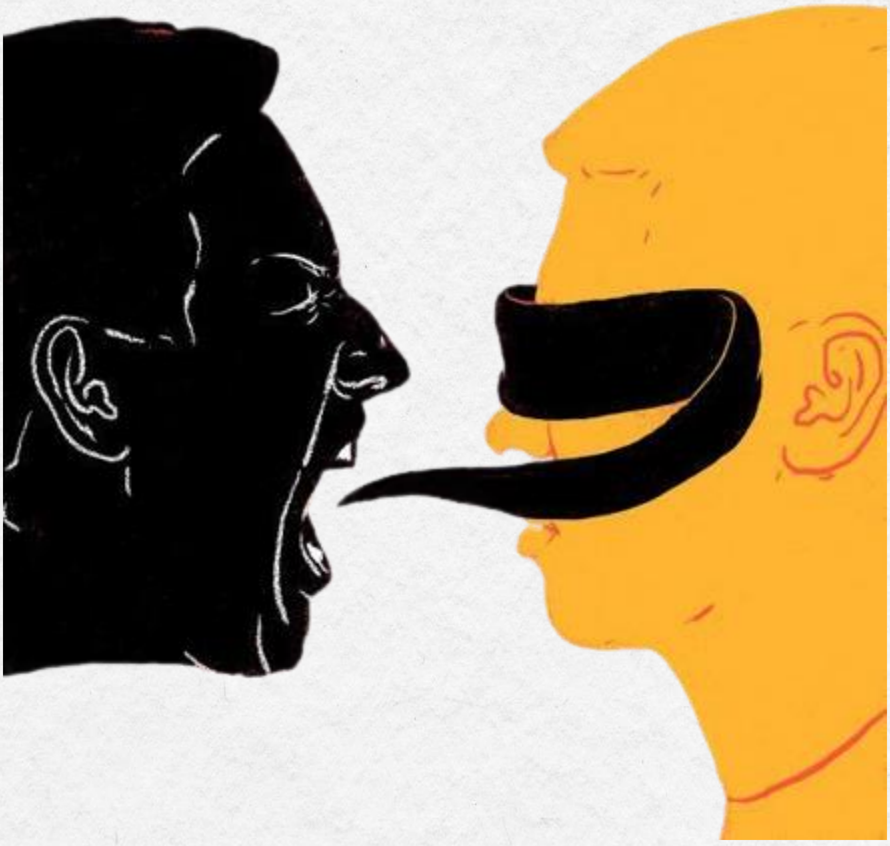
শিবির শেষে দেখতে পেলাম,

সবার রক্তই লাল।

সূচিপত্র

আস্তিক ও নাস্তিক

লি খে ছে ন - বিপ্লব সেন



বাস্তব অবস্থার বিরোধিতা করেই
আস্তিক যে ভাব বাদী,
ঠিক উল্টো কাজ করেই
নাস্তিক মানুষ বস্তুবাদী।

প্রশ্ন করার অধিকার নেই
কোনো সংকীর্ণতার মধ্যে,
তাই আপনার করা প্রশ্ন এড়িয়ে যায়

আঁধারের সান্নিধ্যে।

ওরা মানে না অন্য ঈশ্বর
শুধুই নিজের কাল্পনিক সর্বশক্তিমান,
প্রশ্ন ওঠে তাহলে কি আলাদা ঈশ্বর
আলাদা ধর্মে মহান।

এই যুক্তি প্রশ্নের কোনো
উত্তর তাদের নেই,
তারা শুধু আনুগত্য নিয়ে
ভজে চলে তাই।

এই প্রশ্ন করলেই বলবে
নাস্তিক বিধর্মী,
নাস্তিক কথাটার মানেই জানে না
তারা তো মানব ধর্মী।

দ্বিচারিতা নিয়ে চলে
যেটা বোঝে ভালো,

অন্ধ বিশ্বাসের উন্মাদনায়
তাদের চেতনা কালো।

যুক্তি বুদ্ধি সব বাদ যায়
শুধুই পড়ে থাকে বিশ্বাস,
কোনো প্রশ্ন কাজ করে না
বোঝে না কেনো নাস্তিকের অবিশ্বাস।

সূচিপত্র

এ কীসের বিবর্ণতা?

লি খে ছে ন – প্রি ন্সি বে রা



একদল পুরুষ বিচার বিবেচনা করেছে রপ্তানি

আমদানি করেছে শুধুই মিথ্যে দম্ভ,

বৈবাহিক সম্পর্কের মানরেখেছে তলানিতে,

সদা ব্যাস্ত দিতে বিচার বিভাগীয় দন্ড।

তবে একখানা সরকারি চাকরি যদি জোটে নারীর কপালে

বররূপী বহুরূপী করে একাডেমী শিক্ষার খানিক কদর;

নয়তো শিক্ষা নাকি বালের।

হয়েছিল তো সাতজন্মের বন্ধনে আবদ্ধ

তবে কেনো একজন্মেই সমস্ত পাবার বাসনায় পরিকরবদ্ধ।

শুনতে চায়না নারীর ইচ্ছা,জানতে চায়না তার খুশি।

নারীদেহ শুধুই ভোগের প্রসাদ,

প্রাপ্য ভেবেই,রাজার রাজা বেজায় সুখী।

নারী স্বাধীনতা চাইলে,শুনতে হয় মাগী,

গুনতে হয় চামড়ায় মারের দাগ,

পুরুষ ভাসিয়ে দেয় সব রোমান্টিক আবেগ

খোরপোষ আর কর্তৃতের ঝর্ণায়।

অন্যায়ের অন্যায় আজও প্রতিবাদহীন

গর্জেওঠা দুএকজন,হারছে;করছে পুনরায় মাথা নত।

তাই দেখে সোকোল্ড স্বামী নিচ্ছে বাহবা

দিচ্ছে হুংকার,করছে নিজস্বার্থ জারি।

এখনও তবু একদলের দাবি

তারা নিষ্ঠা বিচারদাতা,

তাহলে সমাজে আজও নারীর

এ কীসের বিবর্ণতা?

ধন্যবাদান্তে

রমা বেরা, শ্রীচন্দা, উস্থি

সূচিপত্র

ভীতির পুঁজি আনুগত্যের মুনাফা

লিখেছেন – বিপ্লব সেন



ভীতি যেখানে পুঁজি সেথায়

বিশ্বাস হয় মুনাফা,

মুনাফা নয় ডাকাতি চলে

করতে পকেট সাফা।

নানা রকম কায়দা কানুন

সাথে অন্ধবিশ্বাস,

বিশ্বাসের পুঁটুলি চেতনায় ঝোলে

মরার পর "স্বর্গবাস।"

লড়াই করে টিকে থাকা

ইহ জগতের সমাজে,

অন্ন, বস্ত্র বাসস্থান এর যোগান

জীবনের চেষ্টা মাঝে।

মৃত্যুর পর কি হবে ভেবে

ভীতির অন্ধকার,

জীবনের শেষে মৃত্যুর আবেশ

চেতনা মৃত্যুর পারাবার।

বস্তু হয়ে যাবে শরীর

জীবনের পরিসমাপ্তি,

পৃথিবীতে বেঁচে থাকা
জীবনের পরম প্রাপ্তি।

সেই বেঁচে থাকা যাতে হয়
ললিত সুকোমল,
তার জন্যে চাই যে
অর্থের সম্বল।

সেই ভীতি পুঁজি তখন
যখন রমরমা কারবার,
বিরাট মুনাফা অর্থের ঝনঝন
পুরুত পাদ্রী,মৌলভীর পকেট ভরাবার।

অসভ্য বটেই ধূর্ত শয়তান
এটাই কারবারের বহিঃপ্রকাশ,
সত্য চাপা দিয়ে চেতনার
করা সর্বনাশ।

সূচিপত্র

বি শে ষ সং যো জ ন

কেন আমি নাস্তিক

লি খে ছে ন – ভ গ ৎ সিং



একটি নতুন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সর্বশক্তিমান, সর্বত্র বিরাজমান ও সর্বজ্ঞ কোন ঈশ্বরের অস্তিত্বে আমি যে বিশ্বাস করি না, এর কারণ কি আমার আত্মম্ভরিতা? আমি কখনও কল্পনা করিনি যে আমাকে এমন একটা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। কিন্তু কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করে আমার মনে হচ্ছে যে, আমার বন্ধুদের কয়েকজন (তাঁদের বন্ধু বলে ভেবে যদি না আমি অনেক বেশি দাবি করে থাকি) আমার সঙ্গে তাঁদের স্বল্প পরিচিতির ফলে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা আমার দিক

থেকে খুবই বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে এবং কিছুটা আত্মম্ভরিতাই আমার অবিশ্বাসের কারণ! এমন অহংকার আমার নেই যে আমি এই সমস্ত মানবিক বৈশিষ্ট্যের উপরে। আমি একজন মানুষ এবং তার চেয়ে বেশি কিছু না। এর চেয়ে বেশি দাবি কেউ করতেও পারেন না। আমাদের কমরেডদের মধ্যে আমাকে একজন স্বেচ্ছাচারী বলা হত। এমন কি আমার বন্ধু বি. কে. দত্তও কখনও কখনও আমাকে এই সব বলেন। কোনো কোনো সময় স্বেচ্ছাচারী বলে আমাকে ধিক্কারও দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো বন্ধু খুব গুরুত্বের সঙ্গেই অভিযোগ করেন যে, আমি নাকি আমার মতামত ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্যের উপর চাপিয়ে দিই এবং আমার প্রস্তাব পাস করিয়ে নিই। এ যে কিছুটা পরিমাণে সত্য তা আমি অস্বীকার করি না। এ আত্মশ্লাঘা হতে পারে। অন্যান্য জনপ্রিয় মতাদর্শের পাশাপাশি আমার মধ্যে এবং আমাদের আন্দোলনের মধ্যেও আত্মম্ভরিতা আছে, কিন্তু সেটা ব্যক্তিগত কিছু নয়। হয়তো আমাদের আন্দোলন সম্পর্কে এ আমার ন্যায়সঙ্গত গর্ব, দম্ভ নয়। কারও মধ্যে অহেতুক গর্বের আতিশয্যই হল দম্ভ অথবা সঠিকভাবে বলতে গেলে অহংকার। এই রকম কোন অহেতুক গর্ব আমাকে নাস্তিকতার দিকে টেনে এনেছে না কি এবিষয়ে সযত্ন চর্চার ফলে এবং যথেষ্ট বিবেচনার পরই আমি ঈশ্বরে অবিশ্বাস করতে আরাম্ভ করেছি, সেই কথাই আমি এখানে আলোচনা করতে চাই। প্রথমেই আমি

পরিষ্কার করে দিতে চাই যে, আত্মশ্লাঘা এবং দম্ভ দু'টি আলাদা জিনিস।

প্রথমত, আমি একেবারেই বুঝতে পারি না যে কি করে অহেতুক গর্ব বা আত্মশ্লাঘাবোধ কোন মানুষের ঈশ্বর বিশ্বাসের অন্তরায় হতে পারে। বিখ্যাত হওয়ার উপযুক্ত না হয়েও বা প্রয়োজনীয় গুণাবলীর অধিকারী না হয়েও কিছুটা খ্যাতি যদি আমি অর্জন করে ফেলি তাহলে প্রকৃতই মহৎ এমন কোন ব্যক্তির মহত্ত্বকে আমি হেয় করতে পারি। এটুকু না হয় বোঝা যায়। কিন্তু শুধুমাত্র ব্যক্তিগত দম্ভের জন্য কিভাবে একজন ঈশ্বর বিশ্বাসী, অবিশ্বাসীতে পরিণত হতে পারে? শুধুমাত্র দু'টি উপায় আছে। হয়, সেই ব্যক্তিকে নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ভাবতে হবে, নয়ত তাকে নিজেকেই ঈশ্বর বলে ভাবতে হবে। কিন্তু এরা কোনভাবেই যথার্থ নাস্তিক হতে পারছে না। প্রথম ক্ষেত্রে সে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর অস্তিত্বই অস্বীকার করছে না। দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও সে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর নিয়ন্ত্রণকারী হিসাবে পর্দার আড়ালে কোনো সচেতন সত্তার উপস্থিতিকে স্বীকার করছে। সে নিজেকেই ঐ পরম সত্তা মনে করে কিনা কিংবা পরম সত্তাকে তার থেকে স্বতন্ত্র কোন কিছু ভাবে কিনা আমাদের কাছে তার কোন গুরুত্ব নেই। মূল কথাটা ঐখানে। তার বিশ্বাস ঐখানেই। কোন মতেই সে নাস্তিক নয়। তাহলে, প্রথম কিংবা দ্বিতীয় কোন দলেই আমি পড়ি

না। কেননা ঐ সর্বশক্তিমান পরম সত্তার অস্তিত্বকেই আমি অস্বীকার করি। কেন করি সে আলোচনা পরে করা যাবে। এখানে একটা ব্যাপার আমি পরিষ্কার করে দিতে চাই, তা হল আমার দম্ভ আমাকে নাস্তিকতার তত্ত্ব গ্রহণ করতে প্ররোচিত করেছে - এটা ঠিক নয়। প্রতিদ্বন্দ্বী অবতার বা স্বয়ং সেই পরম সত্তা ইত্যাদি কোনো কিছুই আমি নই। একটা বিষয় তাহলে স্থির হয়ে গেছে যে, এমন একটা চিন্তাধারায় পৌঁছানোর কারণ আমার দম্ভ নয়। এই অভিযোগ খণ্ডন করার জন্য ঘটনাগুলোর বিচার করা যাক। আমার এই বন্ধু-বান্ধবদের মতে আমার অসার আত্মশ্লাঘার কারণ সম্ভবত দিল্লির বোমা মামলা এবং লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বিচারে আমার অহেতুক জনপ্রিয়তা অর্জন। বেশ, তাহলে তাদের যুক্তি সঠিক কিনা দেখা যাক। আমার নাস্তিকতার জন্ম খুব সাম্প্রতিককালে নয়। আমি যখন অজ্ঞাত পরিচয় যুবক ছিলাম তখন এই বন্ধুরা কেউ আমায় চিনতেন না, তখনই আমার মধ্যে থেকে ঈশ্বর বিশ্বাস চলে গেছে। সামান্য একজন কলেজ ছাত্রের মধ্যে কোন দাম্ভিকতা থাকতে পারে না, যা তাকে নাস্তিকতার পথে ঠেলে দিতে পারে। যদিও আমি কিছু অধ্যাপকের প্রিয় ছিলাম, কয়েকজনের অপ্রিয়ও ছিলাম, ছাত্র হিসেবে কিন্তু কখনই পরিশ্রমী বা মনোযোগী ছিলাম না তাই দাম্ভিকতার মতো কোনো অনুভূতি পোষণ করার সুযোগই আমি পাইনি। বরং বলা যায় আমি ছিলাম বেশ লাজুক স্বভাবের ছেলে, ভবিষ্যৎ জীবনধারা সম্পর্কে যার মনোভাব ছিল

নৈরাশ্যজনক। ঐ সময়ে আমি পরিপূর্ণ নাস্তিক ছিলাম না। আমার ঠাকুরদা, যাঁর প্রভাবে আমি লালিত পালিত তিনিই ছিলেন একজন গোঁড়া আর্য সমাজী। একজন আর্য সমাজী আর যাই হোক নাস্তিক নন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে আমি লাহোরের ডি এ ভি স্কুলে ভর্তি হই এবং পুরো এক বছর ওখানকার ছাত্রাবাসে ছিলাম। সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় প্রার্থনা ছাড়াও আমি ঘন্টার পর ঘণ্টা গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতাম। ঐ সময় আমি পুরো ভক্ত ছিলাম। পরবর্তীকালে আমি আমার বাবার সঙ্গে বাস করতে আরম্ভ করি। ধর্মীয় পোঁড়ামি সম্পর্কে তিনি ছিলেন উদারচেতা। স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করার জন্য আমার যে ইচ্ছা জাগে তা তাঁরই শিক্ষার ফলশ্রুতি। কিন্তু তিনি নাস্তিক নন। তিনি একজন দৃঢ় আস্তিক, প্রতিদিন পূজার্চনা করতে তিনি আমাকে উৎসাহিত করতেন। সুতরাং, আমি এইভাবেই বেড়ে উঠেছিলাম। অসহযোগ আন্দোলনের সময় আমি ন্যাশনাল কলেজে যোগদান করি। সেখানেই আমি চিন্তার ক্ষেত্রে উদার হতে থাকি এবং বিভিন্ন ধর্মীয় সমস্যা, এমনকি ঈশ্বর সম্পর্কিত আলোচনা- সমালোচনা করতে থাকি। কিন্তু তখন আমি ঘোরতর আস্তিক। ঐ সময় আমি না- ছাঁটা অবিন্যস্ত লম্বা লম্বা চুল রাখতে থাকি। কিন্তু শিখ বা অন্য কোন ধর্মের পৌরাণিক কাহিনী বা মতবাদেও আমি কখনও আস্থা রাখতে পারিনি। তবুও, ঈশ্বরের অস্তিত্বে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

পরবর্তীকালে আমি বিপ্লবী দলে যোগদান করি। প্রথমে আমি যে নেতার সংস্পর্শে আসি তিনি দৃঢ় ঈশ্বর-বিশ্বাসী না হলেও ঈশ্বরের অস্তিত্বে অস্বীকার করতে সাহস পাননি। ঈশ্বর সম্পর্কে আমার বারবার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলতেন, “যখন তোমার ইচ্ছা হয়, প্রার্থনা কর।” এ হল নাস্তিকতাবাদের তত্ত্ব গ্রহণ করতে যে সাহসের প্রয়োজন, তা ছাড়াই নাস্তিক হওয়া। দ্বিতীয় যে নেতার সংস্পর্শে আমি আসি, তিনি ছিলেন পরম ঈশ্বরবিশ্বাসী, তিনি হলেন শ্রদ্ধেয় কমরেড শচীন্দ্রলাল সান্যাল, যিনি তখন করাচী ষড়যন্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছেন। তাঁর বিখ্যাত ও একমাত্র বই ‘বন্দী জীবন' - এর একেবারে প্রথম পৃষ্ঠা থেকেই প্রচন্ডভাবে ঈশ্বরের মহিমা গাওয়া হয়েছে। ঐ চমৎকার বইটার দ্বিতীয় অংশের শেষ পৃষ্ঠায় বেদান্তবাদজনিত চিন্তা থেকে ঈশ্বরের প্রতি যে অতীন্দ্রিয় প্রশংসাবাণী বর্ষিত হয়েছে তা তাঁর চিন্তার একটি বিশিষ্ট অংশ। ১৯২৫ সালের ২৮ শে জানুয়ারি সমগ্র ভারতবর্ষে যে ‘বিপ্লবী প্রচারপত্র বিতরণ করা হয়, মামলার বাদীপক্ষের বক্তব্য অনুসারে তা তাঁরই চিন্তার ফসল। গোপন কাজকর্মে যা অবশ্যম্ভাবী বিশিষ্ট কোনো নেতা নিজস্ব চিন্তাধারা প্রকাশ করেন যা তাঁর নিজের কাছে খুবই প্রিয় এবং মতের ভিন্নতা থাকলেও অন্য কর্মীদের তাতে মৌন সম্মতি দিতে হয়। ঐ প্রচারযন্ত্রের পুরো একটা

প্যারাগ্রাফ সর্বশক্তিমান এবং তাঁর লীলা ও কর্মের প্রশংসায় মুখরিত। এ সবই অতীন্দ্রিয়বাদ, আমি যা দেখতে চাইছি তা হল নাস্তিকতার ধারনা বিপ্লবী দলে অঙ্কুরিত হয়নি। বিখ্যাত কাকরি শহীদদের সকলেই তাদের শেষ দিনগুলো প্রার্থনা করে কাটিয়েছেন। রামপ্রসাদ বিসমিল ছিলেন একজন গোঁড়া আর্যসমাজী। সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ সম্পর্কে ব্যাপক পড়াশোনা থাকা সত্ত্বেও রাজেন লাহিড়ী উপনিষদ ও গীতার শ্লোক আবৃত্তি করার স্পৃহা চেপে রাখতে পারেননি। তাঁদের মধ্যে মাত্র একজনকেই আমি জানি যিনি কখনও প্রার্থনা করেননি। তিনি বলতেন, দর্শন হল মানুষের দুর্বলতা এবং জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার ফল। তিনি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের শাস্তি ভোগ করেছেন। কিন্তু তিনিও ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করার মতো সাহস দেখাননি।

ঐ সময় পর্যন্ত আমি ছিলাম শুধুই একজন কল্পনাপ্রবণ ভাববাদী বিপ্লবী বিশেষ। তখনও পর্যন্ত আমরা কেবল অনুসরণই করতাম। তারপর এলো সমস্ত দায়িত্ব বহন করার সময়। অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ার ফলে কিছুদিনের জন্য দলের অস্তিত্ব রক্ষাই অসম্ভব হয়ে উঠল। শুধু নেতারা নন অতি উৎসাহী কমরেডরাও আমাদের প্রতি বিদ্রূপ বাক্য বর্ষণ শুরু করলেন। কিছুদিনের জন্য আমি ভীত হয়ে পড়লাম যে কোনদিন হয়তো আমিই আমাদের কর্মসূচীর

অসারতায় বিশ্বাসী হয়ে পড়ব। ঐ সময়টা আমার বিপ্লবী জীবনের একটা সন্ধিক্ষণ। আমার মনের আনাচে- কানাচে একটাই কথা বাজতে লাগল - 'জানতে হবে'। প্রতিপক্ষের যুক্তিগুলি খণ্ডন করার জন্য নিজেকে গড়ে তুলতে হলে গভীর ভাবে জানতে হবে, পড়তে হবে। নিজের মতবাদের পক্ষে যুক্তি দ্বারা নিজেকে তৈরি করাতে হলেও পড়াশুনা করতে হবে। আমি পড়তে আরম্ভ করলাম। আমার আগের বিশ্বাস ও বিশ্বাসগুলোর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে গেল। পূর্বসূরিদের থেকে সহিংস পদ্ধতি সম্পর্কে ফাঁকা আবেগ পেয়েছিলাম, এখন তার জায়গায় সুচিন্তিত ধারণা গড়ে উঠল। ভাববাদকে বিদেয় করে দিলাম, অন্ধ বিশ্বাস থেকেও মুক্ত হলাম। বাস্তববাদ (realism) আমাদের আদর্শ হয়ে দাঁড়াল। বড় রকম প্রয়োজনের সময়ই শক্তি প্রয়োগের পদ্ধতি সমর্থনযোগ্য এবং নীতি হিসাবে সমস্ত রকমের গণ-আন্দোলনে অহিংসা অপরিহার্য। এই হল পদ্ধতি সম্পর্কিত কথা। তবে সবচেয়ে বড় কথা হল, যে বৃহত্তর উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা সংগ্রাম করছি সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা গড়ে তোলা দরকার। বাইরে যেহেতু সে সময়ে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল না তাই বিশ্ব বিপ্লবের বিভিন্ন তত্ত্ব ও আদর্শ সম্পর্কে পড়াশোনা করার বিস্তর সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। নৈরাজ্যবাদী নেতা বাকুনিন, সাম্যবাদের (communism) মার্ক্সের কিছু এবং লেনিন ও ট্রটস্কি এবং অন্যান্যদের অনেক লেখা পড়লাম যাঁরা তাঁদের দেশে সাফল্যের সঙ্গে বিপ্লব সংগঠিত

করেছেন। এরা সকলেই ছিলেন নাস্তিক। বাকুনিনের ঈশ্বর ও রাষ্ট্র (God & State) টুকরো টুকরো হলেও ঐ বিষয়ে কৌতুহলোদ্দীপক গবেষণা, আরও পরে নিরালম্ব স্বামী লিখিত 'সাধারণ জ্ঞান' (Common sense) নামে একটা বই পেলাম, এটা ছিল একরকম অতীন্দ্রিয় নাস্তিকতাবাদ, আমার কাছে বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল। বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন এমন সর্বশক্তিমান পরম সত্তার অস্তিত্ব সম্পর্কিত তত্ত্বের অসারতায় আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাল ১৯২৬ সালের শেষাশেষি, আমার অবিশ্বাস আমি প্রকাশ করলাম। আমার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা শুরু করলাম এবং আমি একজন সুস্পষ্ট নাস্তিক হয়ে গেলাম। কিন্তু তাতে অবস্থাটা কিরকম দাঁড়াল তা আমি আলোচনা করছি।

১৯২৭ সালের মে মাসে আমি লাহোরে গ্রেপ্তার হলাম। ধরা পড়াটা হয়েছিল হঠাৎ, পুলিস যে আমায় খুঁজছে তা আমি একেবারেই জানতাম না। আমি যাচ্ছিলাম একটা বাগানের মধ্যে দিয়ে, হঠাৎ দেখি পুলিস আমায় ঘিরে ফেলেছে, খুব অবাক লাগে ঐ সময় আমি খুব শান্ত ছিলাম। কোনোরকম অনুভূতি বা উত্তেজনাও আমার হচ্ছিল না। আমাকে পুলিস হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হল। পরদিন আমাকে পাঠানো হল রেলওয়ে পুলিস হেফাজতে। সেখানে আমাকে পুরো একমাস কাটাতে হয়। পুলিস অফিসারদের সঙ্গে

অনেকদিনের আলাপ-আলোচনায় আমি বুঝতে পারলাম যে কাকোরি পার্টির সঙ্গে আমার যোগাযোগ সম্পর্কে ও বিপ্লবী আন্দোলনে আমার অন্যান্য কার্যকলাপ সম্পর্কে তাদের কাছে কিছু তথ্য আছে। তারা বললেন যে, লখনৌতে যখন কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা চলছিল তখন আমি নাকি সেখানে ছিলাম এবং বন্দীদের মুক্ত করার জন্যে আমি কয়েকটি পরিকল্পনা এঁটেছিলাম। তাদের সমর্থন পাওয়ার পরই আমরা কিছু বোমা সংগ্রহ করেছিলাম এবং পরীক্ষামূলকভাবে সেগুলির একটি নাকি ১৯২৬ সালে দশহরা উৎসবের ভিড়ের মধ্যে আমরা ছুঁড়েছিলাম। আমার প্রতি দয়া দেখিয়ে তারা আরও বলেছেন যে বিপ্লবী দলের গোপন কাজকর্ম সম্পর্কে কোনো হদিশ যদি দিই তাহলে আমায় বন্দী তো করা হবেই না, বরং ছেড়ে দেওয়া হবে এবং রাজসাক্ষীরূপে কোর্টে না দাঁড় করিয়ে আমায় পুরস্কার দেওয়া হবে। এ প্রস্তাব আমি হেসে উড়িয়ে দিলাম, এ সমস্তই ছিল ফালতু কথা! আমাদের মতো আদর্শ যাঁরা নিয়ে চলেন তাঁরা কখনই নিজেদের নির্দোষ দেশবাসীর উপর বোমা ছুঁড়তে পারেন না। একদিন সকালে তখনকার সি আই ডি-র সিনিয়র সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ নিউম্যান এলেন। অনেক দরদভরা কথাবার্তার পর তিনি খুব দুঃখের খবরটি দিলেন যে, তাঁরা যেমন চাইছেন তেমন কোনো বিবৃতি যদি আমি না দিই তাহলে কাকোরি মামলায় যুদ্ধ বাধানোর যড়যন্ত্রে ও দশহরার দিন বোমা ছুঁড়ে নৃশংস হত্যাকাণ্ডে যুক্ত থাকার জন্য আমাকে বিচারের জন্য

পাঠাতে তারা বাধ্য হবেন। তিনি আমায় আরও জানালেন যে, আমাকে দোষী সাব্যস্ত করার ও ফাঁসিকাঠে ঝোলানোর মতো যথেষ্ট প্রমাণ তাঁর হাতে আছে। ঐ সময় আমি বিশ্বাস করতাম যে আমি নির্দোষ হলেও পুলিস আমাকে ফাঁসি দিতে পারত। ঐদিনই কয়েকজন পুলিস অফিসার দু'বেলাই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার জন্য আমায় প্ররোচিত করতে লাগলেন, তখন আমি একজন নাস্তিক। আমি চাইছিলাম নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে। শুধু কি শান্তি ও আনন্দের সময়ই আমি নিজেকে নাস্তিক বলে জাহির করার ক্ষমতা রাখি, না কি এই রকম দুঃসময়েও আমি আমার আদর্শে অবিচল থাকতে পারব। অনেক বিবেচনার পর আমি ঠিক করলাম যে ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখতে ও প্রার্থনা করতে আমি পারব না। আমি কখনও করিনি। এটাই ছিল আসল পরীক্ষা এবং তাতে আমি উত্তীর্ণ হলাম। মুহূর্তের জন্য অন্য কিছুর পরিবর্তে নিজের গর্দান বাঁচানোর ইচ্ছা আমি পোষণ করিনি। সুতরাং আমি ছিলাম একজন একনিষ্ঠ নাস্তিক এবং তারপর থেকে আমি তা-ই রয়ে গেছি। ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। বিশ্বাস কষ্টকে হালকা করে। দেয়।। এমনকি কখনও কখনও তাকে মজাদারও করে তুলতে পারে। ভগবান মানলে মানুষ প্রায় সময়ই যথেষ্ট সান্ত্বনা ও সমর্থন পেতে পারে। আর তা না হলে মানুষকে নিজের মানসিক শক্তির উপর নির্ভর করতে হয়। ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যে নিজের মানসিক শক্তির ওপর নির্ভর করা ছেলেখেলা নয়। যদি

কোনো দম্ভ থাকে, ঐ রকম মুহূর্তে তা কোথায় উড়ে যাবে আর প্রচলিত বিশ্বাসকে মানুষ আঁকড়ে ধরতে চাইবে। যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস না করেই কেউ স্থির থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে শুধু দম ছাড়াও অন্য কোনো না কোনো শক্তি তার মধ্যে কাজ করছে। এখন হচ্ছে ঠিক সেই অবস্থা। বিচারের রায় সকলেরই জানা, সপ্তাহখানেকের মধ্যেই তা ঘোষিত হবে। একটা আদর্শের জন্যই যে আমি আমার জীবন বিসর্জন দিতে যাচ্ছি এছাড়া আমার আর কি সান্ত্বনা থাকতে পারে? ঈশ্বর-বিশ্বাসী একজন হিন্দু রাজা হিসাবে পুনর্জন্মের আশা করতে পারেন। একজন মুসলমান অথবা খ্রিষ্টান স্বর্গের বিলাসিতা উপভোগ করার ও দুঃখ-কষ্ট ত্যাগের জন্য পুরস্কৃত হওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারেন। কিন্তু আমি কি প্রত্যশা করতে পারি? আমি জানি যে-মুহূর্তে আমার গলার দড়ি পরিয়ে দেওয়া হবে এবং আমার পায়ের তলা থেকে আড়কাঠ সরিয়ে দেওয়া হবে, সেটাই হবে চরম মুহূর্ত এবং শেষ মুহূর্ত। আমি এবং অধিবিদ্যার (metaphysics) ভাষ্য অনুযায়ী আমার আত্মা, সব সেইখানেই শেষ হয়ে যাবে। আর কিছুই থাকবে না। একটা খুবই ছোট জীবনের কোন মহৎ কীর্তিহীন, গৌরবহীন সমাপ্তি! এটাকেই যদি সাহসের সাথে মেনে নিতে পারি, সেটাই হবে আমার জীবনের সবথেকে সেরা পুরস্কার।

এটাই হল আসল কথা। ইহজগতে ও স্বর্গলোকে গিয়ে পুরস্কার পাব এমন ইচ্ছা বা বাসনা আমার নেই। একেবারেই নিঃস্বার্থ ভাবে আমি আমার দেশের মুক্তির জন্যে গোটা জীবন উৎসর্গ করে গেলাম, কারণ এটা ছাড়া আমার আর কিছু দেওয়ার ছিল না। যেদিন আমরা দেখতে পাব, এক বড় সংখ্যক নরনারী যখন শুধুই শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য, মানব জাতির সেবার জন্যে দলে দলে এগিয়ে আসছে, সেদিনই আমার মতো মানুষের জীবন উৎসর্গ সার্থক হবে। তখন শুরু হবে মানব জাতির সত্যিকারের মুক্তির দিন। মৃত্যুর পরে "স্বর্গে গিয়ে বা 'পরের জন্মে রাজা' হতে নয় বা এই জন্মে কোন পুরস্কার লাভের জন্যেও নয়, গোটা মানব জাতির থেকে দাসত্বের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে অত্যাচারী ও শোষকদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে স্বাধীনতা ও শান্তির পথ তৈরি করতেই ব্যক্তিগত আত্মঘাতী পথে নিজেদের মহৎ প্রাণ উৎসর্গ করে গেছেন এমন পথটাই হল - গর্বময় জীবনের পথ। এই মহৎ কাজের জন্য যে গর্ববোধ, তাকে কী শুধু "অহংকার' বলে খাটো করতে হবে? যারা এই রকমের ঘৃণাভরা বিশেষণ ব্যবহার করে তাদের আমরা বলি হয় নির্বোধ, নয় শয়তান।

যদিও এই মহান আত্মত্যাগের মধ্যে যে অনুভূতির প্রাচুর্য, যে ভাবালুতা, যে উদ্দীপনা, যে মহানুভবতা ও বিশালতা

আছে তা বুঝতে না পারার জন্য আমরা তাদের ক্ষমা করতে পারি। কারণ তাদের হৃদয় মৃত ধ্বংসস্তূপের মত, দৃষ্টিভঙ্গি সংকীর্ণ, অন্য কোন স্বার্থের নিচে তাদের মন চাপা পড়ে আছে।

আত্মবিশ্বাসকে প্রায়ই অহংকার বলে ভুল করা হয়। এটা যতটা দুঃখজনক, ততটাই শোচনীয়। কিন্তু তবুও কিছু করার নেই।

যখন দেখি, কোনো প্রচলিত বিশ্বাসের বিরোধিতা করতে অথবা সাধারণ মানুষের চোখে সবসময় অভ্রান্ত এমন কোনো নেতা বা মহান ব্যক্তির সমালোচনা করতে, অমনি অসংখ্য লোক দল বেঁধে তেড়ে আসবে আপনাকে দাম্ভিক বা হামবড় বলে হেয় প্রতিপন্ন করতে। সমালোচনা ও স্বাধীন চিন্তা একজন বিপ্লবীর পক্ষে দুটো খুবই দরকারি গুণ। যেহেতু মহাত্মাজী মহান, সেহেতু কারও উচিৎ নয় তাঁর সমালোচনা করা। যেহেতু তিনি উঁচুতে উঠে গেছেন, সেজন্যে রাজনীতি বা ধর্ম, অর্থনীতি বা নৈতিকতার ক্ষেত্রে যা কিছু তিনি বলেন সবটাই ঠিক। আপনি বিশ্বাস করুন বা নাই করুন আপনাকে বলতেই হবে, হ্যাঁ, এটাই ঠিক। এ মানসিকতা প্রগতির পথে বাধা। সোজা কথায় এ জিনিষ প্রতিক্রিয়াশীলতা।

যেহেতু আমাদের পূর্বপুরুষরা এক পরম সত্তার, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সম্পর্কে এমন এক প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বাস

তৈরি রেখে গেছেন যার ফলে যদি কোন লোক সেই প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বাসের যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বা সেই 'পরম সত্তার' বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানান, তবে তাকে স্বধর্ম ত্যাগী, বিশ্বাসঘাতক বলে গাল দেওয়া হবে। যদি তার যুক্তিগুলো এমন জোড়ালো হয় যে পাল্টা যুক্তি দিয়ে তাকে থামানো বা হারানো যাচ্ছে না তখন তাকে পরম সত্তার অভিশাপের ভয় দেখিয়ে থামিয়ে দেওয়া হবে এবং তখন তাকে হামবড় বলে নিন্দে করা হবে, তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তাকে দম্ভ বলে অপমান করা হবে। তাহলে ফালতু এই আলোচনায় সময় নষ্ট করে কী হবে? সবার আগে এইরকম একটা প্রশ্ন সাধারণ মানুষর সামনে আসছে এবং এর একটা বাস্তবসম্মত সমাধান করার চেষ্টা করা হচ্ছে - এই জন্যেই এত বড় আলোচনার আয়োজন করা।

ফলে, প্রথম প্রশ্ন নিয়ে আমি বলব, দম্ভ যে আমায় নাস্তিকতার দিকে ঠেলে দেয়নি এ বিষয়টা আমি পাঠকদের সামনে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে পেরেছি।। যুক্তিসঙ্গতভাবে তা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি কিনা সে বিচারের দায়িত্ব পাঠকদের। আমি জানি, আমার বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস থাকলে আমার জীবনকে তা অনেক স্বচ্ছন্দ করে তুলতে পারত, মনের চাপ হালকা করতে পারত। অন্যদিকে ঈশ্বরে অবিশ্বাস আমার চারপাশের পরিবেশকে নীরস করে তুলেছে, হয়ত

তা আরও কষ্টকর হয়ে উঠতে পারে, আবার একটুখানি আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া তাকে অনেকটা কাব্যময় করে তুলতে পারত। কিন্তু ভবিষ্যতের মুখোমুখি হতে গিয়ে আমি কোন অহেতুক উন্মাদনার সাহায্য নিতে চাই না। আমি একজন বাস্তববাদী, শাণিত যুক্তিবিজ্ঞানই আমার হাতিয়ার, তাই দিয়েই আমি আমার ভিতরের প্রবৃত্তিকে জয় করতে চাই। এই ব্যাপারে যে আমি সবসময়ই সফল হয়েছি তা নয়, কিন্তু আমাদের উচিত বারে বারে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া, কেননা সাফল্য নির্ভর করে ঘটনাচক্র আর বাস্তব পরিস্থিতির উপরে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, দম্ভ যদি কারণ না হয়, তাহলে প্রচলিত আস্তিক্যবাদে অবিশ্বাস করার অন্য কোন কারণ থাকা উচিত? হ্যাঁ, অবিশ্বাস করার মত যথেষ্ট যুক্তি আমার আছে। আমি এখন সেই আলোচনায় আসব। আমার মতে, যার এতটুকু যুক্তিতর্কের ক্ষমতা আছে তিনি বিচার বিশ্লেষণ করেই বাস্তব পরিস্থিতিকে বোঝার চেষ্টা করেন। সরাসরি প্রমাণ যেখানে নেই সেখানে ধর্মীয় দর্শন মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। আমি আগেই বলেছি আমার এক বিপ্লবী বন্ধু বলতেন- “মানুষের দুর্বলতাতেই ধর্মীয় দর্শনের জন্ম।” প্রাচীনকালে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এবং এক কার্যকারণ সম্পর্কে চিন্তাভাবনার করার যখন সুযোগ ছিল কিন্তু সরাসরি বোঝার মত যথেষ্ট

উপাদান ছিল না, তখন আমাদের পূর্বপুরুষরা মনগড়া উপায়ে এই সমস্যার সমাধান খুঁজতেন। সেইজন্যেই বিভিন্ন ধর্মমতগুলোর মূল তত্ত্বের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় যেটা কোনো কোনো সময়ে পরস্পর বিরোধী রূপ নেয়, নিজেদের মধ্যে দাঙ্গা-মারামারি ও অশান্তির জন্ম দেয়। শুধুমাত্র পূর্ব-পশ্চিমের ধর্মের মধ্যেই পার্থক্য দেখা যায় তা নয়, এমনকি একই গোলার্ধে নানা ধর্মমতের মধ্যেও বড় পার্থক্য দেখা যায়। যেমন আমাদের প্রাচ্যের হিন্দুধর্মের সঙ্গে মুসলিম ধর্মের মধ্যে কোনো মিল নেই। এই ভারতবর্ষেই বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্ম থেকে কত আলাদা, আবার এই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যেই আছে সনাতন ধর্ম ও আর্যসমাজের মতো মতামত যারা একে অপরের প্রায় উল্টো। 'চার্বাক' আমাদের দেশের আরেক প্রাচীন চিন্তাবিদ, যিনি এক স্বতন্ত্র মতবাদের প্রবক্তা, তিনি সেই কোন সুদূর অতীতেই ঈশ্বরের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন। অর্থাৎ কিছু মৌলিক প্রশ্নে এই ধর্মগুলোর একটার সঙ্গে আরেকটার যথেষ্ট বিরোধ আছে, আর প্রত্যেকেই ভাবে তার নিজের ধর্মটাই ঠিক। সমস্যাটা ঠিক এখানেই। কিন্তু আজকের দিনে প্রাচীন মুনি-ঋষিদের চিন্তা ও বানীকে অজ্ঞতার বিরুদ্ধে ভবিষ্যতের এগিয়ে চলার পথে অবলম্বন হিসাবে আমরা গ্রহণ করছি না, বা এই রহস্যের দরজা খোলার চেষ্টা করছি না, উল্টে জড়তার শিকার হয়ে গিয়ে অন্ধবিশ্বাসের অন্ধকার তৈরি করছি, তাঁদের বক্তব্যের প্রতি

অনড় ও অচল বিশ্বাস গড়ে তুলেছি, আর এইভাবেই গোটা সমাজে এগিয়ে চলার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছি।

যে মানুষ প্রগতির পক্ষে, পুরানো বিশ্বাসের প্রত্যেকটি উপাদানকে তাকে সমালোচনা করতে হবে, সন্দেহের চোখে দেখতে হবে ও প্রয়োজনে অবিশ্বাসও করতে হবে। প্রচলিত বিশ্বাসের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয়কেই চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বুঝতে লাগবে। অনেক তর্কাতর্কি ও আলাপ-আলোচনার পর যদি কেউ কোন মতবাদ বা দর্শনে আস্থা রাখে তবে তাকে স্বাগত জানানো যেতে পারে। যদি তার বিচারের ধারা সঠিক পথ নাও খুঁজে পায় বা ভুল পথে এগোয় তবুও তাকে সংশোধন করে সঠিক পথে নিয়ে আসা সম্ভব, কারণ যুক্তিই হল তার জীবনের ধ্রুবতারা। কিন্তু সবথেকে ক্ষতিকারক পথ হল অন্ধবিশ্বাস। কারণ, সে জিনিষ মাথার বুদ্ধিকে ভোঁতা করে দিয়ে মানুষকে ভুল পথে ঠেলে দেয়। যিনি নিজেকে বস্তুবাদী বলে দাবি করেন তাঁকে সমস্ত সনাতন ধ্যানধারণাকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে, যুক্তিতর্কের শাণিত আক্রমণের মুখে যদি দাঁড়াতে না পারে তবে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে। তখন তার প্রথম কাজ হবে পুরানো চিন্তা-ভাবনার সবকিছু ভেঙ্গেচুরে নূতন দর্শন সৃষ্টির জমি তৈরি করা। এটা হল নেতিবাচক দিক, পুরাতন কে বাদ দেওয়ার দিক। এরপর শুরু হবে ইতিবাচক দিক, সেখানে পুরাতন চিন্তার মধ্যে থেকে দরকারি উপাদানকে

নতুন চিন্তাধারার মধ্যে আত্মস্থ করে নিতে হতে পারে। আমার নিজের কথা বলতে গেলে মানতে হবে এ বিষয় নিয়ে আমি বেশি পড়াশুনা করতে পারিনি। প্রাচ্য দর্শনের নানা দিক নিয়ে পড়াশুনা করার খুব ইচ্ছা ছিল, যদিও তার সুযোগ আর পেলাম না। কিন্তু পুরানো বিশ্বাসের যৌক্তিকতা নিয়ে আলোচনার প্রশ্নে আমার যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস আছে, এ ক্ষেত্রে আমি খুব নিশ্চিন্ত বোধ করি। এমন কোন পরমসত্তা নেই যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গতি প্রকৃতি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করছেন, সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিন্ত। বিশ্বপ্রকৃতির অস্তিত্বে আমার বিশ্বাস আছে এবং সকল প্রগতিশীল আন্দোলনের উদ্দেশ্যই হল সমাজের প্রয়োজনে প্রকৃতির ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। এটাই হল আমাদের দর্শনের মূল কথা।

এখন নেতিবাচক দিক দিয়ে আস্তিক্যবাদীদের কাছে কয়েকটা প্রশ্ন তুলে ধরতে চাই। আপনাদের বিশ্বাস অনুযায়ী যদি সর্বশক্তিমান সর্বত্র বিরাজমান, সর্বজ্ঞ এক ঈশ্বর থেকে থাকেন যিনি এই পৃথিবী বা বিশ্বজগতকে সৃষ্টি করেছেন, তাহলে আপনাদের উত্তর দিতে হবে তার এই পৃথিবী ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী? দুঃখ-দুর্দশায় ভরা কত অসংখ্য হৃদয়ভাঙ্গা ঘটনার শাশ্বত রঙ্গমঞ্চে যেখানে একটা মানুষও পরিপূর্ণ সুখভোগ করতে পারে না?

বলবেন না এ তাঁরই বিধান অনুরোধ করছি। যদি তিনি কোনো বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন, তাহলে তিনি সর্বশক্তিমান নন। তিনি আমাদের মতোই আরেকজন ক্রীতদাস। দয়া করে এটা বলবেন না যে, এসব তাঁর লীলা। সম্রাট নিরো এক রোম নগরী জ্বালিয়েছিলেন। খুবই অল্প সংখ্যক মানুষকে হত্যা করেছিলেন তিনি। তার পরিপূর্ণ আনন্দের জন্য তিনি খুবই কম পরিমাণ মানুষের মৃত্যুর কাহিনী তৈরি করেছিলেন। ইতিহাসে তিনি কী স্থান পেলেন? ঐতিহাসিকেরা কী নামে তাকে চিহ্নিত করেন? সমস্ত রকমের বিদ্বেষপূর্ণ বিশেষণ তার ওপর বর্ষিত। অত্যাচারী হৃদয়হীন নিষ্ঠুর নিরোর প্রতি যে তীব্র নিন্দা ভরা গালাগাল জুটেছে তাতে ইতিহাসের পাতা কালো রঙ ধারণ করেছে। এক চেঙ্গিস খাঁ কয়েক শত জীবন নষ্ট। করেছিল নিজের আনন্দের জন্য এবং আমরা এই নামটাকেও পর্যন্ত ঘৃণা করি। তাহলে কিভাবে আপনারা আমাদের সর্বশক্তিমান শাশ্বত নিরোকে সমর্থন করছেন যিনি প্রতিদিন প্রতি ঘণ্টায় প্রতি মিনিটে অসংখ্য হত্যার কাহিনী তৈরি করেছেন এবং করছেন? কিভাবে আপনারা তাঁর দুষ্কর্মকে সমর্থন করতে পারেন যিনি প্রত্যেক মুহূর্তে চেঙ্গিস খাঁর দুষ্কর্মকে অতিক্রম করে যায়? আমার কথা হল কেন তিনি পৃথিবীকে সৃষ্টি করতে গেলেন যা যথার্থই নরক, যা প্রতিনিয়ত তীব্র অশান্তির ক্ষেত্র? কেন এই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করতে গেলেন যখন তাঁর তা না করার ক্ষমতাও ছিল? এ সবের যৌক্তিকতা কোথায়? আপনারা কি পরজন্মে

নির্দোষ ভুক্তভোগীদের পুরস্কারের কথা এবং দুষ্কর্মকারীদের শাস্তিবিধানের কথাও বলতে চান? ভাল, ভাল, যে ব্যক্তি আপনার শরীরে প্রথমে আঘাত করে ক্ষত বানিয়ে পরে খুব কোমল ও আরামদায়ক মলমের প্রলেপ দেওয়ার সাহস পায় তাকে আপনারা কতটা সমর্থন করবেন? গ্ল্যাডিয়েটর প্রতিষ্ঠানগুলোর সংগঠকরা ক্ষুধার্ত হিংস সিংহের সামনে মানুষকে ছেড়ে দিত, আর সেই মানুষ যদি কোনরকমে ঐ জন্তুর হাতে মৃত্যুর থেকে বেঁচে যেত তবে তাদের পরবর্তীকালে ভালভাবে দেখাশোনা করা হত। এ ব্যাপারটাই বা কতটা ন্যায্য ছিল? এ জন্যই আমার প্রশ্ন - কেন সেই সচেতন পরম সত্তা এই পৃথিবী ও তার অন্তর্গত মানুষগুলোকে সৃষ্টি করলেন? মজা পাওয়ার জন্য? তাহলে তাঁর ও নিরোর মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়?

মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের কাছে জানতে চাই - হিন্দু দর্শন আরও একটা যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করবে সেই প্রশ্নের জবাবে আপনারা কি বলবেন? আপনারা তো পূর্বজন্মে বিশ্বাস করেন না। হিন্দুদের মতো, আপাত নির্দোষ দুর্দশাগ্রস্থদের পূর্বজন্মে করা কোন পাপকাজের যুক্তি আপনারা দেখাতে পারবেন না। আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করি কথার মাধ্যমে জগত সৃষ্টি করার জন্য কেন সর্বশক্তিমান ছয়দিন ধরে পরিশ্রম করলেন এবং প্রতিদিন কেন 'সব কিছুই ভাল আছে' বললেন। আজ তাঁকে ডাকুন।

অতীত ইতিহাস তাকে দেখান, বর্তমান অবস্থা নিরীক্ষণ করতে দিন। দেখা যাক তিনি বলতে সাহস পান কিনা - ‘সব ভাল আছে’।

অন্ধকার কারাগার থেকে কুঁড়ে ঘরে ও বস্তিতে বস্তিতে লক্ষ লক্ষ মানুষকে কুরে কুরে খাওয়া অনাহারের গহ্বর থেকে, রক্তচোষা পুঁজিপতিদের দ্বারা নিজেদের রক্ত চুষে নেওয়ার প্রক্রিয়া দেখতে অত্যন্ত ধৈর্যশীল অথবা উদাসীন শ্রমিকদের থেকে, সামান্যতম বোধশক্তি আছে এমন মানুষও শিউরে উঠবে মনুষ্য শক্তির যে অপচয় দেখে সেখান থেকে, এমন কি অতিরিক্ত উৎপাদন বন্টন করার পরিবর্তে সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার মতো পছন্দ থেকে তাকে দেখানো মানুষের হাড়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত ধনীর প্রাসাদ, তিনি বলুন 'সব ঠিক আছে'। আমার প্রশ্ন কেন? কোন কারণ?' আপনারা নীরব, ঠিক আছে, তাহলে আমি এগিয়ে যাই।

হিন্দুরা, আপনারা বলেন, বর্তমানের দুর্দশাগ্রস্থরা সকলেই আগের জন্মের পাপী। ভাল কথা। আপনারা বলেন, এখনকার অত্যাচারীরা আগের জন্মে সৎ মানুষ ছিলেন এবং এ জন্য তারা এখন ক্ষমতা ভোগ করেন। আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে আপনাদের পূর্বপুরুষরা বেশ চালাক লোক ছিলেন। যুক্তি ও অবিশ্বাসের সকল তত্ত্বকে চুরমার করার জন্য যথেষ্ট মজবুত তত্ত্ব বের করার চেষ্টা

তারা করেছিলেন। কিন্তু এ যুক্তি কতটা ধোপে টেকে সেটাই দেখা যাক।

খুব বিখ্যাত আইনজ্ঞদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী কেবল তিন বা চারটি দিক থেকে অন্যায়কারীদের যে শাস্তি প্রদান করা হয় তা সঠিক বলে মানা হয়। এগুলো হল, প্রতিশোধাত্মক (মৃত্যুদণ্ড জাতীয় শাস্তি), প্রতিরোধাত্মক (ভয় দেখিয়ে থামানো) ও সংশোধনাত্মক (চরিত্র সংশোধন বা পরিবর্তন)। অগ্রগামী সকল চিন্তাবিদ প্রতিশোধাত্মক তত্ত্বকে নিন্দা করেন। প্রতিরোধাত্মক তত্ত্বেরও একই দশা। সংশোধনাত্মক তত্ত্বই একমাত্র মানব প্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য। এর লক্ষ্য হল, দুষ্কৃতকারীকে অত্যন্ত যোগ্য ও শান্তিপ্রিয় নাগরিকরূপে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু যদি আমরা ধরেও নিই যে সেই মানুষেরা দুষ্কৃতকারী তাহলে তাদের উপর ঈশ্বর যে শাস্তিবিধান করেন তার প্রকৃতি কী রকম? আপনারা বলেন তিনি তাদের গরু, বিড়াল, গাছ, লতাপাতা অথবা পশুরূপে জন্মগ্রহণ করার জন্য পাঠান। আপনারা মনে করেন যে, এ সকল শাস্তি চুরাশী লক্ষ রকমের। আমি জিজ্ঞাসা করি, মানুষের উপর এর সংশোধনাত্মক প্রতিক্রিয়া কি রকম? কতজন লোকের সন্ধান আপনারা পেয়েছেন যারা স্বীকার করে যে দুষ্কর্ম করার জন্য তারা আগের জন্মে গাধা হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছিল? কেউ না। পুরাণের লাইন টেনে

আনবেন না। আপনাদের পৌরাণিক গল্প ছোঁয়ার সুযোগ আমার নেই। তারপরেও আপনারা কি জানেন যে গরিব হওয়া এ পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় পাপ? দারিদ্র্য একটা পাপ একটা শাস্তি! আমি জিজ্ঞাসা করি, কোন অপরাধতাত্ত্বিক, আইনজ্ঞ - অথবা আইনসভার সদস্য যদি এমন শাস্তি দেন বা যদি এমন প্রস্তাব আনেন যা অনিবার্যভাবেই মানুষকে আরও বেশি রকমের গর্হিত কাজ করতে বাধ্য করে, তাহলে তাদের মূল্য কি বিচার করবেন? এ চিন্তা কি আপনাদের ভগবান করেননি, নাকি তাঁকেও ঐ সব জিনিষ শিখতে হয়েছে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে, মানুষের অকথিত দুঃখ-কষ্টের বিনিময়ে। গরিব এবং অশিক্ষিত চামার কিংবা মেথর পরিবারে জন্মেছে এমন একজন মানুষের ভাগ্য সম্পর্কে আপনার মতামত কী? সে গরিব, তাই লেখাপড়া করতে পারে না। তার পাশের মানুষের দ্বারাই সে ঘৃণিত ও বর্জিত। তথাকথিত উঁচু জাতে জন্মেছে বলে যারা নিজেদের মানুষ বলে মনে করে তার অজ্ঞতা, তার দারিদ্র্য এবং তার প্রতি যে ব্যবহার করা হয়, সব মিলিয়ে সমাজের প্রতি তার হৃদয় কঠিন হয়ে উঠবে। ধরুন সে একটা গর্হিত কাজ করে ফেলেছে, কে তার ফল ভোগ করবে? ভগবান সে নিজে অথবা সমাজের শিক্ষিত ব্যক্তিরা? উদ্ধত এবং আত্মম্ভরি ব্রাহ্মণেরা ইচ্ছাকৃতভাবে যে সব লোককে অজ্ঞাত রেখেছে এবং আপনাদের পবিত্র জ্ঞানগ্রন্থ বেদের কয়েকটা বাক্য শ্রবণ করে পরিচালিত হওয়ার দলে পড়ে যাদের শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে তাদের শাস্তি সম্পর্কে কী হবে?

যদি তারা কোন অপরাধ করেও থাকে, কাদের তার জন্য দায়ী হওয়া উচিত এবং কাদের আসল ফলটা ভোগ করার কথা? বন্ধু, এ তত্ত্বগুলো সুবিধাভোগীদের আবিষ্কার। এই সব তত্ত্বের দ্বারা তারা তাদের দখলীকৃত ক্ষমতা, সম্পদ ও কৌলীন্য সমর্থন করে। সম্ভবত আপটন সিনক্লেয়ারই কোথাও লিখেছিলেন যে, কোন মানুষকে একবার শুধু অমরত্বে বিশ্বাসী করে তোলো এবং তারপর তার থেকে সমস্ত সম্পত্তি লুটে নাও। সে তোমায় নির্দ্বিধায় সাহায্য করবে। ধর্মপ্রচারক ও ক্ষমতালোভী শাসকদের মিলিত স্বার্থের প্রয়োজনে জেলখানা, ফাঁসিমঞ্চ, চাবুক ও এ ধরনের তত্ত্বগুলো আমদানি হয়েছে।

যখন কোন মানুষ কোন পাপ বা অপরাধমূলক কাজ করছে, তখন কেন আপনাদের সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাদের সবাইকে থামিয়ে দিতে আসেন না? তিনি তো খুব সহজেই এটা করতে পারেতেন, কেন তিনি যুদ্ধবাজদের অন্তরেই যুদ্ধোন্মাদনাকে নিঃশেষ করেন না এবং মহাযুদ্ধ মানবতার ওপর যে দুর্যোগ নিয়ে আসে, কেন এভাবে তিনি তা পরিহার করেন না? কেন তিনি ব্রিটিশ জাতির অন্তরে ভারতবর্ষের স্বাধীন করে দেওয়ার ইচ্ছা জাগিয়ে তোলেন না? কেন তিনি পুঁজিপতিদের অন্তরে একটুখানি ভাল কাজ করার উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলেন না যাতে তারা সামাজিক উৎপাদনের হাতিয়ারগুলোর উপরে তাদের ব্যক্তিগত

মালিকানার অধিকার পরিত্যাগ করতে পারে এবং এইভাবে সমস্ত শ্রমজীবী মানুষকে - না, সমগ্র মানবসমাজকেই পুঁজিবাদী বন্ধন থেকে মুক্তিদান করে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বের প্রয়োগযোগ্যতা সম্পর্কে আপনারা আলোচনা করতে চান, আমি আপনাদের সর্বশক্তিমানের ওপর ব্যাপারটা ছেড়ে দিলাম। সামগ্রিক মঙ্গলসাধন যখন বিবেচ্য তখন সমাজতন্ত্রের গুণাবলী সবাই স্বীকার করেন। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য নয় এই অজুহাতে তারা এর বিরোধিতা করেন। সেই সর্বশক্তিমানকে এসে সব কিছু সুশৃঙ্খলভাবে সাজাতে বলুন। উল্টো-পাল্টা যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করবেন না কাজ হবে না। আমি বলতে - চাই, ঈশ্বর ইচ্ছা করেন বলেই ব্রিটিশ রাজ এখানে আছে এমন নয়। বরং বলা যায় তারা এখানে আছে কারণ তাদের ক্ষমতা আছে এবং তাদের বিরোধিতা করার মতো সাহস আমাদের নেই। ঈশ্বরের সাহায্যে নয়, বন্দুক ও রাইফেল, বোমা, গুলি, পুলিস ও সেনাবাহিনীর সাহায্যেই তারা আমাদের অধীন রেখেছে এবং আমাদের অনীহার জন্যই এক জাতি কর্তৃক অন্য জাতির জঘন্য রকমের শোষণের মতো একটি নগ্ন সমাজ-বিরোধী পাপ তারা সার্থকভাবে সম্পন্ন করতে পারছে। কোথায় ঈশ্বর? কী করছেন তিনি? মানবজাতির এই দুর্দশা কি তিনি উপভোগ করছেন? তিনিও তো এক নিরো, তিনি এক চ্যাঙ (চেঙ্গিস), নিপাত যান তিনি।

এই পৃথিবীর উৎপত্তি, মানবজাতির উৎপত্তি আমি কিভাবে ব্যাখ্যা করি সে সম্পর্কে কি আপনারা প্রশ্ন করেছেন? ঠিক আছে, আমি আপনাদের বলি, চার্লস ডারউইন এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন, তাঁর লেখা পড়ুন। সোহম স্বামীর "সাধারণ জ্ঞান" পড়ুন। কিছুটা পরিমাণে তাতে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর মিলবে। এ হল প্রাকৃতিক ঘটনা। বিভিন্ন রকমের গ্যাসীয় পদার্থের আকস্মিক সংমিশ্রণের ফলে এ জগতের উদ্ভব হয়েছে। কখন? ইতিহাস পড়ুন। একই প্রক্রিয়ায় জন্ম হয়েছে জীবজন্তুর এবং দীর্ঘদিন পরে মানুষের। ডারউইনের Origin of Species পড়ুন। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অবিরাম দ্বন্দ্ব ও তাকে উত্তরণ করার প্রচেষ্টা থেকেই পরবর্তীকালে সমস্ত রকমের প্রগতি, এ ঘটনার এই হল সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত ও সম্ভবপর ব্যাখ্যা।

আপনারা আর একটা প্রশ্ন তুলতে পারেন যা কিন্তু আসলে বাচ্চাদের মতো, যদি ঈশ্বর না-ই থাকেন তাহলে মানুষ কি করে তাকে বিশ্বাস করে? আমার উত্তর সংক্ষিপ্ত ও পরিষ্কার। যেভাবে তারা ভূত ও অশুভ আত্মায় বিশ্বাস করতে শিখেছে, সেভাবেই তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেও শিখেছে। শুধুমাত্র তফাৎ হল এটাই যে, ঈশ্বর বিশ্বাস প্রায় সর্বজনীন এবং এই দর্শনটাও বেশ উন্নত। অন্য কিছু

প্রগতিপন্থীর মতো এ কথা আমি বলি না যে, ঈশ্বরের আবির্ভাবের কারণ হচ্ছে শোষকদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা যারা এক পরম সত্তার অস্তিত্ব প্রচার করে মানুষকে নিজেদের অধীন রাখতে চেয়েছিল ও দাবি করেছিল যে তাদের সুবিধাভোগী অবস্থানের পেছনে সেই পরম সত্তার অনুমতি বা সম্মতি আছে। মৌল প্রশ্নে এই মতের সঙ্গে আমার পার্থক্য নেই যে, সমস্ত ঈশ্বর বিশ্বাস, ধর্ম, ধর্মমত এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পরবর্তীকালে অত্যাচারী ও শোষক প্রতিষ্ঠান মানুষের সমর্থকে রূপান্তরিত হয়। সমস্ত ধর্মমতে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা সব সময়ই পাপ।

ঈশ্বরের উৎপত্তি নিয়ে আমার নিজের মত হল এটাই যে, মানুষের সীমাবদ্ধতা অনুধাবন করে এবং তার দুর্বলতা ও অক্ষমতা বিবেচনা করে কল্পনায় ঈশ্বরের সৃষ্টি করা হয়েছিল সাহসের সঙ্গে বিপজ্জনক সমস্ত ঘটনার মুখোমুখি হতে মানুষকে উৎসাহিত করার জন্য এবং প্রতিপত্তি ঐশ্বর্যে তার যে বিস্ফোরণ তাকে সংযত ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। তার ব্যক্তিগত বিধিনিয়ম ও পৈত্রিক উদারতা সহ ভগবানের চিত্রটি বিশেষভাবে কল্পনা করা হয়েছে ও আঁকা হয়েছে। তাঁর ঐশ্বরিক শক্তি ও রুদ্ররোষের কথা এই কারণে বলা হয়, যাতে মানুষের ক্ষোভ প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার পক্ষে বিশেষ বিপদের কারণ হয়ে উঠতে না

পারে। ঈশ্বরের এই প্রতিরোধক শক্তির কথা এইজন্যই বলা হয়।

আর যখন তাঁর পিতৃসুলভ গুণাবলীর প্রশান্তি কীর্তন করা হয় তখন তাঁকে কখনো বাবা, কখনো মা কখনো ভাইবোন বা রক্ষাকারী বন্ধু রূপেই তাঁকে তুলনা করা হয়।

বন্ধুদের দ্বারা প্রতারিত, আত্মীয়ের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে মানুষ যখন চরম বিপদের মুখে পড়ে, তখনই এই ভেবে শান্তি ও সান্ত্বনা পায় যে, সবসময় একজন পরম বন্ধু আছেন যিনি অবশ্যই দয়া ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন। কারণ, তিনি 'সর্বশক্তিমান' ও 'বিপদত্তারণ'।..... এবং তিনি 'ইচ্ছাময়'। ইচ্ছা হলেই তিনি এসে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন।

প্রকৃতপক্ষে সমাজ সৃষ্টির আদিম যুগে হয়তো এর দরকার ছিল। তখন মানুষের দুঃখ বিপদে ‘ঈশ্বর' বড়োই এক সহায়ক শক্তি বা দারুণ ওষুধ ছিল।

এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সমাজকে প্রতিনিয়ত প্রতিবাদ-প্রতিরোধ বা যুদ্ধ- ঘোষণা করে যেতে হবে। সেইসঙ্গে পুতুল-পূজা বা ধর্মীয় সংকীর্ণতার বিরুদ্ধেও লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। যখন মানুষ নিজের পায়ের ওপর শক্ত হয়ে

দাঁড়াতে শিখবে এবং সত্যিকারের বাস্তববাদী হবে, তখন এইসব বিশ্বাস ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সত্যিকারের মানুষের মতোই যতকিছু দুঃখ-কষ্ট ও সমস্ত প্রতিকূল অবস্থাকে জয় করতে পারবে।

এই হল আমাদের বর্তমান অবস্থা। তাই বন্ধুরা, এটা আমার অহংকার নয়, এটা হল আমারই নিজস্ব চিন্তার পদ্ধতি যার ফলে আমি নাস্তিক হয়ে উঠেছি।

যে ঈশ্বর-বিশ্বাস ও প্রতিদিনের প্রার্থনাকে আমি বড়ই স্বার্থপরতা ও হীনতার উদাহরণ বলে মনে করি, সেই ঈশ্বর-বিশ্বাস ও প্রতিদিনের প্রার্থনা আমার বর্তমান অবস্থার পক্ষে সহায় হবে না। আরও শোচনীয়তার কারণ হবে, তা আমি জানি না।

আমি বই পড়ে জেনেছি যে, নাস্তিকরা সব বিপদে সাহসের সাথেই রুখে দাঁড়ায়। ফলে, আমিও সমস্ত বিপদকে তুচ্ছ করে শেষ পর্যন্ত মাথা উঁচু করেই দাঁড়াতে চাই, এমন কি ফাঁসির মঞ্চে গিয়েও। দেখা যাক, আমি তা পারি কি না। একজন বন্ধু আমায় প্রার্থনা করতে বলেছেন। তিনি বললেন 'তোমার জীবনের শেষ দিনগুলোতে তুমি আবার বিশ্বাস করতে আরম্ভ করবে'। আমি বলেছি ‘না আমি তা

পারব না। আমার পক্ষে সেটা হবে একটা অধঃপতন ও নিজেকে ঠকানো কাজ, স্বার্থপর হওয়ার জন্যে আমি প্রার্থনা করতে পারব না।' পাঠক ও বন্ধুরা, এটা কি আমার দম্ভ? যদি তাই হয় তাহলে বলি আমি তার পক্ষে।

সূচিপত্র

| প্রশ্ন করুন এই গুগল ফর্মে – Ask_Rationalists

এমাসে Ask rationalists প্রকাশিত হল না, তারজন্য আন্তরিক ক্ষমাপ্রার্থী

ম্যাগাজিনে ব্যবহৃত বিভিন্ন ছবিঋণ পিন্টারেস্ট ও ইন্টারনেট মাধ্যম

যে পুস্তক পাঠ করিলে বুদ্ধি, বিবেক ও বাস্তবতাবোধ বিলুপ্ত হয় তাহাকে ধর্মগ্রন্থ বলে।

-ওয়াশিকুর রহমান বাবু (১৯৮৮-২০১৫)



সমস্ত লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব

চেতনার অন্বেষণে

মাসে একটি লেখা

মুক্তচিন্তার ওপর লেখালেখি ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে দেখে পত্রিকাটি শুরু করেছিলাম।

আপনারা যারা মুক্তচিন্তা, যুক্তিবাদ, নাস্তিকতার চর্চা করেন যেমন পারবেন, যতটুকু পারবেন লিখুন। ফেসবুক, ব্লগ ইত্যাদি মিডিয়ায় লেখা প্রকাশ করার পাশাপাশি লেখাটি পাঠান।

পত্রিকার অন্যতম লক্ষ্য যুক্তিবাদীদের লেখালেখিতে উৎসাহিত করা, এবং মুক্তচিন্তকদের চিন্তাধারা সমাজে তুলে ধরা।

প্রচলিত অর্থে ম্যাগাজিনের জন্য লেখা বলতে গুরুগম্ভীর, বড়, সাধারণ লেখার থেকে একটু আলাদা, কিংবা সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ এরকম বুঝি, কিন্তু আমরা যে ধরনের লেখা চাই তা এরকম হতেই হবে এমন মোটেও নয়। কোন সাম্প্রতিক ঘটনা বা কোন বিষয়ে আপনার চিন্তা-ভাবনা কী সে সম্পর্কে ৫-১০ লাইন লিখলেও পাঠানো যায়। আমরা চাই আপনার লেখনী চলতে থাকুক। লেখায় নিজের পরিচয় গোপণ রাখতে চাইলেও অসুবিধা নেই, আপনার লেখা প্রকাশ করব। যা দুই বাংলার অগনিত মানুষের কাছে আমাদের ভাবনা ছড়িয়ে পড়বে এবং মুক্তচিন্তকদের আরও সংঘবদ্ধ করতে উৎসাহিত করবে।

এমন নয় যে আপনার লেখাটি কোথাও প্রকাশ করেছেন বলে দেওয়া যাবে না, তা একেবারেই নয়। ক্রমশ অসহনীয় রাজনৈতিক দিনগুলিতে যুক্তিবাদীরা কোণঠাসা হচ্ছে। তাদের নিজেদের জন্য হলেও কলম তুলে নিতে হবে এটি নির্মম সত্য। কোন প্রকার প্রশ্ন এবং লেখা পাঠানোর ঠিকানা নীচে দেওয়া রয়েছে। ধন্যবাদ।

মার্চ সংখ্যা সংগ্রহ করুন

পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক হোন (বিনিময়মূল্য ছাড়াই)

পত্রিকার গ্রাহক হতে ফর্ম পূরণ করুন- Cilck Here | Scan QR

যো গা যো গ

Email: yuktibadira@gmail.com

